ইউ জী-র সঙ্গে পাম স্প্রীং-এ চোদ্দ দিন

ইউ জী-র সঙ্গে পাম স্প্রীং-এ চোদ্দ দিন

সব্যসাচী গুহ

"চেতন কর্মপ্রয়াসের জগতে আমাদের কী জানা সম্ভব এবং কী জানা অসম্ভব একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনের কার্যকরী শক্তির সদ্ব্যবহার।"

সব্যসাচী গুহ

"জগতের প্রকৃতি জেনে জীবনযাত্রা নির্ধারণ করা অসম্ভব, কারণ জগতের প্রকৃত বিদ্যমান রূপ জানার কোনও উপায় নেই। যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোনওকিছু জানি সেইসব প্রক্রিয়া হল বিভাজনের পরিণতি, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভ করা আত্মচেতনাসৃষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, মায়ার জগৎ। তবে এই মায়াময় জগৎকে আবিষ্কার করা এবং ক্রমাগত নাকচ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি হয় সেটাই কোনও এক বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক অবস্থার পরম সান্নিধ্যে অবস্থান করার সমতুল্য। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক অবস্থার কোনও সাধারণ বর্ণনা অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা অনুপম এবং অতুলনীয়।"

সব্যসাচী গুহ

বই প্রকাশের নেপথ্যে

প্রিয় বন্ধু রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জিকে আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ পত্রাকারে জানানোর মাধ্যমে শুরু হয় এই লেখা। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে রামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ এবং অদম্য উৎসাহ এই লেখাকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। কিছু বন্ধু এবং স্নেহভাজনদের একান্ত আগ্রহ ও নিরন্তর প্রচেষ্টায় সেই পত্রাবলীর এই পুস্তকে পরিণতি লাভ ঘটে। আমার বন্ধু এবং আত্মীয় স্বপন মজুমদার প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে একাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া শঙ্কর চক্রবর্তী, রজত পাল, কমল পাল, উৎপল চক্রবর্তী, শুভাশিষ ভট্টাচার্য (বুবু), তাপস চক্রবর্তী, সঙ্গীতা চক্রবর্তী, পার্থকৃষ্ণ ঘোষ ও সুনন্দা ঘোষ আমাকে বিভিন্নভাবে এই কাজে সাহায্য করেন। আমার বাল্যবন্ধু দীপঙ্কর ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অফুরন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে যখনই আমি ভারতে এসেছি তখনই আমাকে সঙ্গ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। পিনাকী চক্রবর্তী যদি ডিটিপি থেকে স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কসে যোগাযোগ করা পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করতেন তাহলে এই পুস্তক কবে প্রকাশিত হতো জানি না।

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি এই পুস্তকের প্রাণপুরুষ, পরম চালক, তাঁর স্মৃতিই আমার মূল প্রেরণা।

সব্যসাচী গুহ

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	১১
লুইস ব্রলির ভুমিকা	১৫
রেবতী আয়েঙ্গারের ভূমিকা	২১
প্রথম অধ্যায়	২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	৫১
পঞ্চম অধ্যায়	৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	৬৫
সপ্তম অধ্যায়	৭১
অষ্টম অধ্যায়	৭৭
নবম অধ্যায়	৮৩
দশম অধ্যায়	৯৩
একাদশ অধ্যায়	১০৩
দ্বাদশ অধ্যায়	১০৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	১১৫
চতুর্দশ অধ্যায়	১২৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	১৪৩
ষোড়শ অধ্যায়	১৫৫
সপ্তদশ অধ্যায়	১৬৯
অষ্টাদশ অধ্যায়	১৮৩
উনবিংশ অধ্যায়	১৯১
বিংশ অধ্যায়	১৯৯
একবিংশ অধ্যায়	২১৯
পরিশিষ্ট	২২৩

লেখক পরিচিতি

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি সটান তাঁকে উত্তর দিলেন, 'No Way'. নিউ জার্সির রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষক চল্লিশোর্ধ যুবক সব্যসাচী বহু ঘাটে, বহু ভাবের ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও আত্মজ্ঞানের পথ খুঁজতে খুঁজতে ইউ জী-কেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'What is the Way?'।

এই উত্তর তাঁকে হঠাৎই নিয়ে যায় একুশ বছর পূর্বের বেনারসের মধ্যরাত্রির এক নির্জন গঙ্গার ঘাটে। সেখানে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নিরালা ঘাটে হঠাৎ এসে ভেড়ে তারই সমবয়সি এক যুবকের মৃতদেহ যা তাকে মনে করিয়ে দেয় বিগত কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা—যা তাকে এমনই এক মৃতদেহে পরিণত করতে পারত। সে ভেবে চলে কেন এবং কীভাবে সে সেই দিন আশ্চর্যজনকভাবে জীবিত।

প্রথিতযশা ও মানবদরদী চিকিৎসক পিতা ডা. অজিতরঞ্জন গুহ, ভক্তিমতী মাতা সুলেখা দেবীর বড়ছেলে সব্যসাচী ক্লাস সিক্স-সেভেনে স্কুল পালানো শুরু করলে তার ঠাঁই হল পলাশীতে শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের আশ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ভোরবেলা গুরুপ্রণামের পূর্বে গ্রামের কিছু ছেলেকে জুটিয়ে ফুটবল খেলার প্রবর্তন করা সেই আশ্রমে থাকাকালীন তার স্বাধীন ও উদ্ভাবক মানসিকতার পরিচায়ক। সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী পিতা কারান্তরালে গেলে সে ফিরে আসে হিন্দমোটরে দু'বছর পর। এবার তার বিখ্যাত ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন মাথাচাড়া দেয়। ততদিনে পিতা ফিরেছেন স্বমহিমায়। দিশাহীন কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে টইটম্বুর ছেলের হাতে বাবা তুলে দিলেন দুই অমোঘ ভেষজ—স্বামী বিবেকানন্দ ও আইনস্টাইনের ওপর দুটি গ্রন্থ। বিবেকানন্দের প্রভাব সরাসরি বোঝা না গেলেও আইনস্টাইনের প্রভাব হল বিশাল। নিজের উদ্যোগে ক্লাস টেন-এ থাকতেই শিখে

নিলেন ক্যালকুলাস এবং পিতামাতার মুখে হাসি ফুটিয়ে দারুণ রেজাল্ট করলেন স্কুল ফাইনালে। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠ শুরু। কিন্তু প্রি-ইউনিভার্সিটি পাঠাবস্থায় বাংলা তথা ভারত তথা সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া 'মেহনতী মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই' তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ছোটবড় শহরে অনাহার, অর্ধাহার, আশ্রয়হীন মৃত্যুর মুখোমুখি এক জীবনস্রোতে। অবশেষে হতাশ, ক্লান্ত, দিশাহীন হয়ে তার বেনারসে আগমন। ভক্তিমতী মা এবং বিবেকানন্দের প্রচ্ছন্ন প্রভাব এবার প্রকাশিত হতে থাকে। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে চলতে থাকে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা। একের পর এক পড়া হতে থাকে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণসহ নানা ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থ। কিন্তু অব্যক্ত জিজ্ঞাসা ও মনের অস্থিরতা বাড়তে থাকে প্রতিনিয়ত।

আবার কলকাতায় ফিরে এসে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়ে ওড়িশার রাউরকেল্লা থেকে স্নাতকোত্তার পাঠ শেষ করে শুরু করলেন বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি এবং পরবর্তীকালে যুক্ত হলেন ISRO-তে বিজ্ঞানী হিসাবে।

ইতিমধ্যে জীবনের স্রোতে যুক্ত হয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীমতী লক্ষ্মী রাও। সব্যসাচীর জীবনে ঘটল লক্ষ্মীলাভ। গবেষণার কাজে স্বামী-স্ত্রী এলেন নিউ জার্সিতে। ইতিমধ্যে পিতা দেহ রেখেছেন। সংসারের বন্ধন আলগা হয়েছে অনেকটাই। মনে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা ছুটিয়ে মারছে পাগলের মতো। যোগ দিলেন রামচন্দ্র মিশনে। দেশে-দেশে মেডিটেশন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। ধ্যানে নানা অনুভূতি ও দর্শনের গুরুবর্ণিত ব্যাখ্যা তাকে তৃপ্তির বদলে আরও অশান্ত করে তুলতে থাকে।

এই সময় আশ্চর্যজনকভাবে পরিচয় ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। আর ইউ জী জানিয়ে দিলেন 'No Way'!! এতদিনের এতো জ্ঞানবিদ্যাকে চুরমার করে ইউ জী যেন ভাসিয়ে নিয়ে চললেন তারই প্রার্থিত পথে। যে পথে তার 'মুক্তি আলোয় আলোয়'—অথচ যা কিনা 'No Way'!

সে সময়কার এক অসাধারণ কড়চা হল তার লিখিত 'পাম স্প্রীং-এ চোদ্দ দিন।' কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে আজ তিনি গবেষণা-অধ্যাপনার কাজ স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দেওয়া এক 'অনাথ অনিকেত' পরিব্রাজক। সারা পৃথিবীতে 'সমুদ্রে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের' মতো ড. সব্যসাচী গুহ। কাছের মানুষদের কাছে তিনি আদরের 'প্রদীপ'—এক দীপ থেকে অন্য প্রদীপে অগ্নিসংযোগ করে চলেছেন অবিরাম। বিদেশি ঘনিষ্ঠদের কাছে তিনি পরিচিত 'গুহা' বলে, যে গুহাতে প্রবেশ তো করা যায় তবে তার অন্তিম সীমা পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব।

রজত পাল
স্বপন মজুমদার

লুইস ব্রলির ভূমিকা

"একটা বিশেষ জায়গাতে পৌঁছলে, আর কোনও ফেরা নেই। ওই জায়গাতেই পৌঁছতে হবে।"
—ফ্রানৎস কাফকা

যেদিন আমি প্রথম ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করি সেদিনই আমার সব্যসাচী গুহর সঙ্গে পরিচয় হয়। যখন আমি হোটেলের ২১০৭ নম্বর রুমে ফোন দিলাম গুহই ফোনটা ধরেছিলেন। মনে আছে, "আপনি কী চান?" প্রশ্নটা শুনে আমি একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। পরে আমি বুঝলাম যে তাঁর (ইউ জীর) পাশেই উপবিষ্ট কেউ প্রশ্নটা করেছেন। তখন আসলেই আমি বুঝতে চাচ্ছিলাম, ওই সময় আমি যে-সংকট মোকাবিলা করছিলাম ইউ জী নামের এই মানুষটা কীভাবে সেই সংকট থেকে মুক্ত হলেন। ইতোমধ্যে আমি টের পেলাম এই প্রশ্ন করার কোনও অর্থ নেই, তাই আমি বললাম "অন্য কৃষ্ণমূর্তির ঘোর থেকে মুক্ত করার জন্যে আমি শুধু তাঁকে একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই।"। জিড্ডু নামক এই "অন্য", আরও বর্ষীয়ান সেই কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে আমি যে-জটিলতার মধ্যে পড়েছিলাম, ওইদিন আমি ওই ধরনেরই কিন্তু তার থেকে আরও ঘোরতর জটিলতার মধ্যে পড়লাম। ওই সময় আমি যা জানতাম না তা হলো গুহ এবং আমি উভয়েই একসময় জিড্ডু-ঘোরের ভেতরে ছিলাম। নিজস্ব "দুর্দৈব" ঘটার আগমুহূর্ত পর্যন্ত এই জিড্ডু-চরিত্রটা ইউ জীর জীবনেরও মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। গুহর এই ডায়েরি, *ইউ জী-র সঙ্গে পাম স্প্রিং-এ চোদ্দ দিন*, রূপান্তরমূলক এক সাক্ষাৎপর্বের অপরূপ উপস্থাপনার এই দলিলটা যেন বহুদিন পর আমার জীবনের এই ঘটনাগুলোকে তীব্র ফোকাসে নিয়ে এল।

ইউ জীর কাছে সবসময়ই তাঁর বন্ধুদের স্বভাবগত বাতিক বর্ণনার জন্যে এক-লাইনের একটা সিরিজ থাকত। গুহর ক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে ঠাট্টা করে বলতেন যে, যাকে বলে "উন্মাদনার উল্লাস", গুহ হলেন তার একটা উদাহরণ, যেটা তাঁর ঘন ঘন অট্টহাসির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষের দিকে তিনি এও

ঘোষণা করতে পছন্দ করতেন যে, গুহ হলো "সেই মানুষটি, যে তোমার পশ্চিমের এনার্জি সমস্যার সমাধান করে দেবে", নিউ জার্সির রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিপরিবাহিতা বিষয়ক গুহর মূল যে গবেষণা, এটা ছিল তার একটা উল্লেখ। অতিপরিবাহিতা বলতে আমি যা বুঝি তা হলো, কোনও বস্তুর একটি দশা যেখানে শূন্য রোধে ওই বস্তুটির ভেতর দিয়ে সর্বোচ্চ শক্তি পার হয়ে যেতে পারে। গুহর জন্যেও এটা একটা যথার্থ রূপক হতে পারে, যেভাবে তিনি এই বইয়ের পাতাগুলির ভেতরে হাজির হয়েছেন, এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে, যিনি কিনা ইউ জীর কাছে সম্পূর্ণ রোধশূন্য, আবার যিনি নিজেও প্রাকৃতিক শক্তির অবারিত এক উৎস।

বিজ্ঞানীর শৃঙ্খলা আর তাঁর স্বভাবজ অন্বেষকের একক ফোকাসের এই মিশ্রণই সম্ভবত ব্যাখ্যা করতে পারে কেন তাঁদের সাক্ষাতের সময় ইউ জীর শারীরিক প্রভাব অত দ্রুত তাঁর মাধ্যমে অনুভূত হয়েছিল। তাঁর যা ঘটছিল তাতে আতংকিত হয়ে তিনি কখনও কখনও ইউ জীর ওপর তাঁর আস্থা স্থাপন করেছেন। যে ইউ জী তাঁকে ক্রমাগত বলে গেছেন কারও ওপর আস্থা না রাখতে। এইসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে ইউ জী তাঁর স্বভাবসুলভ সহজ সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "এটা তোমার হাতের বাইরে। এটা আমারও হাতের বাইরে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি একে এর ওপরেই ছেড়ে দাও এবং দেখ এটা কোথায় নিয়ে যায়।" এখানে যে পরম আস্থাটা কার্যকরী সেটা হলো প্রকৃতির ওপর আস্থা, প্রকৃতির শক্তির ওপর আস্থা, যা সকল পরিমাপনীয় পরিসীমার বাইরে। ইউ জীর সাক্ষাতে অত তীব্রভাবে তাঁর শক্তি অনুভব করার পর, বিজ্ঞানী বলেই হয়তো, গুহ এইসব জিনিস পরিমাপের একটা উদ্যোগ নিলেন, কিন্তু শিগগিরই তিনি এর অসম্ভবতাটা টের পেলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুধু ওই পর্যন্তই পারে, এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে এটা কিছুই পারে না।

গুহর সঙ্গে যখন আমার দেখা হল ততদিনে ইউ *জী-র সঙ্গে পাম স্প্রিং-এ চোদ্দ দিন*-এ বর্ণিত ঘটনাবলি তাঁর কাছে পুরোনো এক ইতিহাস। ততদিনে তিনি প্রায় সাত বছর ধরে ইউ জীর সঙ্গে "ঘোরাঘুরি" করে বেড়াচ্ছেন। আমার মনে আছে, হয় তিনি হাসছেন নয়তো ইউ জীর চারপাশে জড়ো হওয়া ক্ষুদ্র দলটির অদ্ভুত এক অ-ঘুমন্ত দশার ভেতর পড়ে আছেন। আমার আরও মনে আছে, গুহ প্রায়শই

আভাস দিচ্ছেন যে তিনি খুশিমনে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভারতে ফিরে যাবেন, খুব সম্ভবত আধ্যাত্মিক একটা জীবনযাপন করবার জন্যে। আর এদিকে ইউ জী তাঁর 'ইউএস পাসপোর্ট' নেওয়া এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী আর তাঁর দুই কন্যার (যে-কন্যাদের ইউ জী উৎসাহিত করতেন, "তোমার বাবাকে নিংরে নাও!") দেখভাল করা নিয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত গুহ সেটা মেনে নিয়ে ইউএস নাগরিকত্ব নিয়ে ইউএসএতেই থেকে গেলেন।

ইউ জীর মৃত্যুর বছরখানেক পর ২০০৮-এ চাকরি ছেড়ে দেবার পর গুহ এখন পর্যটন করে আর ক্রমবর্ধমান, নিবেদিতপ্রাণ আগ্রহী লোকজনের সাথে ইউ জীর সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা, এবং পরিপূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাওয়া একটা প্রজাতি হিসেবে আমরা যে মূলগত মানবীয় সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে চলেছি, তাই নিয়ে সবিস্তারে কথাবার্তা বলে সময় কাটান। কোনও কর্তৃত্বের দাবি ছাড়াই তিনি কথাবার্তা বলেন। তিনি এমন একটা মানুষ হিসেবে কথাবার্তা বলেন, ইউ জীর সংস্পর্শ যাঁর নিজের শারীরিক অস্তিত্বে একটা বিরল সামঞ্জস্যের সূচনা করেছিল। তিনি তাঁর নিজের কথাই বলেন এবং সেখানে কোনও অনুতাপ নেই বা অন্যদেরকে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত করার কোনও আগ্রহ নেই। যেমন "ব্যক্তি-নির্দিষ্ট প্রায়োগিক বাস্তবতা" (subject-specific functional reality) হলো গুহর একটি মূল দার্শনিক ধারণা, যার মাধ্যমে তিনি প্রত্যেকটি ব্যক্তি কীভাবে তাদের জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করে সেই উপলব্ধিটা ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে কোনও মানুষের মস্তিষ্ক তার নিজের বাস্তবতার আবির্ভাব ঘটায়, যে-বাস্তবতা কখনওই অন্য কারও বাস্তবতার সঙ্গে মিলবে না, সেইটা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে অনন্য এবং মৌলিক।

সময়ের সাথে সাথে গুহর সাথে আমার বন্ধুত্ব আজ 'ইউ জীর যৌথ শ্রোতা'র পর্ব থেকে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাঁর নির্ভিকতা আর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অন্তর্দৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর হাসি উৎসারিত হয় এমন একটা উপলব্ধি থেকে, আমার যেটার অভাব রয়েছে। আমার রসিকতা আসে ওই জাতীয় সমগ্রতা আত্মীকরণ করার অক্ষমতার হতাশা থেকে, ইউ জীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় গুহ যে ধরনের মানুষ ছিলেন শুধু সেই ধরনের মানুষ হওয়ার ফলাফল হিসেবে তিনি

যে অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন বলে মনে হয়। অন্যত্র যেরকম বলা হয়েছে, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছুই নেই। একজন যা, একজন তা-ই।

দুর্বলতার দশা আর অন্বেষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে যাঁরা গুহর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর ভক্তি কেবল আরও গভীর হয়েছে। কখনও আমি তাঁকে মিথ্যা ভণ্ডামি করে এইসব লোকেদের ওপর কোনও সুযোগ নিতে দেখিনি, কখনও তাঁকে মামুলি কথাবার্তা বলে এইসব বিষয়ে তাঁর যে অবস্থান, সেটার সঙ্গে আপস করতে দেখিনি। সেখানে সুযোগ নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই এবং ইউ জীর মতোই তাঁর প্রদেয় বার্তায় প্রায়শই কোনও বিরতি নেই। তারপরও একটা অকপটতা এবং বিচারবিহীনতা তাঁর চারপাশে একটা মুক্তির আবহ সৃষ্টি করে এবং একটা দুর্দান্ত বন্ধুত্ব অনুমোদন করে।

গুহ কখনও ইউ জীর পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কখনও তিনি ইউ জীর প্রতিনিধি হিসেবে কথাবার্তাও বলেননি এবং ইউ জীর বিদায়ের পর যখন আমি আমার এই আপাত অদ্ভুত অস্তিত্ব চালিয়ে যাবার জন্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলাম তখন তাঁকে একজন পরম শ্রোতা হিসেবে পেয়েছি বলে আমি সবসময়ই নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করেছি। শিল্পের জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ, আর আমার বাদবাকি চিন্তাভাবনার জগৎ নিয়ে আমার জীবনের এই বীভৎস জটিলতা, আর ওদিকে আমার ইউ জীর মধ্যে দেখা স্বচ্ছতা, এই দুয়ের মাঝখানে আমার এক ধরনের কারাবাসের মতো অবস্থার এই নিরর্থকতায় আমি তখন বিক্ষতপ্রায়। মাঝে মাঝে আমার ভেতরে গুহকে নিয়ে একটা অন্তর্কলহ চলত, যার মূল বিষয়টা ছিল, "বেশ, কিন্তু তিনি তো ইউ জী নন।" কিন্তু গুহর ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী সত্যটা হলো, এসবে তাঁর সামান্যতম কিছু যায় আসে না। যখন আমরা কথাবার্তা বলি, সেটা সবসময়ই স্বস্তিকর ধরনের স্বচ্ছ এবং মিথ্যা প্রত্যাশা থেকে সম্পূর্ণরকম মুক্ত।

আমার কাছে তিনি হলেন, কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তগুলো উপেক্ষা-করা, গভীরভাবে জ্ঞাত আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক স্বজ্ঞার উৎস। সামাজিক মানদণ্ডই হলো সেই জিনিস যেটা আমাদেরকে সভ্যতা নামক এই দুর্ভাগ্যজনক মানবীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আটকে রেখেছে। সমাজের ভিত্তিটা হলো ভয়। অন্যদের কাছ থেকে আমরা

যা চাই সেটা না পাওয়ার ভয়, বা তাদের সঙ্গে আমাদের যা আছে বলে আমরা কল্পনা করে নিই, সেটা হারাবার ভয়। এই সবকিছুই হলো কাল্পনিক, কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি সেখানে টিকে থাকার জন্যে এগুলো খুবই জরুরি।

আমার মনে হয়, গুহকে গুহর মতো করেই দেখার ক্ষেত্রে ইউ জীর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালীন যোগাযোগটা একটা প্রতিবন্ধক ছিলো। আমার ক্ষেত্রে, *ইউ জী-র সঙ্গে পাম স্প্রিং-এ চোদ্দ দিন*-এর পাতাগুলি যেন শেষ পর্যন্ত গুহকে ইউ জীর ছায়া থেকে বের করে আনল। ইউ জীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের নানা ঘটনা, তাঁর নিজের জীবনের কাহিনি, আর যেখানে তিনি ইউ জীর সঙ্গে তাঁর পথ চলার ব্যাপারটা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো ইউ জীর সঙ্গে কাটানো আমার দিনগুলির স্মৃতি আমার প্রত্যাশার চাইতেও অনেক তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে। স্বভাবগত কারণেই মানুষ মানুষকে নানা ভূমিকা বরাদ্দ করে দেয় এবং এটা সত্যিই একটা সমস্যা যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি এই ভূমিকাগুলো ঝেড়ে ফেলছেন এবং প্রত্যাশাগুলো সব দূর করে দিচ্ছেন। এখন আমার যা মনে হচ্ছে তা হলো গুহর মতো একটা সঙ্গ পেয়েছি বলে আমি আবারও ভাগ্যবান।

মনুষ্যচেতনার সংকটে আগ্রহী যে-কারওর জন্যেই আমি ক্ষুদে রত্নসম এই বইটি বিশেষভাবে সুপারিশ করি।

লুইস ব্রলি
নিউইয়র্ক, ইউএসএ

রেবতী আয়েঙ্গারের ভূমিকা

"ইউ জী-র সঙ্গে পাম স্প্রিং-এ চোদ্দ দিন" সব্যসাচী গুহর ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সান্নিধ্যে যে অভিজ্ঞতা, সেটার একটি বিশদ বিবরণ। এটা গুহর ওই সময়কার মনের ভূলোকের একটি পরিক্রমা, যার বর্ণনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর শৈশব, কৈশোর, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশা, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান আর ধ্যাননিষ্ঠ অভিজ্ঞতার নানা আত্মজৈবনিক ঘটনা।

যা এই বইটিকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে তা হলো: তিনি ছিলেন জীবনযুদ্ধ-করা "সাধারণ একজন মানুষ", সাধ্যমতো সবই করে যাচ্ছিলেন, আর সামাজিক চাপের টানাপোড়েনে পিষ্ট হচ্ছিলেন। একসময় তিনি সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়েন, কিন্তু কিছুটা ভাগ্যগুণেই, তাঁর সহজাত স্থৈর্য আর তাঁর অদম্য স্পিরিট তাঁকে তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এনে ফেলে। বইটা পড়তে পড়তে আমি বারবার আমার নিজের জীবনের সঙ্গে এর মিল না খুঁজে পারছিলাম না, যে-আমি আজ এখানে নানা ঘটনা পরিক্রমার পর এই বইটা হাতে নিয়ে বসে আছি।

আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে যাই, যখন গুহ ইউ জীর সামনে এসে দাঁড়ালেন আর প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তখন কিছু একটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং বইটির শেষের দিকে তিনি তার একটা আভাস দিয়েছেন। পাম স্প্রিং ভ্রমণ একটা বিপর্যয়ের সূচনা করল, যে বিপর্যয়টা তার নিজস্ব ভরবেগে চলতেই লাগল আর তাঁকে নানা অপ্রত্যাশিত জটিলতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল, সেটা শুধু তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর শারীরিক ক্ষেত্রেও। এই পরিবর্তনগুলো কয়েক বছর ধরে চলতে লাগল, এবং তাঁকে একটা অদ্ভুত অবস্থানে নিক্ষেপ করল যেখানে "not knowing"[১] হয়ে উঠল তাঁর ক্রিয়াশীলতার পন্থা। জ্ঞানের ক্ষমতা

১. not knowing: মন-বুদ্ধির অগোচর বিষয়; জ্ঞানাতীত বিষয়।

এবং সীমাবদ্ধতা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন সংগ্রামের যে ইঁদুর দৌঁড়, তার ভেতরে তিনি আর থাকতে চাইলেন না। এই সমস্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু তিনি কখনও তাঁর দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি।

বইটার প্রথম দিকে যেখানে তিনি ইউ জীর সঙ্গে তাঁর মেলামেশার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে আপনার মনে হবে যেন আপনি তাঁর সঙ্গে ওই ঘরেই উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর ছোট ছোট কাহিনি আর অন্য লোকেদের সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে, ওইসব লোকেদের নিজস্ব লড়াই এবং ইউ জীর সংস্পর্শে থাকার আনন্দ আর তীব্রতার একটা উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাবে। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে দিয়ে আপনি যে শুধু ইউ জী এবং তাঁর চারপাশের ঘটনাবলীর একটা আশ্চর্য আভাস পাবেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গুহর ভেতরটাও দেখতে পাবেন।

ইউ জী আমার চোখে পড়েছিল যখন আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে "বোধিপ্রাপ্ত" আত্মা খুঁজছিলাম, যা আমার কাজে লাগতে পারে। এটা বহু নামই সামনে নিয়ে এল যেখানে ওই দশায় আছে এরকম লোকের অভাব ছিল না। ওই বিশৃঙ্খল দঙ্গলের মধ্যে থেকে ইউ জীর নামটা এমন একটা নাম হিসেবে উঠে এল যিনি কিনা ভিন্নমার্গী, সাহসী, এবং নিজের মৌলিক, শারীরিক রূপান্তরের ভিত্তিতে যাঁর এই সমস্ত-বিষয়টার সঙ্গে একটা অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার তুমুল চেষ্টা করলাম কিন্তু যে কারণেই হোক সেটা কখনও হয়ে উঠল না। ২০০৭ সালে যখন জানলাম যে তিনি মারা গেছেন, আমি বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম, এবং আমার ভাগ্যকে অভিসম্পাত করতে লাগলাম। ওই হতাশার মধ্যেই আমার গুহর নামটা মাথায় এল, যেহেতু ইউ জীর ওয়েবসাইটের কোনও একটা বইয়ে তাঁর উল্লেখ ছিল। তক্ষুনি আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম এবং তাঁর ঠিক-ঠিকানা খুঁজে বের করার কঠিন প্রয়াস চালালাম। আমি ইউ জীর দেখা পেতে ব্যর্থ হয়েছি কিন্ত এখন আর আমি গুহকে খুঁজে বের করায় এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। অবশ্য আমি কখনও নিজের কাছে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারিনি কেন আমি গুহর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কয়েক মাস পর, শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই, তখন তিনি হিমালয়ের পাদদেশে

দার্জিলিঙের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছিলেন। পরের বছর নিউইয়র্ক সিটিতে আমি তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করতে সক্ষম হই।

এই বইতে আমার আগ্রহ ছিল গুহর বিষয়টা পড়া। ২০০৮-এ যে গুহর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম তাঁকে আমার মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ "মীমাংসিত" এবং দ্বন্দ্বমুক্ত একজন। তাঁর স্বভাববৈশিষ্ট্যের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাতে লাগল যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে এই দ্বন্দ্বমুক্ত দশার ভেতরে একটা বিশেষ ধরনের দৃঢ়তা রয়েছে। যদিও তাঁর ক্রিয়াকর্ম ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, সেগুলো সবসময়ই মনে হতো আত্মবিশ্বাসী, বাস্তবতায় দৃঢ়মূল, এবং সম্পূর্ণতই *"je ne sais quoi"*[১]তে পরিপূর্ণ। তিনি কিছুই অন্বেষণ করছিলেন না, এবং কে এল বা গেল বা তারা কী করল না-করল, তা নিয়ে তার কিছু এসে যেত না। যারা তাঁর বক্তব্যের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ দেখাত, তাদেরকে তিনি সহজেই তাঁর সময় আর এনার্জি দিয়ে যেতেন। কোনও আগ্রহ না থাকলে তিনি খুশিমনে তাদেরকে দরজা দেখিয়ে দিতেন। আমি নিজে বহু মানুষকে এই ঘূর্ণায়মান দরজা দিয়ে আসতে-যেতে দেখেছি, এমনকি কাউকে কাউকে রেগেও বেরিয়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু এতে কখনও তাঁকে বিরক্ত মনে হয়নি। এক দশক ধরে গুহকে এইভাবে চেনার পর আমি, ১৯৯৫-এর গুহ, পুরোপুরি আত্মসন্দিগ্ধ একজন অন্বেষক, আমাদের মতোই পেশাজীবী এক গৃহী, সেই গুহকে পড়ার জন্যে দারুণ কৌতূহল বোধ করলাম। তিনি ধ্যান আর যোগে নিবেদিত হলেন আর তাঁর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণে গোগ্রাসে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন। নিউইয়র্কে ইউ জীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কিছু বীজ সক্রিয় না হয়ে ওঠা পর্যন্ত প্রচলের এই নাগরদোলা চলতেই লাগল। পাম স্প্রিং ভ্রমণে সেই বীজের একটা বিস্ফোরক অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। এই ভ্রমণের পর বহুদিন পর্যন্ত সেটা বাড়তে লাগল আর প্রস্ফুটিত হতে লাগল এবং তাঁর স্বাভাবিক জীবনের (যদি সেটাকে কোনও স্বাভাবিক জীবন বলা যায়) অবসান হয়ে গেল। "গুহ" স্বয়ং টুকরো-টুকরো হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ইউ জীকে তিনি সারা পৃথিবীজুড়ে প্রবলভাবে অনুসরণ করে বেরিয়েছেন।

জীবনে একজন "খাঁটি" মানুষের দেখা পেয়েছি বলে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী বোধ করি। তাঁকে না দেখলে আমি খাঁটি কাকে বলে জানতে পারতাম না।

---

১. *je ne sais quoi: (ফরাসি)* এমন কিছু যা যথাযথ বর্ণনা করা যায় না।

সেখানে কোনও মিথ্যা ছিল না, কোনও ভণ্ডামি ছিল না, কোনও অন্বেষণ ছিল না, ব্যবহারিক প্রশ্ন ছাড়া কোনও প্রশ্ন ছিল না, এবং কারও অহমের দূতিয়ালী বা পরিতোষণ ছিল না। আমি শুধু দেখলাম একটা সাধারণ জৈব মনুষ্যকাঠামো তার তুঙ্গ-ক্ষমতায় ক্রিয়াশীল। তাঁর বারবার বলা এই কথা—, "দেহ শুধু সন্তোষজনক-ভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে চায় এবং ধারণাগুলো এই ভারসাম্যের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—" আমার ভেতরে গভীরভাবে অনুরণিত হতে থাকে এবং যেন আমার দেহের সহজাত বুদ্ধিমত্তাকে আকর্ষণ করতে থাকে। একজন যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এটা একটা ধাক্কার মতো লাগতে পারে। কিন্তু যে একবার এই ঝর্ণার জল পান করেছে সে-ই শুধু বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাইছি। গুহর এই পর্যবেক্ষণ বহুদিন আগেকার, যখন তিনি তাঁর এই শব্দবন্ধটি সৃষ্টি করেছিলেন—, "ব্যক্তি-নির্দিষ্ট প্রায়োগিক বাস্তবতা" (subject-specific functional reality)। সেটা এই সত্যের ইঙ্গিত করে যে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির অনুভূত যে বাস্তবতা সেটা এতটাই অনন্যতাসম্পন্ন যে কাউকে নিজের স্বমতে আনতে চাওয়া বা অন্যদের ক্রিয়াকর্ম বোঝার চেষ্টা করাটা পুরোপুরি অর্থহীন। আপনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করবেন যে আপনার আবেগগত লড়াই এবং অন্যদের ওপর আপনার প্রভাব খাটানোর প্রচেষ্টা হ্রাস পাচ্ছে যেহেতু আপনি তখন তাদেরকে ক্রিয়াশীল থাকার জন্যে একটা স্থান দিতে চাইছেন ঠিক যেমনটি আপনি নিজের ক্ষেত্রে আশা করেন।

কেউ যদি একবার গুহর কাছে এসে তাঁর নিঃসৃত এনার্জি অনুভব করতে পারেন সেটা তাঁর সৌভাগ্য। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো ক্রোধ বা হতাশাও বোধ করতে পারেন যখন তিনি ভয়, আশা এবং আকাঙ্ক্ষার মহৎ দূর্গগুলো গুঁড়িয়ে দেন। গুহ মাঝে মাঝে সানন্দে গেয়ে ওঠেন, "ভয় যদি চলে যায়, তুমিও যাবে চলে; ঈর্ষা যদি চলে যায়, তুমিও যাবে চলে।" যদি কোনও দুর্ঘটনাক্রমে আপনি আপনার সত্তার গভীরতম কেন্দ্রে তাঁর ছুড়ে দেওয়া আগুনের গোলাটাকে অনুভব করতে পারেন তখন আপনার শরীরের নিজস্ব ভারসাম্য খুঁজে পাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তখন একজনের আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই। তিনি যে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন তাতে একজনের সমাপ্তিও ঘটে যেতে পারে। গুহর "পথ" কবিতাটির কথা মনে পড়ছে যেটা তিনি লিখেছিলেন যখন তাঁর ভেতরে সেই আগুনটা জ্বলছিল:

পথ

ভাগ্য যদি ভালোই থাকে তোমার
জ্বলন্ত সেই সূর্যটা যদি পড়ে বুকের 'পর
শুকনো যদি থেকেই থাকে আবর্জনা সব
ব্যর্থ যদি হয়েই থাকে প্রার্থনা ধ্যান জপ
তলিয়ে যদি গিয়েই থাকে মনের যত রোষ
শূন্য যদি পড়েই থাকে অশ্রুজলের কোষ
ভুলেই যদি গিয়ে থাকে মাথার জটিল কাজ
আক্ষেপ যদি না-ই জাগে আর ক্লান্ত মনের মাঝ
ফুরিয়ে যদি গিয়েই থাকে জ্ঞানের স্পৃহা যত
স্বপ্নে দেখা দুশ্চিন্তার মতো
স্পর্শে তখন লেগেই যাবে আগুন
জ্বলবে চিরকাল
গভীর বুকের মাঝে
আর কোনওদিন যাবে না কারও কাছে
চাইবে না আর কিছু
আগুন তোমার পথ দেখাবে
চলবে পিছু পিছু।

.....

রেবতী আয়েঙ্গার
প্রিন্সটন, নিউ জার্সি
অগাস্ট ২০১৯

১.

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে জুলী ফোন করে জানালেন যে ইউ জী পাম স্প্রীং নামে লস এঞ্জেলেস থেকে একশো মাইল পূর্বে একটা সুন্দর শহরে বেশ কিছুদিন থাকবেন বলে স্থির করেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী-র টেলিফোন নাম্বারটা ডায়েরিতে নোট করে নিলাম। তারপর জুলীর সঙ্গে গল্প করতে করতে আরও জানতে পারলাম যে, ভারত, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে বেশ কয়েকজন বন্ধু পাম স্প্রীং-এ আসতে চান ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। জুলীর ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা—আপাতত তার জীবনের শুধু একটাই লক্ষ্য কীভাবে ইউ জী-র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। অথচ ইউ জী সর্বদা একথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি চান না কেউ তাঁর ওপর নির্ভরশীল হোক বা তাঁকে কেন্দ্র করে কারও জীবন গড়ে উঠুক।

ইউ জী-র পুরো নাম উপ্পালুরী গোপাল কৃষ্ণমূর্তি। এই নামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে। আমি তখন রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছি। আমাদের গবেষণার দলে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক, তখন ডক্টরেটের প্রায় শেষভাগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত; আমাদের দুজনের মাঝে মাঝে একসাথে কাজ করতে হতো, সেই সূত্রে আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা নিয়ে আলোচনার স্তরে এসে যায়। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ দেখাতেন এবং যখন জানতে পারলেন যে এসবে আমার গভীর অনুরাগ—শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিকতা আমার জীবনের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ তখন তিনি বললেন যে তিনি ধ্যান করেন—রাজযোগ এবং তিনি একটা আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এরপর যখনই গল্পগুজব করার অবকাশ মিলত আমরা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করতাম। অবশেষে একদিন সেই বন্ধু আমাকে তার গুরুদেবের সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমার বড় মেয়ে শিল্পা তখন কয়েক মাসের শিশু, বন্ধুর স্ত্রী মেয়েকে দেখার জন্য আমাদের সবাইকে রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক সংস্থার ধ্যানধারণা, দর্শন এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমার এবং

আমার স্ত্রী লক্ষ্মীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করাটাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সন্ধ্যায় বন্ধুটির বসার ঘরে পা দিতেই একটা ছবির দিকে নজর গেল—বললাম এই ভদ্রলোক যদি আপনাদের গুরু হন তাহলে আপনাদের গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আমার কোনও আপত্তি নেই। বন্ধু বললেন এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীরামচন্দ্র—তিনি দেহ রেখেছেন—তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আমাদের গুরুদেব। আমি বললাম, তাতে আমার সেরকম আগ্রহ নেই। যাই হোক, তিনি আমাদের অনেক কিছু বোঝালেন এবং শেষে মিশনের বই দেখাতে লাগলেন। আমি তাদের আলমারি দেখছি, হঠাৎ একটা বইয়ের দিকে নজর আটকে গেল। বইটা বার করে পাতার পর পাতা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে লাগলাম—বইটার নাম Unknown Man। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির ওপর একটা অধ্যায় চোখে পড়ল, বিষয় আমার জানা কিন্তু পরের অধ্যায়টা আশ্চর্যভাবে আমাকে আকর্ষণ করল। অধ্যায়টার নাম No Way—পড়তে শুরু করলাম—এই প্রথম দেখলাম কেউ জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির সমালোচনা করছেন—এক নিঃশ্বাসে অধ্যায় শেষ। পুরোটা ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির ওপর লেখা। ইউ জী-র নাম ও ছবির এটা হল আমার প্রথম দর্শন। জীবন্ত মানুষটির দর্শন পেতে লেগে যায় আরও চারটি বছর। প্রথম সাক্ষাৎ নিউইয়র্কে—এই জুলীর অ্যাপার্টমেন্টে।

জুলী ক্লার্ক থেয়ার নামটা বাবা-মা রেখেছিলেন একটা কথা মাথায় রেখে—তা হল এই নামটা নাকি লেখিকা হিসাবে দারুণ মানায়। ভবিষ্যৎ বলবে জুলীর মা-বাবার মনস্কামনা পূর্ণ হল কি না। বর্তমানে জুলীর বাসস্থান নিউইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টের সাততলায় এক বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে। এই অ্যাপার্টমেন্টগুলি শহরের ধনকুবেরদের বসবাসের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। যেমন ধরুন ছ'তলায় থাকেন হলিউডের বিখ্যাত তারকা ম্যাডোনা। অন্য এক তলায় থাকেন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মালিক। জুলী এখানে একলাই থাকেন। একুশ বছর ঘর করার পর ডিভোর্স হয়ে গেছে। তার স্বামী ছিলেন এক বিখ্যাত ব্যাংকার পরিবারের ছেলে সিডনি লাজার্ড। প্রচুর পয়সা থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতার কাজ করতে ভালোবাসতেন। কালে কালে আমেরিকার বিখ্যাত টেলিভিশন চ্যানেল এনবিসি-র আন্তর্জাতিক বিভাগে কাজ করেছিলেন। মনে পড়ল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সিডনির ভারতে তোলা একটা ছবির কথা। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর সময় এনবিসি-র সংবাদদাতা হিসাবে ভারতে গিয়েছিলেন। স্বামীকে সঙ্গ দিতে বিশ্বের

বিভিন্ন জায়গায় জুলীকে বসবাসও করতে হয়েছিল—সেই সূত্রে তার ফরাসি ও ইতালিয়ান ভাষায় বিশেষ দখল আছে।

জুলীর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড় ছেলে মার্ক লাজার্ড সিনেমার পরিচালক হবার চেষ্টা করছেন। ছোট ছোট কয়েকটা ফিল্মও তৈরি করেছেন। তাছাড়াও তিনি বিজ্ঞাপন-এর তারকা। মার্কের প্রথম ফিল্ম *'স্ট্যানলিস গিগ'* কয়েকটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চান্স পেয়েছে। ফিল্মের কথোপকথন ছোটভাই জাস্টিন লাজার্ডের সঙ্গে লিখেছেন। ছোট ছেলে জাস্টিন টেলিভিশনে অনেক অভিনয় করেছে। এখন হলিউডের চিত্রতারকা—প্রথম ছবি *'স্পিসিজ-২'*-এর মুখ্য অভিনেতা। মেয়ে গায়িকা—সাসা লাজার্ড। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল গান দিয়ে শুরু করেন। এরপর নিজের মতো করে গান করেন—একটা গানের সিডি বার করেছেন। *প্রিন্সেস মনোনকি* বলে একটা জাপানি কার্টুন ছবিতে প্লেব্যাক গায়িকা হিসাবে কাজ করেছেন। সবাই এখন যে যার মতো থাকেন। কেউ কারও ওপর নির্ভরশীল নন, তারা সবাই জুলীর থেকেও বেশি ধনী।

সমস্ত পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত এই সুস্থ, সুন্দরী, বিদুষী, ধনী জুলী থেয়ারের মনে কোনও শান্তি নেই—ভেতরে ভেতরে একটা গভীর শূন্যতা। প্রথমে কেরিয়ার, তারপর স্বামী, তারপর পুত্রকন্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জীবনকে এই শূন্যতা তখন জ্বালাতন করার অবকাশ পায়নি—আর এখন এ সর্বগ্রাসী। একে ভরাবার বৃথা চেষ্টার সেই কাহিনি লেখা শুরু করলে আসল গল্পটা হয়তো আর লেখা হবে না। যাই হোক নিজের চেষ্টায় যখন এ ব্যথার উপশম হল না তখন প্রায় অন্য সমস্ত ধনী লোকেদের মতো মনস্তত্ত্ববিদ অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিস্টদের শরণাপন্ন হন। দশ বছর ধরে তাঁকে বিভিন্ন সেরা সেরা মনস্তত্ত্ববিদকে নিজের বিপুল অর্থের অনেকটাই বলতে গেলে বিনা ফলে দিয়ে দিতে হয়েছে। কোনও কিছুতেই যখন কোনও সুফল হল না, তখন ভেতরের শূন্যতাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা বলে নিজেকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতে থাকেন। শুরু হল জুলীর আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। সেই টানে ছুটতে ছুটতে বহুঘাটের জল খেয়ে বহু চটকদার মসৃণ জিহ্বার পশ্চিমি গুরু থেকে সুদূর প্রাচ্যের ভেকধারী মৌন, মুণ্ডিতমস্তক নির্বাণপ্রাপ্ত শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে, নানান ঘটনাচক্রে ক্যালিফোর্নিয়ার এক আধ্যাত্মিক বইয়ের দোকানে ইউ জী-র বই চোখে পড়ে। বইটার নিচে ছোট একটা নোট লেখা ছিল—দার্শনিক-

অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির লেখা—'যদি কেউ ইউ জী-র বিষয়ে আলোচনা করতে চান তাহলে এই নম্বরে ফোন করতে পারেন।' জুলী তখন এক পশ্চিমি গুরুর তত্ত্বাবধানে সাধনা করছেন—তবুও বইটা কিনে ফোন নাম্বারটা নোট করে নিলেন। পরেরদিন সকালে ফোন করলেন—অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তি ফোনের উত্তর দিয়ে বললেন, "আমার কাছ থেকে আর কিছু বোঝার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি বর্তমানে আমাদের বাড়িতেই আছেন। আপনার যখন ইচ্ছা তখনই আসতে পারেন।" জুলী এ খবর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জানালেন, বইটা সবাইকে দেখালেন—কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে শোনালেন। ব্যাস, সকলেই একবাক্যে ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়ে গেলেন। নারায়ণ মূর্তিকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানালেন— আমরা এখুনি আসছি। জুলী তাঁর তিন বন্ধু নিয়ে নারায়ণ মূর্তির ঘরে ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা—তারপর যতই সময় যায় এ ভালোবাসা যেন ততই গভীর হতে থাকে। মাঝে মাঝে জুলীকে দেখে মনে হয় ভালোবাসার পরবর্তী স্তরের রূপান্তর হল পাগলামি। তা না হলে পৃথিবীতে এত কিছু থাকতেও আর কোনও আলোচনা জুলীর ভালো লাগে না—তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু সেই একমেবাদ্বিতীয়ম ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ—সবই ইউ জী, ইউ জী, ইউ জী, এমনকী দোকানে বাজারে গেলেও তাঁর সেই একই চিন্তা—আচ্ছা এটা কিনি, এটা হয়তো ইউ জী-র ভালো লাগবে, না, না, এটা নয়, সেটা কিনি, সেটা হয়তো ইউ জী-র আরও ভালো লাগবে—একে পাগলামি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

জুলীর কোনও ভাইবোন নেই, আমাকে ভাই বলে ডাকেন। ফোনে কথা বলেই বোঝা গেল আজ তাঁর ভীষণ আনন্দ। কারণ ইউ জী পাম স্প্রীং-এ আসতে অনুমতি দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে আমারও ইউ জী-র সঙ্গে ছুটি কাটানোর ইচ্ছে; তাই ভাবলাম, যদি ইউ জী অনুমতি দেন তাহলে আমিও সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য পাম স্প্রীং-এ গিয়ে থাকব। জুলীর সঙ্গে কথা শেষ করেই ইউ জী-কে ফোন করলাম।

—ইউ জী, শুনলাম, আপনি পাম স্প্রীং-এ একটা ভালো থাকার জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছেন?

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, খুব সস্তায় পাওয়া গেছে—আর মরুভূমির শুষ্কতায় আমি খুব স্বস্তি বোধ করি।

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে এবং অন্য কোনও পরিকল্পনা না থাকে তাহলে আমিও কয়েকদিন পাম স্প্রীং-এ ছুটি কাটাতে চাই।

—আমি কাউকে হ্যাঁ বা না কিছুই বলি না। কিন্তু আপনি শুধু শুধু এতদূরে আসবেন কেন? আমার কাছ থেকে আপনি কিছুই পাবেন না, শুধু শুধু পয়সা ও ছুটি দুই-ই নষ্ট হবে। আপনি গবেষক মানুষ, আপনার সময়ের কত মূল্য। তাছাড়া নিউইয়র্কে তো দেখলেন কেমন ঘুরে ঘুরে আর আড্ডা মেরেই আমার দিন কেটে যায়।

—সে যাই হোক একবার না হয় পয়সা খরচ করেই আড্ডা মারলাম, শত হলেও বাঙালি তো।

—আপনার পয়সা আপনি যেভাবে ইচ্ছে খরচ করুন তাতে আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু পরে যেন আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর একটা কথা, আমি পাম মরুভূমিতে আছি, জুন মাসে এখানে অস্বাভাবিক গরম—সেটা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই।

—আমি কোলকাতা শহরতলির ভ্যাপসা গরমে সারাজীবন কাটিয়েছি, গরমে আমার আড্ডা বন্ধ হবে না।

—শুধু বাইরের গরম নয়, ভেতরেও সাংঘাতিক তাপ।

থমকে গেলাম ইউ জী-র কথা শুনে। মাঝে মাঝেই ইউ জী এরকম খটকা-লাগানো কথা বলেন। ভেতর বলতে উনি কী বোঝালেন? মার্কিন মুলুকে এয়ারকন্ডিশনের তো কোনও অভাব থাকার কথা নয়, অবশ্য যোগ সাধনায় যারা আগ্রহী তাদের কাছে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু যিনি আত্মা, আধ্যাত্মিকতা, পরমেশ্বর এসব কিছু কোনওভাবেই মানতে চান না—তার মুখ থেকে একথা শুনলে ঘরে সিলিং ফ্যান বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের অভাব ছাড়া মাথায় আর কীবা আসতে পারে? তবুও বলে দিলাম, এ পরিবেশ শুনেছি তপস্যার পরম উপযোগী।

—আপনার এই মিস্টিফাইং আউটলুক যতদিন থাকবে ততদিন আপনি কোনওকিছু স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবেন না।

—সে যাই হোক আমি আসছি।

—ঠিক আছে। শুনুন আপনার সেই নিউইয়র্কের সিস্টার, জুলী, সেও আসছে। তার এসব জায়গা খুব ভালো করে চেনা। এয়ারপোর্টে সে-ই আপনাকে রিসিভ করবে।

পাম মরুভূমিতে গিয়ে ইউ জী-র সঙ্গে চোদ্দ দিন থাকার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে গেল। জুন মাসের মাঝামাঝি লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে এসে হাজির হলাম। গত সাত বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করছি, কিন্তু এই প্রথম ক্যালিফোর্নিয়ার বুকে পা দিলাম। জুলী আমার জন্য লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল। দেখামাত্রই এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করে বললেন, মাই ব্রাদার ওয়েলকাম টু ক্যালিফোর্নিয়া। আনন্দে চোখ দু'টো চকচক করছে, গাল থেকে মনে হচ্ছে রক্তিম আভা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ইউ জী কোথায়? বলল, ইউ জী সান্টামনিকার সমুদ্রসৈকতে কালমার হোটেলে উঠেছেন। ওখানেই আপাতত বিশ্রাম করছেন। আমাদেরকে এয়ারপোর্টে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কারণ মুম্বই থেকে তনুজা চন্দ্রা নামে একজন ভদ্রমহিলা নাকি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন। তিনিও দিন দশেক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

তনুজা চন্দ্রাকে আমি চিনি না, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ থেকে ইমিগ্রেশন সেরে বেরিয়ে আসা যাত্রীদের মধ্যে থেকে ভদ্রমহিলাকে চিনে নিতে কোনওরকম ভুল হল না। সোডার বোতলের নিচ থেকে খুলে আনা দু'টো গোল গোল কাচের টুকরো একটা সরু তার দিয়ে জড়িয়ে চোখের সামনে রাখা। ছোটখাট চেহারার এই ভদ্রমহিলা, শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত, আধুনিক এবং বিদগ্ধ সমাজের একটা প্রতিফলন। করমর্দন করে পরস্পরের পরিচয়ের ফাঁকেই বুঝতে পারলাম তনুজা চন্দ্রা একজন লেখিকা, হিন্দি সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, উঠতি পরিচালিকা, কয়েকটি টেলিভিশন সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিল্ম মেকিং-এর ওপর একটা ডিগ্রিও করেছেন।

আমরা তিনজনে জুলীর সবুজ সুইডিস গাড়ি ভলভো ৮৪০-এ করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সান্টামনিকার হোটেলে এসে হাজির হলাম। হোটেলে ইউ জী মারিও ভিজ্জিয়ানো নামে একজন ইতালিয়ান বন্ধুর সঙ্গে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বললেন, শুনেছি আড্ডা মারতে

বাঙালিরা ভালোবাসে। কিন্তু তাই বলে আটলান্টিক মহাসাগরের পার থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পারে পুরো আমেরিকার বুক চিরে আড্ডা মারতে আসাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? আমি তখন তনুজাকে দেখিয়ে বললাম, তাহলে এই মহিলাকে কী বলবেন, যিনি সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এখানে এসেছেন। 'তাঁর একটা যথাযোগ্য কারণ আছে, তিনি ভারতবর্ষে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন—কিন্তু আমেরিকান গ্রিন কার্ডটা বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর সে কারণেই তাঁর এখানে আসা'—ইউ জী বললেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হোটেলেই গল্পগুজব হল। মারিও ইউ জী-র সঙ্গে প্রায় সারা পৃথিবী বারদুয়েক চক্কর দিয়েছেন। এখানে আরও দিন দশেক থেকে তাঁর কর্মস্থল জার্মানিতে ফিরে যাবেন। ক্যালিফোর্নিয়াতেই একটা গাড়ি আপাতত ভাড়া করেছেন। সাদা রঙের জাপানি গাড়ি নিশান ম্যাক্সিমা। আমরা সবাই দু'টো গাড়ি নিয়ে আবার লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে ফিরে এলাম। এবার যিনি আসছেন তিনি হলেন মুম্বইয়ের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মহেশ ভাট, সুইজারল্যান্ড থেকে আসছেন। তিনিও ইউ জী-র সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়াতে দু'সপ্তাহ থাকবেন।

মহেশ ভাট কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে অন্য সমস্ত যাত্রীদের অনেক আগেই বেরিয়ে এলেন। প্রথম শ্রেণির যাত্রীরা প্রথমে অবতরণ করেন, তার ওপর লাগেজের জন্য অপেক্ষা না করতে হলে কত তাড়াতাড়ি আসা যায় সেটা সেদিন বুঝলাম। মহেশবাবুর স্বভাবটা রসিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত, কোনওরকম ভানভণিতার ধার ধারেন না। ইউ জী-কে দেখে যেমন ভাবসাব করতে লাগলেন তাতে আমার সেই গানটা বারবার মনে হতে লাগল—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে...।' ইউ জী-ও আনন্দে আটখানা, অথচ নকল একটা বিরক্তির ভান করে নাক কুঁচকে মহেশবাবুকে বললেন, ছেলেমানুষি আর কবে যাবে শুনি। মনে হল আমরা যদি আশপাশে না থাকতাম তাহলে মহেশ হয়তো এই বৃদ্ধকে আদরই করে দিতেন।

আমরা সবাই দু'টো গাড়িতে করে পাম মরুভূমিতে যাব, প্রায় আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। কে কোন গাড়িতে যাবে সে নিয়ে জুলীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ইউ জী আমাকে বললেন, আপনার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে আমাদের গাড়িতে আসতে পারেন,

তারপর মহেশবাবুর দিকে তাকালেন। 'সবাই ভারতীয়, কোনও অসুবিধা নেই'—মহেশবাবু চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন। মারিও এবং ইউ জী সামনের সিটে, আমি তনুজা এবং মহেশবাবু পিছনের সিটে। অন্য গাড়িটা বেচারা জুলী একা চালিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল।

মারিও, সবাই বলল, অসাধারণ গাড়ি চালায়। জার্মানির অটোভানের ওপর দিয়ে যার দু'শো কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালিয়ে অভ্যাস, তাকে লস এঞ্জেলেসের এই জ্যামের মধ্যে গাড়ি চালাতে দেখে একটু মায়াই লাগল, মাঝে মাঝেই সে হতাশ হয়ে যাচ্ছিল, আর আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলছিল। ইতিমধ্যেই মারিওর সঙ্গে আমার ভালো রকম দোস্তি হয়ে গেছে। তার আমেরিকান গার্লফ্রেন্ডের নাম লিসা টোরান্টো, লিসাকে দেখতে এতই সুন্দর যে মহেশবাবু নাম পালটে লিসা গরজিয়াস বলে ডাকেন। লিসা এখন পাম স্প্রীং-এ থাকেন, সেখানে আমরা গিয়ে উঠব। ঘণ্টাতিনেক পরে আমরা হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এলাম।

এ জায়গাটা সত্যিই অভাবনীয়। ছোট ছোট পাহাড় সমতলভূমির ওপর এমনভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে যেন পবনদেব সবসময় এখানে এসে আনন্দিত হয়ে প্রবলভাবে তাঁর প্রকাশ ঘটাতে পারেন। মানুষের এসব চোখ এড়ায় না। বুদ্ধি খাটিয়ে পবনদেবের উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। বসিয়ে দিয়েছে সারি সারি উইন্ডমিল। আশপাশের বহু গ্রাম-গঞ্জের রান্না ও রাতের আলোর শক্তি ওই মাতাল মিলের চক্কর থেকেই আসে। এসব জায়গাকে দ্রুত পেছনে ফেলে রেখে আমরা রীতিমতো বিলাসবহুল একটা ছোট শহরের মুখে এসে দাঁড়ালাম। ঢুকতেই চোখে পড়ল রোপওয়ে, ডানদিকের একটা বড়সড় পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গেছে। বেশ কয়েকটা কেবল কার্ট সেই রোপওয়ে ধরে দুলে দুলে যাতায়াত করছে। আরও মিনিট দশেক পরে কয়েকটা ট্রাফিক লাইট অতিক্রম করে আমরা একটা মনোরম লজের সামনে এসে উঠলাম। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম গাড়ির এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রটা কেমনভাবে আমাদের এতক্ষণ ঠাণ্ডা করে রেখেছিল।

ওকোটিলো লজ। এখানকার আদি বাসিন্দা—যাদের নাম কলম্বাসের দিক্‌নির্ণয়ের ভুলে আমার স্বপ্নের জন্মভূমির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, পরে অবশ্য তারা 'রেড' কথাটা জুড়ে দিয়েছে—সেই তাদের দেওয়া এক অপূর্ব সুন্দর মরু-ফুলের নাম

'ওকোটিলো'। পুরো লজটা একতলা। ছোট ছোট ফ্ল্যাট—রান্নাঘর, শোবার ঘর, বসার ঘর, ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা—পুরোপুরি সাজনো-গোছানো। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক আলাদা আলাদা রেট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও বদলায়। নাজারতের ছুতোর মিস্তিরির জন্মদিনের কাছাকাছি সময়ে ভাড়া প্রায় দু'গুণ। আমি ঠিক করেছি রান্নাবান্না করব না, কাজে কাজেই রোজ সত্তর ডলার খরচা করে এখানে থাকাটা অত্যন্ত বিলাসিতা, এসব আমার জন্য নয়। রাস্তার উলটোদিকে পাঁচ মিনিট হাঁটা-দূরত্বে চল্লিশ ডলার রোজের একটা থাকার জায়গা পেয়ে গেলাম। একজোড়া বিছানা, অ্যাটাচড বাথ—আমি একলা। নিচে সুইমিং পুলও আছে—কিন্তু ঘরেই স্নানের কাজটা সেরে ফেললাম। রাতে ভালো ঘুম এল না, মনটা শুধুই প্রশ্ন করে চলেছে, মনের একটা অংশ আমার সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ লজ্জায় পড়ে যাই। এই প্রশ্নকর্তা আর কর্মকর্তার টানাহেঁচড়াটা বড় কষ্টকর...।

২.

ভোর পাঁচটায় উঠে আবার স্নান করলাম, সাড়ে পাঁচটায় কফি খাওয়ার নেমন্তন্ন। রাতে বিদায় জানাবার সময় ইউ জী নিজে বলে দিয়েছেন। ইউ জী-র দরজায় ঠিক সাড়ে পাঁচটায় টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল, দেখি মহেশবাবুও আছেন—ইউ জী নিজে কফি বানিয়ে আমাকে ও মহেশবাবুকে দিলেন। কেউ কোনও কথা বলছেন না। ভোরের স্তব্ধতা মাথায় ঘুমের আবেশের রেশটুকু মিলিয়ে যেতে দিচ্ছে না। আর সেই অলসতা গলায় একটা অদ্ভুত জড়তা আরোপ করে রেখেছে। একটু শব্দ করে দুজনকে তাঁদের নিবিড় অজানা জগৎ থেকে আমার সামনে আনার চেষ্টা করলাম—মহেশবাবু আমার মুখে দিকে তাকালেন। বললাম আপনার লেখা "A Taste of Death" আমি ইন্টারনেটে পড়েছি—এর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে—ইউ জী-র সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার প্রেরণা জেগেছিল সে বই পড়ে। মহেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, বই লেখার তাহলে সার্থকতা আছে। তাঁর ভাবতে অবাক লাগছে তাঁর মতো লেখকের বই পড়ে লোকে ইউ জী-কে দেখতে আসবে—মহেশবাবুর হাসি তো সে কথাই বলছে...।

অথচ ইউ জী সবসময় বলেন সমাজ আমাদের মধ্যে অদ্ভুতভাবে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সব চাহিদা ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং এই সমস্ত অবাস্তব চাহিদার পণ্য যোগান দেবার জন্য তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল সব ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বাজার। যদি আমার বই পড়ে কেউ কিছু বুঝে থাকে তবে তার প্রমাণটা হল সেই ব্যক্তি আমাকে কোনওদিন দেখতে তো আসবেই না এবং আর-কাউকেও এসব কারণে দেখতে যাবে না।

ইউ জী নিজে কখনও কোনও বইপত্র লেখেননি। তার সঙ্গে যখন লোকজন দেখা করতে আসেন তখন কথাবার্তা চলে প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে দিয়ে। এসব কথোপকথন অনেকেই টেপ এবং ভিডিও করে রেখেছেন।

ইউ জী-র কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু এইসব কথোপকথন একত্র করে বেশ কয়েকটা বই তৈরি করেছেন। বইগুলির নাম উল্লেখ করতে গিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। ইউ জী-র নাতি জার্মানির সিমেন্স কোম্পানিতে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তা ইন্টারভিউয়ের শেষে পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কথা ওঠে এবং নাতি বলে আমার দাদু একজন বিখ্যাত দার্শনিক। বোর্ডের একজন খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলেন আপনি সংক্ষেপে তাঁর দর্শনের মূল ভাবটা আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন তাহলে। সে সেই প্রশ্নের উত্তরে ইউ জী-র কয়েকটা বইয়ের নাম উল্লেখ করে এভাবে, "'মাইন্ড ইজ আ মিথ', 'থট ইজ ইয়োর এনিমি' এন্ড 'নো ওয়ে আউট'"। বোর্ডের ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ইউ জী-র নাতিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি... । নাতি অবশ্য চাকরি পেয়ে জার্মানি চলে যায়। আরও দু'টো বই আছে, 'মিস্টিক অফ এনলাইটেনমেন্ট' যাকে ইউ জী বলেন, 'মিসটেক অফ এনলাইটেনমেন্ট' এবং 'কারেজ টু স্ট্যান্ড অ্যালোন'। এসব বই ইন্টারনেটে বিনামূল্যে পড়া যায়। এর লিঙ্কটা হল: http://www.well.com/user/jct।

মহেশবাবু এবং ইউ জী-র দৃষ্টিভঙ্গির এই পরস্পরবিরোধী দিকটা নিয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করতে যাওয়ার প্রয়াসকে পাশ কাটিয়ে মহেশবাবু আমাকে উলটে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি কি ইউ জী-র একথা বিশ্বাস করেন যে তাঁর মধ্যে যা আছে আমার ও আপনার মধ্যেও তাই আছে? আমি বললাম, মূলগতভাবে আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যে প্রক্রিয়ায় জীবনীশক্তি আমাদের দেহকে প্রতি মুহূর্তে চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রকৃতির লেখা এক অসাধারণ একক প্রক্রিয়া—তবুও তার অভিব্যক্তিটা ভিন্ন ভিন্ন—হুবহু একই রকমের দু'টো লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব—তাই আপনার প্রশ্নের কোনও সরাসরি উত্তর নেই। তবে একটা ফান্ডামেন্টাল কিছু ঘটে গেছে ইউ জী-র মধ্যে এবং সেজন্য হয়তো এই ব্যাপারটা কিছুতেই কমপ্রিহেন্ড করা যায় না। আর তা হল তার মধ্যে কোনও প্রশ্ন নেই। মহেশবাবু আবার চুপ, ইউ জী অন্যমনস্ক। মনে মনে ভাবলাম হয়তো ইউ জী তাঁর শেষ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন, তাই তাঁর কোনও প্রশ্ন জাগে না অথবা তিনি এটা উপলব্ধি করে ফেলেছেন যে প্রশ্ন কোনওদিন শেষ হয় না, অতএব প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। অথচ আমরা সবাই সবসময় প্রশ্ন করে চলেছি—সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা চাইছি—কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছি, যাতে ভবিষ্যতকে সেই জ্ঞানের প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আর এই প্রক্রিয়ায়

হয়তো একদিন জানতে পারব জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী। জীবনের নিশ্চয়ই কোনও মূল হেতু আছে, সেটা আমাকে জানতেই হবে—অন্তত নিজের জন্য—তা না হলে নিজের কাছেই নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে। এই ইচ্ছার অসাধারণ ভরবেগের কাছে মাঝে মাঝেই নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হয়।

ফোনের আওয়াজে ঘড়ির দিকে নজর গেল—সকাল প্রায় আটটা। আমি ফোন তুললাম—জুলী এখানে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, ইউ জী-কে সেটা জিজ্ঞাসা করতে বললেন—ইউ জী বললেন, ন'টার আগে কোনওমতেই না, ন'টার সময় আবার ফোন করতে বলুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন এসে গেলেন। ইউ জী-র একমাত্র প্রশ্ন—'হাউ গুড ইজ দ্য মর্নিং'-এ একেকজন একেকরকম উত্তর দেয়। যদি ইউ জী-কে কেউ একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তাহলে, তার একটাই উত্তর আসবে—'কুড নট বি বেটার'। যাই হোক আলোচনা এতক্ষণে নানারকম গল্পগুজবে এবং রসালো আড্ডায় পরিণত হয়েছে। কথায় কথায় ব্রেকফাস্টের কথা উঠল, আজ সকালে কে কোথায় কী খাবে—একটা সাধারণ মনোভাব লক্ষ্য করা গেল—প্রাতঃরাশটা যদি এখানে অর্থাৎ ইউ জী-র ঘরেই পাওয়া যায়, তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়। ব্যাস, ইউ জী রীতিমতো তেতে উঠলেন, বললেন, যে যার নিজের নিজের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করুন, আমি এখানে কোনও আশ্রম খুলে বসিনি। মানুষের খাওয়াদাওয়াটা এমন একটা ভোগের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রকৃতির পক্ষে একে সামাল দেওয়াটা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মনুষ্যজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইউ জী-র কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘর প্রায় ফাঁকা, আমার কোনওরকম খাওয়াদাওয়ার কথা তখনও মাথায় আসেনি। তবুও সবার দেখাদেখি আমিও গাত্রোত্থান করতে যাচ্ছিলাম—ইউ জী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি এখানেই খাবেন। আমার ভেতরটা লজ্জায় ও অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক ভেতরে কোথায় যেন তাঁর আতিথেয়তা আমাকে ছুঁয়ে ফেলল। অবাক লাগল তাঁর এ ধরনের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার দেখে—কিন্তু এসব ব্যাপারে তাঁর কোনওরকম চক্ষুলজ্জা বা সংকোচ নেই—তিনি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

আমি একা রান্নাঘরে ইউ জী-র পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি কীভাবে তিনি খাবার তৈরি করেন। কোয়েকার ওটমিলের একটা ছোট প্যাকেজ খুলে মাঝারি সাইজের

একটা সসপ্যানে পাঁচ মিনিটে সেদ্ধ করে ফেললেন। আমাকে অর্ধেকটা দিলেন আর বাকি অর্ধেকটা নিজের জন্য একটা প্লাস্টিকের প্লেটে নিয়ে নিলেন। সেদ্ধ ওটমিলের ওপর হাত খুলে ঢেলে দিলেন বাজারের সবচেয়ে বেশি ফ্যাটওয়ালা ঘন দুধ। এ দুধ আধুনিক সমাজে পরিপূর্ণভাবে বর্জিত। এখানকার ডাক্তাররা— যাদের প্রভাবে দুনিয়ার ডাক্তাররা প্রভাবিত—তাঁরা ফ্যাট খাওয়া নিয়ে মানুষের মনে এমন ভীতির সৃষ্টি করেছেন যে লোকে সাধারণ দুধই ছোঁয় না, আর এ তো ডাবল ক্রিম—দেখলেই হয়তো তারা হার্টফেল করবে। যাই হোক এ দুয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন ঘন আনারসের রস, এখানে বলে ফ্রোজেন পাইনাপল জুস—বিষ টক। এক চামচ মুখের মধ্যে দিয়ে চোয়াল কীভাবে নাড়তে হয় ভুলে গেলাম। কোনওরকমে এক চুমুক গরম জলের সাহায্যে মুখের খাবার গলাধঃকরণ করার পর নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, একটু চিনি পাওয়া যাবে কি? নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলতে বলতে তিনি একটা ড্রয়ার খুলে চিনির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বেশ কয়েক চামচ চিনি মেশানোর পর ভালোই লাগল খেতে। খাওয়ার পর ইউ জী-র দেখাদেখি আমি আমার প্লেট, চামচ ধুয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে যথাস্থানে রেখে দিলাম।

দশটার সময় আবার সবাই হাজির। মহেশবাবু, তনুজা, জুলী, মারিও এবং লিসা। মারিও খুব ভালো রান্না করে, বহুবার হোটেল খোলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও কারণে সেসব আর হয়ে ওঠেনি। আপাতত সুযোগ পেলেই লোকজনকে খাইয়ে রান্নার হাতটা চালু রাখার চেষ্টা করে। আজ প্রথম দিন। তাই ইউ জী মারিওকে অনুমতি দিলেন রান্না করার এবং অন্য সবাই ইচ্ছা করলে মারিওর অতিথি হতে পারবে। তবুও একটা শর্ত আছে এবং তা হল সিঙ্গল ডিস—অর্থাৎ একটাই পদ হবে যেমন ধরুন আমাদের খিচুড়ি। মারিও ইতালিয়ান একটা ডিস রান্না করল। আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ইউ জী বললেন, আপনি এ ধরনের রান্না অন্য সেরকম ভালো জায়গায় হয়তো কোনওদিন খাননি তাই এই এলেবেলে 'পাস্তা'কে এত প্রশংসা করছেন। ভাবলাম চক্ষুলজ্জা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা বোধহয় এই ভদ্রলোকের জানা নেই।

খাওয়াদাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে ফিরে গেছে। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এভাবে এখানে চোদ্দ দিন কাটাতে আমি কেন এসেছি। আমাকে এখানে কেউ ডাকেনি। নিজেই নিজেকে জোর করে ইউ জী-র ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি।

তিনি খোলাখুলি বলেন—"আমার কথোপকথন পড়ার ফলে যদি কারওর কোনও উপকার হয় তাহলে সে ব্যক্তি আর কোনওদিন কারও কাছে সাহায্য চাইতে যাবে না।" আমি যদি একথা মনে করি যে আমি কারও কাছে কোনও সাহায্য চাই না—তাহলে এখানে আসা কেন? কোনও যুক্তি আছে? নিজের বিবেক-দংশন থেকে মুক্ত নয় এরকম কোনও ধারণা যখন চিন্তার রূপ নিয়ে অন্তরে বাসা বাঁধে তখন চিন্তক শক্তিমান হয়ে ওঠে—বিবেক-দংশন হল দু'টো চিন্তার লড়াই। যেটা জেতে সেটাও 'আত্ম' থেকে মুক্ত নয়—আর এমন কোনও চিন্তা নেই যার কোনও বিপরীত চিন্তা নেই—তাই চিন্তা কখনও দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। যদি কোনও অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়—তাহলে তার কোনও পরবর্তী অভিঘাত নেই—গোলাপের হালকা গন্ধের মতো সেটা মাধুর্য বিলিয়ে হারিয়ে যায়। চিন্তা তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে যে চিন্তককে জন্ম দেয়— সেই চিন্তক সবসময় কিছু না কিছু চায়—অপরের ওপর জোর করে নিজেকে চাপিয়ে দিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে, মোদ্দা কথা ফ্যাসিবাদী। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, জীবনের অভিব্যক্তি, তার নিজের অস্তিত্বের জন্য যতটুকু শক্তি, সময় এবং স্থানের প্রয়োজন তার বেশি এক বিন্দু গ্রহণ করে না। তার অন্য কোনও কিছুর কোনওরকম চাহিদা থাকে না। যে জীবন চিন্তার চাপে বন্দি নয়—প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ধাবিত—তার ভেতরে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পর আর কোনও চাহিদা থাকা সম্ভব নয়। যদি কোনওভাবে সৌভাগ্যবশত সেই সবের জোগান হয় তবুও কখনই তাঁর কোনওরকম দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় না এমন একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে যে এসব যদি হঠাৎ হারিয়ে যায় তাহলে তিনি কী করবেন। যত এইসব কথা আমার মনে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে, ততই মনে হচ্ছে কে যেন আমার মাথার মধ্যে সদ্য-কেনা নারকোল কোড়ানোর যন্ত্রের মতো কিছু একটা দিয়ে জমে থাকা গভীর জমাট অতীতকে অনায়াসে উথাল-পাতাল করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ইউ জী যখন বুদ্ধির লড়াইয়ে নেমে আসেন, তখন রীতিমতো অপমানই করেন। মনে হয় যেন বলছেন, আপনার মাথায় যা ক্ষমতা আছে তাতে আমার দর্শনের পক্ষে সেখানে স্থান করে নেওয়া খুব কষ্টকর—সময় নষ্ট করে লাভ কি—তল্পিতল্পা গুটিয়ে সমাজে, কর্মস্থলে, সংসারে ফিরে যান। আমার যা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তার সঙ্গে ইউ জী-র সত্যিকারের ব্যবহার অত্যন্ত আলাদা, অন্তত আমার সঙ্গে। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন—অথচ আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। খোলাখুলি বলে দিয়েছেন, শুধু গুহ আমার সঙ্গে খাবেন। আর সব যার যার তার তার। আত্মগরিমা এক অযথা

প্রতিবন্ধক—'আমি'-র এক সস্তা চাল—বেঁচে থাকার জন্য এ নানা কথা বলে—ইউ জী-র বন্ধুবান্ধবের কোনও অভাব নেই—ধনী, যশস্বী, সৌম্যকান্ত, সুন্দরী, বিদুষী—সবাই তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ আমার সঙ্গে রীতিমতো গদগদ—খুব ভালোবাসা... কোনওকিছু ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। জোর করে বারবার একটা গান গুনগুন করে গেয়ে চলেছি—আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অন্য প্রায় কারওর মধ্যে নেই... চিন্তার রেশ জোর করে থামালাম এই কথা ভেবে—একবার যখন জলে নেমেছি তখন সাঁতার কাটা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

৩.

আমেরিকায় আসার আগে আমি সাত বছর বাঙ্গালোরে ছিলাম। পাঁচ বছর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ডক্টরেট করি, এরপর আরও কয়েকমাস সেখানেই প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ছিলাম। অবশেষে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করি। তখন অবসর সময়ে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি নামের একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিকের লেখা পড়তাম। খুব আকর্ষণ ছিল তাঁর লেখায়। কালে কালে যখনই সময় পেতাম তখনই তাঁর লেখা পড়তাম। সেটা একটা অদ্ভুত নেশা ছিল—কোথায় যেন একটা মুক্তির হাতছানি। অথচ বাঙ্গালোরে এত বছর থাকা সত্ত্বেও জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে আমার কোনওদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি। পাম স্প্রীং-এ এসে আমার জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা খুব মনে পড়ছে। ইউ জী এবং তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব জে কে-র সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছেন। আমেরিকায় যখন ইন্টারনেট খুব প্রচলিত হল তখন আমি ইন্টারনেটে জে কে-র লেখা খুঁজতে গিয়ে ইউ জী-র বই 'মাইন্ড ইজ এ মিথ'-এর সঙ্গে পরিচিত হই এবং ইউ জী-র ওয়েবসাইট খুঁজে পাই। এরপর দর্শনের অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির সঙ্গে পত্রালাপ হয় ইউ জী-র ব্যাপারে জানতে চাওয়ার মাধ্যমে। তিনিই সমস্ত যোগাযোগ ঘটান এবং তাঁর মাধ্যমেই নিউইয়র্কে জুলীর বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে ইউ জী-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ! এইসব অতীত যোগাযোগের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ইউ জী-র ঘরে ফিরে আসি।

আজ ইউ জী-র ঘরে অনেক লোক। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ড. ল্যারি মরিস এবং ড. সুজান ন্যাটলটন এসেছেন নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কি নামের এক শহর থেকে। তারা দু'জনে বেশ কিছুদিন ধরে একত্রে বসবাস করছেন। ড. ল্যারি মরিস মার্কিন সামরিক বিভাগের তরফ থেকে অনেকদিন সাউথ কোরিয়ায় ছিলেন। নর্থ কোরিয়ার হাত থেকে আমেরিকার পুঁজি-ঢালা সাউথ কোরিয়াকে বাঁচাবার কাজে। ফিরে এসে ইংরেজিতে ডক্টরেট করেন এবং অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময় তাঁর

আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর আগ্রহ জাগে এবং তাঁর অন্বেষণ শুরু হয়। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিত্যাগ করে তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে আসেন। অধ্যাপক-দার্শনিক নারায়ণ মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কথামতো সাধনা শুরু করেন। দু'জনে মিলে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন, তিরুভান্নামালাইতে রমণাশ্রমে বেশ কিছুদিন থাকেন। ভারত থেকে ফিরে একটা গির্জায় যুক্ত হন এবং বর্তমানে তিনি আলবুকার্কি শহরে সেই গির্জার মিনিস্টার, ইউ জী-র পরম ভক্ত। জন্মসূত্রে ল্যারি ইহুদি কিন্তু গির্জার কোনও লোক সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানে না। ড. সুজান ন্যাটলটন সাইকিয়াট্রিস্ট—ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট। ল্যারির পাল্লায় পড়ে আধ্যাত্মিকতায় ঝোঁক আসে। ধীরে ধীরে ডাক্তারির পাঠ চুকিয়ে অধ্যাপক স্বামীকে ডিভোর্স করে ল্যারির প্রেমের টানে চলে আসেন, সেই গির্জা চালানোর কাজে ল্যারিকে সাহায্য করাটাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। ল্যারির সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব হল। পাশ্চাত্যে সেসব ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা চালু তাতে ল্যারির অফুরন্ত জ্ঞান। মজার কথা হল, তিনিও ইউ জী-র কাছে আসেন ডা. নারায়ণ মূর্তির মাধ্যমে। এরপর ল্যারির গির্জা চালানোর ব্যাপারে আরও অদ্ভুত সব বিষয় জানা গেল—উপস্থিত একজন বললেন ল্যারির সার্ভিসের সময় একবার তিনি গির্জায় ছিলেন। এই যে ল্যারি যাঁকে আপনারা এখানে দেখছেন গির্জায় তিনি সে ল্যারি নন। তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য লোকজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল মহেশ ভাট যখনই দেখেন ইউ জী দারুণ উত্তেজিত, তখন তিনি যেখানেই ল্যারি থাকুক না কেন সেখান থেকে তাঁকে এনে ইউ জী-র সামনে হাজির করেন। ল্যারি বিনয়ের ঝাউগাছ, ভক্তিরসে ভরপুর—তাই ইউ জী ঠাণ্ডা হয়ে যান এবং হেসে ফেলেন পর্যন্ত।

স্কীট স্কট বলে এক ভদ্রলোক এসেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ওহাই (Ojai) উপত্যকা থেকে। জুলীর সমবয়স্ক এই ভদ্রলোক ইউ জী-কে চেনেন সেই ১৯৬৮ সাল থেকে। প্রথম সাক্ষাৎ সানেন উপত্যকায়। গিয়েছিলেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির ওহাই উপত্যকার স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল। তাঁর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে সেকথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি যেসব বিচিত্র ঘটনার কথা বললেন তা যদি সব লিখি তা হলে আরও দু'টো অতিরিক্ত অধ্যায় হয়ে যাবে। মহেশ ভাটের পেয়ারের দোস্ত, যুবক

বয়সে একসঙ্গে অনেক রকম কাণ্ড-কারখানা করেছেন। মহেশ ভাট যখন রজনীশের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখনই মুম্বইতে ইউ জী-র আবির্ভাব ঘটে। ইউ জী-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। এসব ঘটনা বিস্তারিত লেখা আছে মহেশ ভাটের লেখা ইউ জী-র বায়োগ্রাফিতে। তবে যা লেখা নেই তার সাক্ষী হল স্কটী স্কট। মহাবালেশ্বরে তখন ইউ জী, মহেশ ভাট, পারভিন ববি এবং স্কটী স্কট ছুটি কাটাচ্ছিলেন। মহেশ ভাটের গলায় তখনও রজনীশের নিজের হাতে পরানো ছবির লকেটসহ ধ্যানের মালা। একদিন ইউ জী সব গুরুদের গুষ্টির তুষ্টি করছিলেন—আর তাতে পারভিন ববি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে মহেশের ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানে রজনীশের মালাটা গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসেন এবং সোজা ল্যাট্রিনে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দেন। ব্যাস, চিরদিনের মতো মালা গায়েব। যাই হোক সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল স্কটী স্কট ওহাই ভ্যালিতে থাকেন—যেখানে জে কে-র enlightenment হয়েছিল এবং কালে কালে যে জায়গায় জে কৃষ্ণমূর্তি foundation-এর আমেরিকান হেড কোয়ার্টার্স হয়েছিল।

স্কটী স্কট-এর জীবন এতই ঘটনাবহুল যে তাঁর জীবনের কিছু কিছু গল্প খবরের কাগজেও উঠেছিল। কিন্তু স্কটীর একটা গভীর দুঃখ—যদিও তিনি সেটাকে দুঃখ বলে মানেন না—বলেন, এটা আমার হৃদয়ের বিশালতার পরিচায়ক। সোজা কথায় তাঁর বউয়ের এক তরুণ প্রেমিক আছে। বউ খোলামেলা তার সঙ্গে প্রেম করে। এমনকী বেশিরভাগ রাত স্কটীকে অন্য ঘরে একলা শুতে হয়। আমার কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা যে, নিজের স্ত্রীর দেহ এবং হৃদয় অন্য কারওর সঙ্গে ভাগাভাগির সম্ভাবনায় যদি কোনও ব্যক্তির মাথায় হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কোনও গভীর গণ্ডগোল আছে। ইউ জী-কে একবার মহেশ ভাট স্কটীর ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইউ জী বলেন, স্কটীর বউ হচ্ছে ধনী বাপের মেয়ে—আর স্কটী স্কট কোনও কাজও করে না। তাই তাকে এসব হজম করতে হচ্ছে। প্রশ্ন হল, বউ কেন স্কটী স্কটকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না? ইউ জী-র উত্তর চাঁছাছোলা—বউ এটা জানে, তরুণ প্রেমিক যে কোনওদিন হাওয়া হয়ে যেতে পারে এবং স্কটীর

মতো বিশ্বস্ত ছেলে পাওয়া যাবে না। মনে হল আলেকজান্ডারের মতো বলি—সত্যি রামকৃষ্ণ! কি বিচিত্র এই দেশ![৩]

আজকের আড্ডায় যাদের যাদের এ যাত্রায় আসার কথা ছিল—তারা প্রায় সবাই উপস্থিত। আগামীকাল কী করা হবে না হবে সেসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন ইউ জী বললেন, কালকের কথা কালকে যখন কফি খাওয়া হবে তখন ঠিক করব। আমি ভুল করে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এখানে চা চলে না? ইউ জী আমাকে বললেন, বিন্ধ্যের উত্তর দিক থেকে যা আসে আমি তা বর্জন করি। ভাবলাম, সে কি! আমিও তো সেখান থেকেই এসেছি—কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। ইউ জী বলে চললেন, আমি হিন্দি একদম পছন্দ করি না, ভারতবর্ষে এমন একটা রাষ্ট্রভাষা হল যার কোনও লিটারারি ডেপথ নেই, এমন একটা লেখক, দার্শনিক বা কবিকে দেখাও যাকে বিশ্বের অঙ্গনে দাঁড় করানো যায়। এমনকী তামিল ভাষার গভীরতা জানলেও তোমার খুব আশ্চর্য লাগবে। ইউ জী নিজে অন্ধ্রপ্রদেশের লোক, কিন্তু বহুদিন মাদ্রাজে ছিলেন। আবার বললেন, ইউরোপে কেউ কারও ভাষা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় না। তখন আমার মাথায় একটা রসিক প্রশ্ন এল, জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এরকম খাঁটি দক্ষিণের লোক, তা গায়ের রং এরকম ফর্সা হল কি করে? ইউ জী-র কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। বললেন, হয় আর্যরা কাউকে বলাৎকার করেছিল, নয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আর্যদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছিল। আমরা তখন হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছি।

ইউ জী-র ভাষা নিয়ে কথা বলা তখনও শেষ হয়নি। বললেন, সুইজারল্যান্ডের কোনও নিজস্ব ভাষা নেই, তবে প্রধানত যেটা ব্যবহৃত হয় সেটাকে সুইস-জার্মান বলা যেতে পারে। সুইস-জার্মান শুনলে খাঁটি জার্মানদের হয়তো মনে হবে অন্য কোনও ভাষা। আমার মনে হল আমি যদি চট্টগ্রামের লোকেদের কথা শুনি তাহলে আমার যেমন মনে হবে, হয়তো অনেকটা সেরকম। আবার বললেন, সুইজারল্যান্ডে আরও দু'টো ভাষা খুব চলে ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ান। সমস্ত ইংরেজি সিনেমা তিনটি ভাষাতেই ডাবিং করে এখানকার টেলিভিশনে দেখায়, সাবটাইটেল নয়। আমার মনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল—ভাবলাম সিলভেস্টার স্ট্যালোন

৩. এই মন্তব্যটি চিঠি আকারে বন্ধু রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা হয়েছিল।

যদি আমার ঠাকুরমার মতো খাস বরিশালের ভাষায় গালাগালি দেয় আর মারামারি করে তাহলে দেখতে কেমন লাগবে—একটু আভাস দিতে ইউ জী হাসতে লাগলেন। বললেন, গ্রেগরি পেক ধরুন তামিল ভাষায় প্রেম নিবেদন করছে।

শুধু একজন এ আড্ডায় নেই। আমি যার মারফৎ ইউ জী-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সেই নারায়ণ মূর্তি। তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পায়ে ক্যানসার ধরা পড়েছে, অপারেশন করতে হবে। আমাদের আড্ডা চলার সময় ফোনটা বেজে উঠল, ইঙ্গিত পেয়ে ফোনটা তুললাম—ক্যালিফোর্নিয়ার সিসাইড নামের সানফ্রান্সিসকোর কাছাকাছি একটা শহর থেকে নারায়ণ মূর্তি লাইনের অপর প্রান্তে। আমাকে বললেন, তিনি খুব খুশি একথা জেনে যে আমি ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা ইউ জী-র হাতে তুলে দিলাম। ইউ জী দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, কোনও ভয় নেই—আপনাকে এখনও অনেকদিন এই পৃথিবীতে থাকতে হবে। তাছাড়া আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার কোলে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি—তাই আমার আগে আপনি কিছুতেই যাচ্ছেন না। এভাবে আরও কিছুক্ষণ মূর্তিকে নানারকম আশ্বাস দিয়ে ফোন রেখে দিলেন। মূর্তির গল্প একটু চলল।

নারায়ণ মূর্তি দর্শনের অধ্যাপক। আমার সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয়নি। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনের ওপর ডক্টরেট করেছেন। জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে পরিচয় ছিল। ল্যারি মরিসকে নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন এবং তাঁকে ল্যারি মরিসের আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম সূত্রধর বলা যেতে পারে। ইউ জী-র কাছে ল্যারি মরিসকে আনেন এই মূর্তি। জুলীকেও ইউ জী-র সঙ্গে পরিচয় করান তিনিই। জে কৃষ্ণমূর্তির জন্মশতবার্ষিকীতে নিমন্ত্রিত হন। 'বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা' বলে নিজের একটা লেখার ওপর বক্তৃতা দেন। আগে লিখেছিলাম ল্যারি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে খুব হাততালি পান কিন্তু অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির বক্তৃতার মাঝেই খুব বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া হয় যাকে পাতি বাংলায় বলা যেতে পারে "'প্যাক' খেয়েছেন"। তার কারণ জানতে চাইলাম। ইউ জী বললেন, সেটা ছিল জে কৃষ্ণমূর্তির জন্মশতবার্ষিকী আর প্রফেসর মূর্তি বক্তৃতায় জে কে-র নামটাও উল্লেখ করেননি। পরিবর্তে তিনি ইউ জী-র অবস্থা এবং অন্যান্য মিস্টিকদের অবস্থা সাধারণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

ইউ জী আমাদেরকে এসব গম্ভীর কথাবার্তা থেকে বাইরে আনার জন্য বললেন, আমি এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা শোনাই। আমার সঙ্গে প্রফেসর মূর্তির তখন নতুন পরিচয়, আমি সুইজারল্যান্ড থেকে সোজা মূর্তির বাড়িতে উঠব বলে ঠিক করেছি। আমার আসার কথা শুনে অধ্যাপক মূর্তি অনেক লোককে নেমন্তন্ন করেছেন। সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন তাঁর নিজের শ্বশুরমশাই। মূর্তির পত্নী আমেরিকান, দর্শন শিখতে এসে মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করেন। মূর্তি ঠিক করলেন, শ্বশুরমশাইকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একটু রস পান করাবেন। শ্বশুরমশাই মার্কিন সামরিক বিভাগের এক উচ্চপদে থেকে অনেক 'তারকা' কাঁধে চাপিয়ে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেছেন। হাল্কা আলোচনা এবং আপ্যায়ন অভ্যর্থনার ভূমিকা শেষ হয়ে সবে প্রাথমিক বাক্যালাপ শুরু হয়েছে, স্বভাবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাশয়ের কী করা হয়?' ইউ জী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত'। এখানেই যদি শ্বশুরমশাই থেমে যেতেন তাহলে কোনও চিন্তা ছিল না, কিন্তু মুশকিল বাধালেন আরও একটা প্রশ্ন করে, 'কী থেকে অবসরগ্রহণ করা হয়েছে?' ইউ জী নির্বিকার হেসে বললেন, 'আজন্ম অবসরপ্রাপ্ত। রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি, তারপর যখন সব উড়িয়ে দিলাম তখন বহুলোক পাল্লা দিয় সোনার চামচে করে খাওয়ানোর জন্য ডাকাডাকি করছে। কাজ করার সময় পেলাম না।' রণক্লান্ত বীরযোদ্ধার ধমনিতে বহুদিন পরে যেন হঠাৎ নতুন তেজের সঞ্চার হল, হৃদয়ের এক অসাধারণ চাপে রক্তপ্রবাহের গতি আচমকা এমন বেড়ে গেল যে সাহেবের কান ও নাকের ডগা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। প্রফেসর মূর্তি দার্শনিক, তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির—তাই অবস্থা সামলানোর কোনও সুযোগই পেলেন না। লম্বা-চওড়া মার্কিন শ্বশুরমশাই ছোটখাট চেহারার অধ্যাপক-দার্শনিক ভারতীয় জামাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপনার ভাগ্যের তারিফ না করে থাকা সম্ভব নয়; আশা করি ভালো থাকবেন।' তারপরে সোজা উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা ব্যঙ্গভরা হাসি দিয়ে ঘরের শান্তিময় বাতাবরণে ছোট্ট একটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন। আর কোনওদিনই তিনি এ জামাইয়ের ঘরমুখো হননি।

আমার ভাবনা আবার পাখনা মেলল—এরকম একজন নিরীহ ফর্সা বৃদ্ধ আধ্যাত্মিক মানুষ যেন প্রাচীন ভারতের ঋষিজ্ঞান মন্থন করে সারসুধা পান করা এক অকল্পনীয়

চেতনার আধার—অথচ তাঁর কথায় ভেতরে যে জ্বলন সৃষ্টি হয় তা নিজের কানে না শুনলে বা নিজের চোখে না দেখলে কোনওদিন বিশ্বাস করা যাবে না। আমরা আমাদের অজান্তে আমাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে নানারকম প্রতিরূপ তৈরি করে চলেছি। প্রতিটি মানুষ সমাজের সঙ্গে চিন্তার সাহায্যে ভাবনার আদান-প্রদান করে চলেছে, এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অনেক রকম ধারণার সৃষ্টি হয়। এই ধারণাগুলি আমরা সযত্নে পালন করি যদিও জীবন যেভাবে আমাদের চলতে বাধ্য করে তার সঙ্গে এই ধারণাগুলি প্রায় কখনই মেলে না—জন্ম হয় মানসিক যন্ত্রণার। অথচ ধারণাগুলির জন্ম মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে—সেটা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। যদি কখনও ইউ জী-র মতো ক্ষণজন্মা পুরুষ এসব দেখানোর বা বোঝানোর চেষ্টা করেন তখনই মনে হয় আমাদের কাছ থেকে কে যেন জোর করে সেই সযত্নে লালিত নেশার সামগ্রী কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা ভেতরে ভেতরে খুব আঘাত পাই—সেটাই যেন তিনি সবসময় দেখাতে চাইছেন। আমি মনের গাড়িটা থামিয়ে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনি এরকম নিরীহ শান্তিপ্রিয় আনন্দময় লোক অথচ আপনার কথায় এত জ্বলন কেন? ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দেখুন আমি নিজে থেকে কিছুই বলিনি। কিন্তু আপনি যা শোনেন তা আপনার ভেতরের প্রায় নিভে আসা আগুনে হঠাৎ ছিটেফোঁটা তেল পড়ার মতো চড়বড় করে ওঠে, এতেই গুহ (অর্থাৎ আপনার 'আমি') ভেতরে ভেতরে জ্বলে, ভয় পায় পাছে সব শেষ হয়ে যায় বুঝি—এই অন্তর্নাশের আঁচেই একটা জ্বলন বোধ হয়—আর আপনি সেটা অনুবাদ করেন রাগ, দুঃখ বা গভীর হতাশা বলে।

বিকেলে বেশ বড়সড় একটা দল হয়ে গেল, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, নানারকম আলোচনা চলছে, অথচ আমার মনটা অন্তর্মুখী, অনেক কিছু শুনেও শুনি না—কিন্তু যে মুহূর্তে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির প্রসঙ্গ এল সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোযোগ অসাধারণ-ভাবে পালটে গেল। এ সময় আমি লক্ষ্য করলাম ইউ জী-র মধ্যেও যেন একটা পরিবর্তন আসে। জে কে-র নাম শুনলেই ইউ জী-র মধ্যে এক অসীম দৃঢ়তা নেমে আসে এবং মনে হয় যেন কোনও তেজস্বী ঋষি উপনিষদের বই থেকে লাফিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। কিন্তু এ ভাবটা জে কে-র গুণকীর্তন করার জন্য নয়—তাঁকে বিধ্বস্ত করার জন্য যেন যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হচ্ছে। এ এক অবর্ণনীয় রঙ্গভূমি—যেন অর্জুন কাঁদছেন আর অসাধারণ দৃঢ়তায় একের পর

এক অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়তম পিতামহ ভীষ্মের দিকে। আমার ভাবনার কোনও লাগাম নেই। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ছোটে—পৌঁছে গেলাম বাঙ্গালোরে...।

৪.

আমার জীবনে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির আবির্ভাব বাঙ্গালোরে পদার্থবিদ্যায় গবেষণার সময়। জে কে-র লেখা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এমন উচ্চতা লাভ করেছিল যেখানে আগে থাকত বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও মাও দে জং। মনে পড়ল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সাধারণ লাইব্রেরিতে প্রথম চোখে পড়েছিল জে কে-র লেখা একটা বই, 'কমেন্টারিস অন লিভিং' অর্থাৎ জীবনযাত্রার ধারাবিবরণী। পড়তে পড়তে এমন নিমগ্ন হয়ে যেতাম যে মনে থাকত না কখন এবং কেন লাইব্রেরিতে এসেছি। তাঁর লেখায় এমন একটা মর্মভেদী সত্যের প্রকাশ ছিল যা আমার প্রায় হারিয়ে যাওয়া বিবেককে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে বলে মনে হতো। ভাবতাম এই লেখা যেন আমাকে বলছে, বৎস, জেগে ওঠো, নেশার ঘোর কেন কাটছে না, বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে প্রশ্ন করো, কী করছ?

সেই সময় সারাদিন পদার্থবিদ্যার গবেষণা নিয়ে ডুবে থাকতাম আর রাতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারতাম। কখনও কখনও মদ্যপ হয়ে হইচই করে অনেক রাতে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। কৃষ্ণমূর্তির দর্শন আমার মধ্যে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল। মাঝে মাঝে মনে হতো যেন এক অন্তরাত্মা আমাকে বলছে, তুমি কী করছ, কেন করছ, কেন তোমার বৈজ্ঞানিক হওয়ার এত বাসনা? তুমি কি করে ভুলে গেলে যে ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে ছাপোষা চাকুরে হয়ে সমাজের সঙ্গে সমঝোতা করে মনের গভীর ব্যাকুলতাকে গলা চেপে চিরকালের মত নিঃশেষ করে ফেলার চেয়ে কাপুরুষতা আর কিছুই হতে পারে না। এক এক করে কৃষ্ণমূর্তির সমস্ত লেখা পড়ে ফেললাম। নেশা-ভাঙ করা অনেক কমে গেল কিন্তু পুরো বন্ধ হলো না।

কী যে করি জীবনটাকে নিয়ে তারও কোনও উত্তর তাঁর লেখাতে খুঁজে পেলাম না। দেশের শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত

ছিলাম—সে আন্দোলনও ভেঙে গেল কিন্তু জীবনটা গেল না। অথচ জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি বলেন—যদি কখনও বিষাক্ত সাপ দেখ তখন কি তুমি কারও পরামর্শের অপেক্ষায় বসে থাকো না প্রাণপণে দৌড় লাগাও। ঠিক সেরকম তুমি যদি সমাজের বিষাক্ত কাঠামোটা একবার সত্যি সত্যি দর্শন করো তখন আর কাউকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে না যে কী করা উচিত। সেই দর্শন অভ্যন্তরে এক নতুন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এবং এই প্রক্রিয়া নিজের ভেতর থেকেই বলে দেবে কী করা উচিত এবং কী করা অনুচিত। ভাবছিলাম ডক্টরেট করে আর লাভ কি! বরঞ্চ কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশনে একটা শিক্ষকের চাকরি নিয়ে সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশের সান্নিধ্যে বাদবাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব—তাতে করে সত্যসন্ধানের ব্যাপারটা চলতে থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আমার ভবিষ্যৎ যে কীভাবে মোড় নেবে তা আমি কোনওদিন বুঝে উঠতে পারিনি। তাই আমি প্রায়শই ভবিষ্যতকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতাম—অথচ যখনই মনে মনে ঠিক করতাম কোনও একটা বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার কথা, তখনই আমি পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

ঠিক করলাম পিএইচডি-র কাজ যখন এতটা করেই ফেলেছি তখন বাদবাকিটাও খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশনে যোগ দেব। এদিকে গবেষণার কাজ তখন মাঝ সমুদ্রে সাঁতার কাটার মতন, সমানে সাঁতার কেটেই চলেছি, কিন্তু বোঝার উপায় নেই কতটা এগোলাম। কৃষ্ণমূর্তির দর্শন মনের ভেতর থেকে সস্তা রাজনৈতিক চালগুলিকে নতুন করে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমার থিসিস অ্যাডভাইজার যদিও খুব বুদ্ধিমান কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সস্তা চালের লোক, তার প্রতি আমার মাঝে মাঝেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠত। কিন্তু আমি এটা ভালো করেই বুঝেছিলাম যে পিএইচডি যদি করতেই হয়, তাহলে এই ভদ্রলোকের কথা শুনতেই হবে। শেষ পর্যন্ত যদিও পিএইচডি শেষ করলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে কিন্তু ভাগ্যের এক অদ্ভুত পরিহাসে কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশনে আর যাওয়া হল না, উলটে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে বৈজ্ঞানিকের চাকরিতে যোগ দিলাম।

এদিকে আড্ডা পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ইউ জী যথারীতি সমস্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অস্বীকার করছেন অপ্রয়োজনীয় বলে। তিনি যতই অন্যের গভীর অভিজ্ঞতার প্রতি একটা তাচ্ছিল্যভাব দেখান ততই যেন আমার অতীতের কথা

বেশি বেশি করে মনে পড়ে। হঠাৎ মনে পড়ল কীভাবে আমার জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বই পড়ার নেশা কেটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইউ জী-কে বললাম, আমার একটা মজার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল—আপনাকে এটা শুনতেই হবে। তিনি মোটামুটি এসব শুনতে চান না এবং এসবে কোনও ভ্রূক্ষেপও করেন না—অথচ আমার গভীর আগ্রহ দেখে বললেন, ঠিক আছে বলুন। এবং সবার দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হল।

আমি বাঙ্গালোরে বছরখানেক ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করে আমেরিকায় চলে আসি। কিন্তু জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখার ওপর তখনও আমার খুব ভরসা, আধ্যাত্মিক অন্বেষণের কোনও একটা সুরাহা হবেই। অথচ হতাশাও বাড়তে থাকে—সত্যান্বেষণের ভূত ঘাড় থেকে কিছুতেই নামে না—মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে যায় বিশেষতঃ রাতে শোবার সময় এবং এসব ভাবতে ভাবতেই রাতে ঘুমিয়ে পড়তাম। হঠাৎ একদিন ভোর রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি একটা সাদা পাঞ্জাবি পরে আমার সামনে এসে হাজির, বিষণ্ন মুখে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার পর আমার চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, আমার পক্ষে আপনাকে আর সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না—আপনাকে অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—আপনি অন্য কিছু খুঁজে কাজ করা শুরু করুন। ইউ জী সব শুনে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করলেন। বললেন, আপনার স্বপ্ন তো দেখছি অন্যান্য লোকেদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং instructive। বুঝলাম না তিনি রসিকতা করলেন না সত্যি কথা বললেন।

স্কটী স্কটের সঙ্গেও জে কৃষ্ণমূর্তির অনেক মেলামেশা ছিল, কিন্তু পরে সেটায় ভাঙন ধরে। স্কটী মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে অনেক রকম চোট খেয়েছেন তবুও মহিলাদের প্রভাব থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারেননি। এ ব্যাপারে জে কে-র ওপর তাঁর খুবই দুর্বলতা, কারণ পৃথিবী জানত জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি আজন্ম ব্রহ্মচারী। স্কটী স্কট যখন জানলেন যে জে কে-র জীবনেও নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল তখন তিনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তাই জে কে-র কথা উঠলে স্কটী মাঝে মাঝে ইউ জি-র সঙ্গে গলা মেলাতেন। আমার আলোচনা শুনে হুট করে ইউ জী-কে আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন কেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি তাঁর নিজের জীবনের ওপর পর্দা দেওয়ার চেষ্টা করতেন, পৃথিবীর সবাইকে দেখানোর চেষ্টা

করতেন যে তিনি নিজে কামজয়ী একজন একাকী মানুষ—অথচ এখন দেখছি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গেও নাকি তাঁর নিষিদ্ধ সম্পর্ক ছিল। স্কটী স্কটের বলার ধরন দেখে মনে হল যেন এই ব্যাপারটায় তিনি রীতিমতো প্রতারিত হয়েছেন।

ইউ জী-র স্নায়ুতন্ত্রে তখন আগুনের হলকা দেখা দিয়েছে—মুখমণ্ডল রক্তাভ, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, মেরুদণ্ড টানটান, বাঁ দিকের কাঁধটা আমার দিকে উদ্যত করে—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-বাক্যবাণে আমাদের নির্বাক করে দিলেন। "জে কে হলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ভণ্ড আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তা না হলে কি করে এটা সম্ভব—মুখে এক কথা আর কাজ তার পুরো উলটো। শুধু তাই নয়, জে কে জাহাজের নাবিকের মতো—বিশ্বের প্রতিটি বন্দরে বিভিন্ন রসের মহিলার সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক বজায় রাখেন। এইসব লোকেদের বই পড়ে আপনারা তাঁদেরকে এমন একটা উচ্চস্থানে স্থাপিত করেছেন যেখানে কোনও পাপ পৌঁছতে পারে না। এসব লোকেরা আপনাদের মনের সিংহাসনে বসে থাকার প্রবল বাসনায় আপনাদের কাছে নিজেদের সম্বন্ধে এমন চিত্র উপস্থাপন করেন যা কারও পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর নয়। অথচ তাঁদের সংস্পর্শে এলে দেখতে পাবেন তাঁদের জীবন আপনার আমার মতোই বা তার থেকেও অনেক নিকৃষ্ট। নিজেদের কুকীর্তি ঢাকার জন্য তাঁরা এমন কাজ করতে বা এমন মিথ্যা বলতে সক্ষম যা আপনার আমার ধারণার অতীত।"

আমার মনের ভেতর সাজানো তাসের দেশ ততক্ষণে জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। বুঝলাম আমার ভেতরে সযত্নে লালিত মূর্তিগুলিকে ইউ জী কঠোরভাবে বিধ্বংস করার কাজে লেগে গেছেন। আমরা আমাদের তথাকথিত অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল চেষ্টা করি—ওই সমস্ত সামাজিক প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলির সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করে। কেউ যদি সেখানে নির্মম আঘাত হানে—তাহলে সঞ্চিত পুঁজি নষ্ট হওয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তাই এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কষ্টকর। ক্রোধ হল সেই আগুন, যা মনের আবর্জনাকে জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম। সামাজিক মূল্যবোধগুলি বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সমাজ আমাদের সামনে মহান সব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তিত করে ওই মহান লোকেদের মতো হওয়ার যে নিদারুণ প্রবণতা এটা সমাজ আমাদের ওপরে কৌশলে চাপিয়ে

দিয়েছে। সমাজে বীরপূজা এমন একটি রোগ যা প্রতিটি মনের বিশিষ্টতাকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করে ফেলে। পৃথিবীতে অনুকরণ করে আজ পর্যন্ত কেউ মহান হতে পারেনি—অথচ আমরা সবাই-ই প্রায় জ্ঞানে-অজ্ঞানে অন্য কারওর মত হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। এসব বোঝানোর জন্যই হয়তো ইউ জী আমাদের ওপর অগ্নিবাণ বর্ষণ করছিলেন।

৫.

ডাগলাস রোজেনস্টাইন ইউ জী-কে চেনেন বহুদিন ধরে। অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, এবং মনে হল ইউ জী-র দৈহিক গুণগত পরিবর্তনের সাক্ষী হিসাবে তিনি এখানে এসেছেন। ডাগলাসের যখন ১৭ বছর বয়স তখন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতা শুনতে সুইজারল্যান্ডের সানেন উপত্যকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ১৯৬৬ সালে ইউ জী-র সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ১৯৬৭ সালে যখন ইউ জী-র মধ্যে অসাধারণ সেই পরিবর্তন ঘটে তখনও ডাগলাস সানেন উপত্যকায় ছিলেন। ডাগলাসের এখানে আসাটা আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হল। আমার সাথে তাঁর পরিচয় বেশ গভীর হল। দুই কৃষ্ণমূর্তিকেই তিনি বহুদিন ধরে জানেন। যখন টের পেলেন যে আমি কৃষ্ণমূর্তির সমস্ত লেখা গুলে খেয়েছি তখন খুব উৎসাহিত হলেন। আমরা ঠিক করলাম এযাত্রা ইউ জী যতই গালাগালি করুক না কেন আমরা পুরো ব্যাপারটা না জেনে কিছুতেই এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি না।

ডাগলাস আমাকে গোপনে বললেন, ইউ জী-র তখন ৪৯ বছর বয়স, তখন তাঁর এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়—তার ওপর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এতই গভীর যে তাঁর দৃঢ়তার কোনও সীমা ছিল না। যদিও সেই সময় তিনি জে কে-র সম্পর্কে কোনও নিন্দামন্দ করতেন না—উলটে বলতেন যে জে কে-র মধ্যে যেন প্রকৃতিসৃষ্ট একটা অভিনব শক্তির উৎস আছে। এমন কোনও লোক আজ পর্যন্ত দেখিনি যে সামনা-সামনি কৃষ্ণমূর্তিকে অগ্রাহ্য করেছেন—অকল্পনীয় তাঁর ব্যক্তিত্ব। দুই কৃষ্ণমূর্তি যেন প্রাচীন ভারতের দু'টো আধাত্মিক স্তম্ভ। ইউ জী নিজে ১৯৬৭ সালে জে কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন এবং নিয়মিত সেখানে উপস্থিত থাকতেন—এসব বক্তৃতাই নাকি ইউ জী-কে এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছিল যা ইউ জী-র নিজের কাছেই একটা বিপত্তিকর ঘটনা বলে মনে হয়েছিল—সেটা কোনও অনন্ত-অসীম আনন্দের অবস্থা নয়, শুধু নির্বাণের নিদারুণ নিদাঘ—পরে এর সাক্ষী পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ডাগলাস অনেক কষ্টে ইউ জী-কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সবাইকে থামিয়ে তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই—তাতে আপনার যতই আপত্তি থাকুক না কেন—আমার মনে হয় সবারই একথা শোনা দরকার।" ইউ জী ডাগলাসের আগ্রহকে সম্মান দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, বলুন, কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি আমি আপনার কথায় একমত নই।"

ডাগলাস বললেন, "ওই জে কৃষ্ণমূর্তি তাঁর সমস্ত জীবন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে-দর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন, তা যদি তিনি না করতেন তাহলে আপনি এখন যা বলছেন তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমরা বুঝতাম না। এবং আপনার দিকে কোনওভাবেই আকর্ষিত হতাম না। তার মানে এই নয় যে এখন আমরা আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলেছি—অন্তত আপনার কথা শোনার জন্য এবং আপনার সঙ্গলাভের জন্য যে আগ্রহ আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে—তার ভিত্তিপ্রস্তর শুরু হয়েছিল জে কে-র বই পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ দিতে চাই। যিশু খ্রিস্ট আসার আগেই জন দ্য ব্যাপটিস্ট চারিদিকে সবার মধ্যে এক অদ্ভুত সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং যিশুর কাজের জন্য এক উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন—কেন জানি না এটাই আমার সবসময় মনে হয়।"

মহেশ ভাট চিৎকার করে বললেন, সবাই তাহলে এগিয়ে আসুন, আমরা ইউ জী-কে হত্যা করি, দেখি কেমন করে তিনি আবার বেঁচে ওঠেন। সবাই হাসছে অথচ এইসব দ্বান্দ্বিক আলোচনা আমার মাথায় যেন আগুনে ঘি ঢেলে দিল—অস্থির লাগছে—আর বসে থাকতে পারলাম না, ভাবলাম একটু পায়চারি করে, চোখেমুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আবার ফিরব। নিঃশব্দে বাইরে চলে গেলাম—আপন মনে হাঁটতে লাগলাম। পাম স্প্রীং তখন সূর্যের প্রখর তাপে ভাস্বর, সামনে মরুভূমি কিন্তু ধু-ধু করা বালির মরুভূমি নয়, ছোট ছোট আগাছা, কাঁটাগাছ, ক্যাকটাস আর ধূসর জমি। কয়েক মাইল দূরে ছোট ছোট পাহাড় বুক উঁচিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘমুক্ত আকাশের বুকে আধুনিক সভ্যতা মাঝে মাঝে সাদা লাইন টেনে দিচ্ছে এবং সেই বাষ্পরেখা ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে হালকা হতে হতে মিলিয়ে

যাচ্ছে। লজের ছোট পাঁচিলের ঠিক গা-ঘেঁষে সোজা উপরে উঠে গেছে কিছু তালগাছ। হালকা নীল আকাশের মধ্যে ঘন গাঢ় সবুজ রঙের কয়েকটা পাতা মেলে ধরেছে। মনে পড়ল ছোটবেলার কথা, রবীন্দ্রনগরে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরুর তালগাছ কবিতাটা একনিঃশ্বাসে অর্ধেকটা বলে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিলাম।

সেই সেদিনের রবীন্দ্রনগর ছেড়ে কত শত জায়গা ঘুরে কত বিভিন্ন ধরনের লোকজনের প্রভাব পেরিয়ে আজ কেন এখানে সাতসমুদ্র পার করে এমন একটা জায়গায় এমন একজন লোকের সঙ্গে গভীর আবেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তা হয়তো কোনওদিনই আমার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। জানি না এ আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, এর পরিণতিই বা কী, আর এটা কোথায় এনে দাঁড় করাবে আমাকে—, এসব ভাবতে ভাবতে জুলী থেয়ারের ঘরে এসে হাজির হলাম এবং সটান তার সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। মনটা সমানে অতীত মন্থন করে চলেছে—ভাবছি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা, ভাবছি ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির কথা। মনে পড়ল জে কে-র স্বপ্নাদেশের কথা—আমি সত্যসন্ধানের জন্য এত ব্যাকুল কিন্তু তার জন্য করছিটা কী? কিছু একটা করা দরকার—এই সুবাদে রামচন্দ্র মিশন বলে এক আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম—শুরু হয়েছিল আমার সাধনা—রাজযোগ। ধ্যানে আমার কত রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল—মনে পড়ল সেসবের কথা! হঠাৎ মনের গতি একটা বিশেষ জায়গায় এসে পুরোপুরি থেমে গেল।

মাত্র সাড়ে চার বছর আগে আমি ধ্যান-তপস্যা শুরু করি—আর শুরু করার ছ'মাস বাদেই একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা যেন আমাকে কিছু একটা বলতে চাইছিল—যখন সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তখন অনেক চিন্তাভাবনা করেও আমি তার কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পাইনি। বুঝিনি এই দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রত্যাদেশ, যাকে ইংরেজিতে বলে Vision in trance, তার তাৎপর্য কী। যদিও আমি কোনওরকম সিদ্ধান্তজাত মতামতে এসে হাজির হতে পারিনি, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার পর ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতা আমাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল। তখন সারা দিন-রাত আমি শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতাম এবং নিয়মিত বেশ কয়েক ঘণ্টা ধ্যান করতাম। সময়ের প্রলেপ ধীরে ধীরে সেসব অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছিল—আর আজ হঠাৎ কেন জানি না সেই জাগ্রত-দর্শনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি

আমার শরীরে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করল। দেহের সমস্ত লোমকূপ পরিষ্কারভাবে আমার হালকারঙের চামড়ার ওপর তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করল। উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল যেন সব এখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি।

সোফা থেকে উঠে সোজা দৌড় লাগালাম ইউ জী-র ঘরের দিকে—জুলী এবং স্কটী স্কট বললেন, কী ব্যাপার? আমি বললাম, যত তাড়াতাড়ি পারুন ইউ জী-র ঘরে চলে আসুন। এখন এই ঘটনাটা লিখতে লিখতে আমার এক বৈজ্ঞানিকের কথা মনে পড়ল—আমার দৌড়টা আমাকে আর্কিমিডিসের সেই হঠাৎ আবিষ্কারের পর যা হয়েছিল সেই কথাই মনে করিয়ে দিল। নগ্ন আর্কিমিডিস স্নান করার চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে রাজপথ ধরে রাজপ্রাসাদের দিকে দৌড় লাগিয়েছিলেন—সোনার মুকুটে ভেজাল আছে কি না তা মুকুট না ভেঙে কীভাবে জানা যাবে সেটা মনে মনে আবিষ্কার করে ফেলেছেন—একথা রাজাকে জানানোর জন্য। আর আমি খালি পায়ে, চামড়া-জ্বালানো কালো রাস্তার ওপর দিয়ে 'বুঝেছি, বুঝেছি' বলে দৌড়েছিলাম ইউ জী-র ঘরের দিকে। ভেবেছিলাম আমি জেনেছি ইউ জী-র প্রকৃত পরিচয়। তাই তাঁকে সেকথা বলবার জন্য আমার ব্যাকুলতা। ঘরে তখন ছিলেন ল্যারি মরিস, সুজান ন্যাটলটন, ডাগলাস, রোজেনস্টাইন, মারিও ভিজ্জিয়ানো, লিসা টোরান্টো, মহেশ ভাট, অলিভিয়া, তনুজা চন্দ্রা, ড. রবার্ট পামিস্ট। ইউ জী-কে বললাম আমি একটা ঘটনা আপনাকে বলতে চাই—এটা আপনাকে শুনতেই হবে। ডাগলাসকে বললাম, আপনি এটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন—হয়তো আপনার তত্ত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে জুলী থেয়ার এবং স্কটী স্কট এসে হাজির হলেন। সবার সামনে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমার অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত পশ্চাৎপট এবং অভিজ্ঞতার কথা বললাম। ইউ জী নিঃশব্দে আমার কথা শুনতে লাগলেন।

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির স্বপ্নাদেশের পর আমি রামচন্দ্র মিশন বলে এক আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। মিশনের আদিগুরু শ্রী রামচন্দ্র উত্তরপ্রদেশের লোক। কিছুদিন ধ্যান করার পর তাঁর একটি লেখা থেকে জেনেছিলাম যে সাধনার সবচেয়ে ভালো সময় হল রাত দু'টো। তাঁর শিষ্য যিনি এই মিশন শুরু করেছিলেন, তিনি উত্তরপ্রদেশের নিকটবর্তী শাজাহানপুরের লোক এবং তাঁর নামও

শ্রী রামচন্দ্র। তিনিও শিষ্যদের বলতেন, যার ঘুম আপনা-আপনি রাত দু'টোয় ভেঙে যায় এবং তারপর যে ধ্যান করে সেই প্রকৃত সাধক। ব্যাস, শুরু হল আমার রাত দু'টোয় নিয়মিত ধ্যান করা। কিছুদিন ধ্যান করার পর হঠাৎ এক রাতে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। মিশনের নিয়ম হল রোজ ধ্যানের পর কিছুক্ষণ বসে থেকে মনে করতে হবে যে কী অভিজ্ঞতা হল এবং সেটা ডায়েরিতে লিখে রাখা। সেদিন ধ্যান শেষ করে অন্ধকারে বসে আছি—চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবছি, ধ্যানের সময় এমন কোনও অনুভূতি হয়েছিল কি না যা লিখে রাখার যোগ্য। অকস্মাৎ মনে হল মাথার মধ্যে কী যেন হচ্ছে—কী যেন আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলছে—একটা আলোড়ন আমাকে আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে—অত্যন্ত হালকা হয়ে গেলাম। যেন উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আমি কোনও স্বপ্ন দেখছি না—সম্পূর্ণ জাগ্রত—মনে হল আমি কোথায় যেন চলে যাচ্ছি—জানি না কোথায়। তাই প্রতিটি মুহূর্ত দমবন্ধ করা রোমাঞ্চকর।

পরিষ্কার দেখলাম আমি ধীরে ধীরে আমেরিকার মাটি ছেড়ে পাখির মতো উপরে উঠে যাচ্ছি। নিচের গাছপালা, ঘরবাড়ি ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল, মেঘের অনেক উপরে উঠে গেছি এবং সমানে উড়ে চলেছি। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর নামতে শুরু করলাম এবং অনেক নিচে নেমে পাখির মতো গাছপালার উপর দিয়ে উড়ে চললাম। ছোট ছোট গ্রাম অতিক্রম করে, যখন ধানখেতের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি তখন বুঝলাম ভারতে এসে গেছি। তবে বুঝতে পারলাম না এটা কোন শতাব্দীর দৃশ্য। উড়তে উড়তে একটা ছোট জলাশয়, সুন্দর বাগান পার হয়ে একটা খোলা উঠানের সামনে এসে হাজির হলাম—সামনে ছোটখাট একটি বেদি—তার ওপর টানটান হয়ে বসে আছেন এক ঋষি—ধ্যানমগ্ন। বার কয়েক ঋষির মাথার উপর চক্কর মেরে আবার এগিয়ে চললাম। সেই গ্রামের পর আবার ধানখেত, একটি ছোটখাট নদী। এসব অতিক্রম করে অন্য একটা গ্রামের প্রান্তে এসে হাজির হলাম। গ্রামে ঢুকতেই বাঁশের চালাঘরের মতো একটা কাঠামো চোখে পড়ল। দেখি সেই চালাঘরের বারান্দায় বসে আছেন এক সুন্দরী নারী। হাঁটু ভেঙে দু'টো পা একই দিকে রেখে বসে আছেন—কোলে সম্পূর্ণ নগ্ন এক বালক শিশু। ভদ্রমহিলা শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি—আরও কাছে গেলাম—দেখি বালকের মাথায় মণিমাণিক্যখচিত একটা স্বর্ণচূড়া—বিস্ময়ে আমি হতবাক, শ্বাসরুদ্ধ। এতবড় একটা মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণচূড়া

পরে মায়ের খোলা স্তন থেকে দুধ খাচ্ছে—তাতে মায়ের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর, একই রাস্তা ধরে ফেরা শুরু করলাম। আবার দেখা হল সেই ঋষির সঙ্গে। ততক্ষণে তাঁর ধ্যান করা শেষ হয়েছে। আমি এবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে দৈববাণীর মতো পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষায় বললেন, 'এই বালক একদিন তোমার জগৎ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করে দেবে।' তারপর উড়তে উড়তে নিজের মধ্যে ফিরে এলাম—আমেরিকার নিউ জার্সিতে।

ঘরে তখন স্তব্ধতার গভীরতা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দেও অস্বস্তি লাগছিল। সবাই আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। ইউ জী শুধু হাসছেন, আমি আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমার উত্তেজনা এবং তথাকথিত আবিষ্কারের কথা জানালাম, সেই জাগ্রত-দর্শন, যা আমি পুরো ভুলেই গিয়েছিলাম, সেটা হঠাৎ মনে পড়া, হয়তো এ সভায় সবাইকে বলার জন্যই আমার চেতনায় পুনর্বার জেগে ওঠে। এতদিনে বুঝলাম কে সেই ঋষি, আর কে-ই বা সেই মুকুটপরা বালক শিশু। সেই ঋষি হলেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি। আর সেই বালকটি আর কেউ নয় স্বয়ং ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি। ডাগলাস রোজেনস্টাইন আনন্দে আটখানা যেন আজ তার তত্ত্বের একটা পরীক্ষামূলক প্রমাণ মিলল। ভরসা পেয়ে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ওই রকম চোখ ঝলসানো মণিমাণিক্যখচিত একটা স্বর্ণচূড়া মাথায় থাকার তাৎপর্য কি? ইউ জী মুচকি মুচকি হাসছেন, মহেশ ভাটও ইউ জী-র মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। এবার ইউ জী মুখ খুললেন কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিলেন না। বললেন, আপনি যা দেখেছেন সেটা হয়তো ঠিক, কিন্তু আপনার রায়টা ঠিক নয়। সে বালকটি অন্য আর কেউ নয়, আপনি নিজে। জানি না ঘরের অন্য সবাই কী ভাবল আর না ভাবল, আমি কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না। কারণ একথা আমার কখনই মনে আসেনি যে আমার জীবনের কোনও গুরুত্ব আছে। মনে মনে ভাবলাম ইউ জী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। এমন অদ্ভুতভাবে তিনি পরিস্থিতি পালটাতে পারেন যা তাঁর সঙ্গে সময় না কাটালে কিছুতেই বোঝা যাবে না। ডাগলাসের কানে এসব কোনও কথাই গেছে কি না জানি না—জে কে এবং ইউ জী-র ব্যাপারটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। আনন্দের অতিশয্যে ঘাড় ঘুরিয়ে সবাইকে নিজের মুখটা দেখালেন এবং ইউ জী-কে বললেন, স্যার, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি যে-গণ্ডগোল বাধিয়ে চারিদিকে এত আবর্জনা সৃষ্টি করে গেছেন বুঝতে পারছি না সেইসব পরিষ্কার

করার দায়িত্বটা কীভাবে আপনার ওপর চেপে গেল। ইউ জী কিন্তু কোনওরকম সমঝোতার পাত্র নন, তিনি বললেন, থাকো তুমি তোমার মায়াজালে বদ্ধ হয়ে, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

দুপুরের আড্ডা শেষ—কিন্তু আমার মাথায় আমার জ্ঞান আর ইউ জী-র কথাবার্তা মিলেমিশে এক অদ্ভুত ভাবনার জন্ম নিচ্ছে। ইউ জী সমানে অস্বীকার করছেন, বলছেন আপনারা কোথায় যে জে কে-র শিক্ষার সঙ্গে আমার কথার মিল দেখতে পান তার আমি কোনও হদিস খুঁজে পাই না। আমি শুধু ভাবছি এসবের সারমর্ম কি? মানুষের কোনওরকম পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। মনুষ্যদেহ প্রকৃতির এক অপূর্ব কীর্তি, প্রকৃতির কাজ এমনই সুসম্পূর্ণ যে কোনও কিছু পালটাতে যাওয়ার মধ্য দিয়েই আসলে সৃষ্টি হয় কঠিন সমস্যার। যে কাঠামো এক অপরিসীম শান্তির আধার সেই কাঠামোতে অস্তিত্বহীন, কাল্পনিক সচ্চিদানন্দের অবস্থান ঘটানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে দুর্বিষহ নরকের, জীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য যন্ত্রণাময়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জোর করে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের প্রয়াস, ইন্দ্রিয়গুলিকে দুর্বল করতে করতে তার সংবেদনশীলতা বিনাশ করে দেয়। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কালযাপন করে। এই দ্বন্দ্বেই সৃষ্টি হয় গভীর মানসিক যন্ত্রণা। প্রকৃতির সঙ্গে ঐকিকভাবে, দেহের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বসবাস করার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকা দরকার, কোনও মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক এককীকরণ একটি মায়া, মরীচিকার পেছনে ছোটার মতো। যদি চিন্তার ভার থেকে মানুষ কোনওভাবে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন দেহের গ্ল্যান্ডগুলি হয়তো আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গুলি এমন সজীব হয়ে ওঠে যে সেইসব মানুষকে সমাজ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না, হয় পাগল বলে অভিহিত করে, নয়তো ভগবান বলে পুজো করে।

৬.

সন্ধ্যার আড্ডায় ইউ জী বারবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন বাদবাকি দশদিন আমরা কীভাবে কাটাব। নানা রকম পরামর্শ এল। অনেক মতামতের আদান-প্রদান হল। অবশেষে ঠিক হল আমাদের নেভাদার বিখ্যাত ক্যাসিনো সিটি লাস ভেগাসে অবশ্যই যাওয়া দরকার। তাছাড়া লস এঞ্জেলেসের হলিউডে একদিন, পাহাড়ের ওপর আইডল ওয়াইল্ডে একদিন এবং আশপাশের ছোট ছোট জায়গা দেখারও পরিকল্পনা হয়ে গেল। সেদিন ইউ জী-র ঘর থেকে বেরিয়ে আসার কিছু আগে, সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে—যে যার নিজের নিজের ভাবনার জগতে নিমগ্ন—আমি ভাবছি, আর ভেতরে ভেতরে নিদারুণ হতাশা। কোনও কূল-কিনারা চোখে পড়ছে না। কিছুই তো করার নেই—মানুষের কেন এত বুদ্ধি, কেন এত স্মৃতিশক্তি—এসবের প্রয়োজনীয়তা হয়তো আমরা আমাদের অজান্তেই সৃষ্টি করেছি, আর ক্রমাগত তা বাড়িয়ে চলেছি। ইউ জী-র গলার শব্দে সবার ধ্যান ভাঙল। সবাই তাঁর দিকে মনোযোগ দিলেন। এবার ইউ জী বললেন, আমি আপনাদের একটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করছি, এটা আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। সবার দিকে ভালো করে তাকালেন এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে পরিষ্কারভাবে নির্দ্বিধায় বলতে শুরু করলেন, "আমার মধ্যে যে আমূল শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে—যাকে আমি 'ক্যালামিটি' বলি—তা আপনাদের কারওর মধ্যে ঘটবার প্রায় কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি সেইসব ঘটনার সত্যি সত্যি কোনও সম্ভাবনা আপনাদের কোনও একজনের মধ্যেও থাকত, তাহলে তাঁর এখানে উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজন হতো না।" আমি আমার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এটা তিনি কী বললেন—কেন বললেন—একটা রহস্য আমাকে গ্রাস করে ফেলল।

আমি কি করে জানব যে আমি যা শুনছি—সবাই তা-ই শুনছে। আমার কাছে যার অসাধারণ গুরুত্ব, তাতে কারওরই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সবার মুখের দিকে অবাক হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করার চেষ্টা করছিলাম, কোনও প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করিনি। কেউ

ব্যাপারটা গুরুতরভাবে গ্রহণ করল না। ইউ জী কী বলতে চান, কেন মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যার মধ্যে আমি গভীর আধ্যাত্মিকতার সুর খুঁজে পাই—এ কি আমার বোঝার গণ্ডগোল, নাকি তিনি শুধু আমাকেই বলছেন। অথচ মহেশ ভাট বলেন, ইউ জী একথাই মানেন যে তাঁর মধ্যে যা আছে, আমাদের সবার মধ্যেই তা আছে। ভাবলাম আমার গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা হয়তো আমাকে ভুল শুনতে বাধ্য করছে—কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার গতি পালটে যায়। ভাবি তিনি হয়তো বলছেন—আমি তো সরাসরি বলতে পারি না আমার কী আছে আর না আছে, একবার পরখ করে দেখুন তাহলেই টের পাবেন। পরখ করতে হলে গ্রহণ করার মতো মুক্ত মানসিকতা থাকতে হবে। যেহেতু আপনাদের সেটা নিজের থেকে ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই, সেহেতু এই ব্যক্তির উপস্থিতি এবং আপনাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ—সেই সূত্রে সান্নিধ্য, আপনাদের আধ্যাত্মিকতায় অনেকটা সাহায্য করলেও করতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে সবার শুভরাত্রির সম্ভাষণ শুনলাম। নিজের মধ্যে সমাহিত হতে হতে কানে এল ইউ জী-র মৃদুরাগের নিমন্ত্রণবাণী, "কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় আসবেন কিন্তু।" গভীর আবেগে সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

রাতে ঘরে ফেরার আগে জুলীর সঙ্গে আরেক পশলা আড্ডা হয় তার ঘরে, সেই ওকোটিলো লজেরই অপরপ্রান্তে। এখানেই আমি ও জুলী ভ্যানিলা আইসক্রিম এবং আলফানসো আমের রস একসাথে খাওয়ার প্রচলন শুরু করি। সে এক অদ্ভুত সুস্বাদু মিশ্রণ! রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমার লজে ফেরার আগে জুলী আমায় বলল, দেখুন আমার তো সকাল ন'টার আগে ইউ জী-র ঘরে যাওয়ার কোনও অনুমতি নেই—তাই যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনা হয় সেটা মনে রাখবেন এবং আমাকে সবিস্তারে জানাবেন। আর একটা কথা, যদি কখনও এরকম ইঙ্গিত পান যে আমি আসতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন। আমি সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকেই অপেক্ষা করব। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমার লজের দিকে রওনা দিলাম। ওকোটিলো লজ থেকে আমার লজের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা পরিত্যক্ত জমি। হেঁটেই যাই। মাথার উপর পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। তারায় তারায় ভর্তি। মরুভূমি রাতে দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে। আশপাশের ছোট ছোট আগাছার চারদিকে নানারকমের কীটপতঙ্গ তাদের নৈশকালীন তৎপরতা শুরু করে। শুনেছি কাঁকড়াবিছে, ইঁদুরজাতীয় জন্তুরা আসে এসব কীটপতঙ্গ খেতে, আর

র‍্যাটল সাপ, ভাইপার আসে ইঁদুর খেতে। এ পর্যন্ত আমার চোখে অবশ্য বড় কিছু ধরা পড়েনি। ফাঁকা জমিটা পার হয়ে লজের সামনে এসে গেটে ঢোকার আগে ভাবলাম এক প্যাকেট সিগারেট কিনব কি না—আজ কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছে—রাতে শোবার আগে মাঝে মাঝেই একটা সিগারেট খেতাম—আজ মনে হল খাই একটা—অবশেষে সিগারেট না কিনেই লজে ফিরে এলাম।

যথারীতি রাতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি, চোখে ঘুম নেই। ইউ জী-র একটা কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে—কুকুরের স্মরণশক্তি সে কাজে লাগায় তার প্রভুকে চেনার জন্য, আর ঠিক রাস্তা চিনে ঘরে ফেরবার জন্য। আবার আজ বললেন যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে এবং তাঁর সঙ্গে অনেক সময় কাটায় তাদের ইউ জী-র জীবনে যে ক্যালামিটি ঘটেছে তা কোনওদিন ঘটবে না। যদি সেরকম কোনও সম্ভাবনা থেকে থাকে, তাহলে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মাথায় কত রকমের ভাবনা জাগছে। ভাবছি, যদি জীবজগতের গতিপ্রকৃতির ওপর গভীরভাবে নজর দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রতিটি কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীজগৎটাই যেন যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে। প্রতিটি প্রাণীর ভেতরে যেন প্রোগ্রাম করা একটা কম্পিউটার আছে। আর কম্পিউটারের আদেশ অনুযায়ী তারা কাজ করে চলেছে। সেখানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার বা মনঃক্ষুণ্ন হবার কোনও অবকাশ নেই—শুধু মাথার মধ্যে প্রকৃতির লেখা একটি আদেশ, আর সেই আদেশ অনুযায়ী আজন্ম কাজ করে যাওয়া। অথচ মানুষের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্ঘাত, অন্তর্দাহ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মানুষের এই দ্বন্দ্বমূলক কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট করার দিকে এগোচ্ছে। মানুষ হয়তো প্রকৃতির নিয়মমাফিক চলছে না—তাই প্রকৃতি মানুষের অত্যাচারে জর্জরিত। ভাবছি মানুষ যদি এমন একটা কম্পিউটার আবিষ্কার করে, যে মানুষের আদেশ পালন করতে দ্বিধাবোধ করে, তাহলে মানুষের কাছে সে কম্পিউটারের আর কি কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? মানুষ হয়তো প্রকৃতির এমনই একটা অবাধ্য সৃষ্টি—তাই এত যন্ত্রণাদায়ক!!

আমি কি কোনওদিন জানতে পারব আমাদের ভেতরে প্রকৃতির লেখা এমন কি কোনও আদেশ আছে যা পালন করার অর্থ প্রকৃতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা? এমন কথা হয়তো কোনও মানুষ কোনওদিন জানতে পারবে না—তাই সেকথা অন্য কাউকে বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবুও আমার ভেতরে এসব

জানার আগ্রহ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। ইউ জী এর কোনও সরাসরি উত্তর দেন না—হ্যাঁ বা না কোনওটাই বলেন না। শুধু বলেন, এসব মানুষের অর্থহীন প্রশ্ন—তাই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাহলে আমি এখানে কী করছি? একেকবার মনে হয় আগামীকাল সোজা বাড়ি চলে যাই। এসব আমার পাগলামি। যাদের কোনও কাজকর্ম নেই তারা এভাবে বসে বসে পয়সা খরচ করে টাইমপাস করতে পারে। যথারীতি পরবর্তী মুহূর্তেই মনে হল, সারাজীবন ধরে সত্যকে উপলব্ধি করার অদম্য আগ্রহ এবং ব্যাকুলতাই হয়তো আজ আমাকে এখানে এনে হাজির করেছে। তাই এখান থেকে এ অবস্থায় এভাবে চলে যাওয়াটা হঠকারিতা হবে। আমার আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকা দরকার। তাছাড়া একটা গভীর সততা এবং অকৃত্রিম জীবনসত্তা ইউ জী-র সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে এমনভাবে প্রস্ফুটিত যা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কাজে কাজেই তিনি এমন একটা মানুষ যিনি কাউকে কোনওদিন কোনও ক্ষতি করতে সক্ষম নন—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ইউ জী-র ঘরে কফি খেতে হাজির হলাম। দেখি মহেশ ভাট ততক্ষণে হাজির। কে জানে কোন সকালে এসেছেন—একটা কালো ফতুয়া পরে পায়চারি করছেন। মনে হল যেন কোনও ইসাই ধর্মযাজক বিপাকে পড়ে বিশ্বপিতার কাছে সমস্যার সমাধান চাইতে এসেছেন। ইউ জী কফি তৈরি করে আমাদের ডাকলেন। আমরা কফি নিয়ে কার্পেটে বসে পড়লাম। তিনজনে নিঃশব্দে কফি শেষ করে যে যার কাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার শুকনো কাপ যেখানে রাখা দরকার সেখানে রেখে সোফায় এসে বসলাম। ইউ জী-র রান্নাঘরে, বসার ঘরে, বারান্দায় বা ব্যালকনিতে একটা অলিখিত নিয়ম আছে যা কেউ কাউকে বলে না কিন্তু সবাই জানে। যেখানে যা আছে তা ঠিক সেখানেই থাকবে। যদি বসার ঘরে টেবিলের ডানদিকে একটা ছোট পেনদানীতে একটা পেনসিল থাকে তাহলে পেনসিল ব্যবহার করার পর সবাই জানে যে পেনসিলটা ঠিক সেখানেই রাখতে হবে। কারণ যদি কখনও কেউ পেনসিল চায় ইউ জী যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে টেবিলের ডানদিকে পেনদানীতে হাত বাড়ান, তখন তিনি টের পান যে পেনসিল জায়গা মতো রাখতে কেউ ভুলে গিয়েছিল কি না। তিনি যখন যা করেন, দেখলে সবার মনে হবে যেন পৃথিবীতে সেই কাজ করা ছাড়া তাঁর আর কোনও ভাবনাচিন্তা

নেই। কি করে এই আটাত্তর বছরের মানুষটি এভাবে দিন কাটান ভাবতে আমার খুবই আশ্চর্য লাগে।

এই ঘরে ভোরের নিস্তব্ধতা অত্যন্ত গভীর। আমার ভাবনাচিন্তা একে কলুষিত করতে পারে না। আমি ধীরে ধীরে সবাইকে এই কাকডাকা ভোরের ঘনঘোর থেকে বার করে আনার জন্য মহেশ ভাটকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শুনেছি আপনি পুনার রজনীশ আশ্রম থেকে চলে আসার পর, তাঁর নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দেওয়া তুলসীর মালা কমোডে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এ খবর আশ্রমে চলে যায়—এর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি?" ইউ জী আমায় বললেন, মহেশ ভাট রজনীশ আশ্রমের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে যখন চলে আসেন তখন রজনীশ অত্যন্ত রেগে যান। মহেশ ভাটের প্রিয় বন্ধু বিনোদ খান্নার মারফৎ খবর পাঠান যে মহেশ ভাট যেন নিজে এসে মালা ফিরিয়ে দেন নয়তো রজনীশ মহেশ ভাটকে ধ্বংস করে ফেলবেন। ইউ জী আবার বললেন, রজনীশ মহেশ ভাটকে তো কিছু করতেই পারেননি, উলটে নিজে মরে ভূত হয়ে গেছেন। আর মহেশ ভাট এখন ভারতবর্ষের গণমান্য চিত্রপরিচালক। তখন মহেশ ভাট বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, যে রজনীশ চিরকাল মুক্ত প্রেমের কথা বললেন, আর বললেন ঐশ্বরিক প্রেম নিষ্কাম, এতে প্রতিদানের কোনওরকম ভাবনা থাকা একেবারে অসম্ভব—সেই ভগবান রজনীশ সামান্য এক শিষ্যের প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেননি। তাঁর ব্যবহার এটাই প্রমাণ করেছিল যে তিনি অন্য সমস্ত সাধারণ মানুষের মতোই হিংসা-দ্বেষের অধীন।

রজনীশ এ ঘটনার কিছুদিন পরে আমেরিকায় চলে যান এবং আমেরিকায় তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। আমেরিকার পুলিশ ড্রাগ এবং অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভিযোগে হাতে হাতকড়ি এবং পায়ে ডান্ডাবেড়ি বেঁধে তাঁকে লকআপে খুনি-বদমাশদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন রেখে দেয়। তারপর যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন পুনায় একবার তাঁর সঙ্গে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ হয়—এক নিঃশ্বাসে মহেশ ভাট আমাকে এইসব কথা বললেন। আবার বললেন, যখন আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়, তখন তিনি আমায় ভর্ৎসনার সুরে অনেক কিছু বলে আমার মানসিক শক্তিতে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমার বারবার

মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত শব্দবাণ আমাকে ছোঁয়ার আগেই নির্জীব হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, কিন্তু আপনি কেন আমার এইসব কথা জানতে চাইছেন?

আমি তখন বললাম আমার আধ্যাত্মিক সংগঠনের সঙ্গে আমার গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার কথা। বর্তমানে যিনি সংস্থার সভাপতি তাঁর কথা। আমি ধ্যান করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছি—তাই সংস্থার বন্ধুবান্ধবরা ধরেছে, এবং পীড়াপীড়ি করছে—সভাপতি শ্রী পার্থসারথী রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে যেন একবার দেখা করি। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নিউইয়র্কে আসছেন, তাই হয়তো দেখা করাটা এড়িয়ে যাওয়ার অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমার মধ্যে এই বিশ্বাস এখন বদ্ধমূল যে কোনও গুরুর পক্ষে ঈশ্বর উপলব্ধির ব্যাপারটা অন্য কাউকে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই মিশনের বর্তমান গুরুর সঙ্গে দেখা করার কোনওরকম বাসনাই আমার মধ্যে জাগে না। শুধু তাই নয় আমি খুব ভালো করেই জানি তিনি আমায় কী করতে বলবেন আর আমি যদি সামনা-সামনি তাঁর উপদেশ প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যা আমি খুবই অপছন্দ করি—এটাই হল আমার বর্তমান মাথাব্যথা। মহেশ ভাট আমার সব কথা ভালো করে শুনে বললেন, "আপনার এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি। জানি না আপনার সঙ্গে আপনার গুরুর সম্পর্কটা কীরকম। কিন্তু আমি আমার গুরু রজনীশকে খুব ভয় পেতাম, স্বয়ং ভগবান বলে মনে করতাম। তাই আপনার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তবে একটা কথা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জোর দিয়ে বলতে পারি—আপনি আগুনের সঙ্গে খেলা করতে এসেছেন, আর গরমকে ভয় পাচ্ছেন, এটা কি করে সম্ভব!"

একটা জিনিস আমার মধ্যে অসীম সাহস জোগায় এবং আমাকে নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে, আর সেটা হল আমি যা করি তার একটাই উদ্দেশ্য 'সত্য দর্শন'—যেহেতু এর মধ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ নেই, সেহেতু এই সততার শক্তি যে কত প্রবল সে জিনিস আমি আমার নিজের জীবনে বহুবার প্রমাণ পেয়েছি। এ ব্যাপারটা আমি কাউকে কোনওদিন প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে পারব না—সেটা শুধু জানেন আমার অন্তর্যামী—তাই আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যটাও হয়তো চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।

৭.

ইউ জী-র লম্বা-লম্বা সাদা-কালো চুল কান ঢেকে রাখে। সেদিন নিশ্চয়ই মাথায় শ্যাম্পু লাগিয়ে স্নান করেছেন। হালকা ঝকঝকে ভাব আর হাসিমুখে লেগেছিল এক অদ্ভুত ঐশ্বরিক প্রভা। দেখতে দারুণ ভালো লাগছিল। এক অমোঘ আকর্ষণ। চোখে স্বপ্নালু ভাব, দৃষ্টি যেন অনন্তে নিবদ্ধ—কোথায় হারিয়ে আছেন কে জানে! বারবার ইউ জী-কে দেখছি—যতই দেখি ততই ভালো লাগে—অপূর্ব সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন তাঁর। হঠাৎ চোখে চোখ পড়ায় হাসতে হাসতে বললেন, জানেন কেন আমি এত লম্বা চুল রাখি? আমি হতচকিত। সম্বিৎ ফিরতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম, 'না, আমার কোনও ধারণাই নেই!' কানের ওপর থেকে চুল সরাতেই দেখলাম দু'টো অস্বাভাবিক লম্বা কান—ঠিক যে রকম বুদ্ধমূর্তিতে দেখা যায়। বললেন, "কান দু'টোকে ঢেকে রাখার জন্যই চুল রাখা। এমনিতেই লোকে কত কি ভাবে আমার সম্বন্ধে। তার ওপর যদি কান দু'টো দ্যাখে তাহলে তাদের অন্ধবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে যাবে।" আমি আর কোনও কথাই বললাম না। লোকের দোষ দিয়ে কী লাভ, আমিও ধীরে ধীরে ভাবতে লাগলাম তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ, দর্শন, দেহের প্রতিটি অঙ্গের লক্ষণ, হাতের রেখা, কান এবং চোখ দু'টো যেন নির্ভুলভাবে এক ঐশ্বরিক সত্তাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে সেদিন ইউ জী-র চালচলন, হাত-পায়ের ভঙ্গিমা আমাকে বারবার বিষ্ণুমূর্তির বিভিন্ন মুদ্রা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। যখন তিনি সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তাঁর হাতের পাতা পুরোপুরি পেছনে ফেরানো থাকে। যেন কেউ হাতের কনুই সমকোণে শরীরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ইউ জী যখন প্রবলভাবে এসব দৃষ্টিভঙ্গি উড়িয়ে দেন এবং বলেন, প্রতিটি মানুষ প্রকৃতির অনুপম মূর্তি—তখন তাঁর ওপর ভক্তিশ্রদ্ধা যেন আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ভাবলাম মানুষের ভেতর যদি এমন ভাবনা সবসময় কাজ করে তাহলে তার জীবনটা কেমন হবে? "পৃথিবীর কোনও মানুষের উপযোগিতা অন্য যে কোনও একজন সাধারণ মানুষের থেকে কোনওমতেই বেশি হতে পারে না। যে অহংকার

মানুষকে এই ভাবনা দিয়েছে যে প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কোনও এক মহান পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে, সেই অহংকারই হবে মানবজাতির অসাধারণ বিশৃঙ্খলার প্রথম ধাপ এবং তার পরিণতি এক বিশাল বিধ্বংসী কর্মপ্রচেষ্টা। বিজ্ঞান আর যাই করুক না কেন, আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবী এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার চেয়েও নগণ্য। সেই পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের মতো লক্ষ কোটি প্রাণী জন্মেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে—তাই আমাদের প্রতিটি জীবনের কী এমন মহান লক্ষ্য থাকতে পারে? আমাদের এই মূল পরিচয় ছাড়া জ্ঞানের আর কোনও মৌলিক উদ্দেশ্য থাকা কি সম্ভব?" ভাবনা তো শুধু ভাবনাই—এছাড়া মানুষের জীবন কীভাবে চলবে—সেই ভাবনায় ভাবনা মিলিয়ে যেতে যেতে কোথায় হারিয়ে গেলাম।

সকালবেলা কফি খাওয়ার পর্ব শেষ হতে না হতেই জুলী ও তনুজা এসে হাজির। ইউ জী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুহ, গতকাল থেকে একটা নতুন খবর সবার মুখে মুখে, অথচ আমিই শুধু অন্ধকারে পড়ে আছি।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর? কই আমি তো কিছুই জানি না! ইউ জী ঠিক আগের মতোই জোর দিয়ে বললেন, সবাই বলছে গুহ নাকি খুব ভালো হাত দেখতে পারে—তা আমার হাতটা একবার দেখুন। তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, ও এই ব্যাপার, তা আমি নিশ্চয়ই দেখব—কিন্তু আপনি এসব বিশ্বাস করেন? আমি নিজে হাত দেখা, জ্যোতিষ এসব তেমন বিশ্বাস করি না। ছোটবেলায় সেইন্ট জারমেইন, কিরোর বই পড়ে এসব শিখেছিলাম। কিছু কিছু হয়তো এখনও মনে আছে, তবে সবটাই বইতে যেরকম বলা হয়েছে আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি—তার বাইরে আমার কোনও অভিমত নেই। ইউ জী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই একটা জিনিস যা আমাকে সারা জীবন ধরে অবাক করে আসছে—এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে আমি জোর দিয়ে কিছুতেই বলতে পারব না—এর মধ্যে কিছুই নেই। আমার যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স তখন আমার দাদু আমাকে মাদ্রাজের এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রে বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে—অথচ আমার দাদুর সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার বিশেষ কিছুই মেলেনি। আমার কোষ্ঠীবিচার করে বহু আগে উল্লেখ করেছিলেন আমার যখন ৪৯ বছর বয়স তখন আমার মধ্যে এক অসাধারণ

পরিবর্তন আসবে... এবং সত্যি সত্যি তা হয়েছিল... আমার মৃত্যু ঘটেছিল। অতএব হস্তরেখা বিচার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতার ওপর আমার মতামত এখনও মুলতুবি আছে।"

মনে পড়ল আমার নিজের জ্যোতিষ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা। আমি তখন ঘরছাড়া। উদ্দাম, দুর্যোগময় জীবন—প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আর কারাগার আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। কোটি কোটি দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের স্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দিনের পর দিন অর্ধাহারে, স্বল্পবিশ্রামে জর্জরিত এই দেহটায় শুধু চোখ দু'টো ৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আশায় চকচক করত। আর হৃদয়টা কোনও রকমে চলত। বাবা-মায়ের কানে এসব খবর যেত। তাই তাঁদের গভীর দুঃখ, তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনও সীমা ছিল না। এরকম সময়ে বাবার চিকিৎসালয়ে এক আশ্চর্য রোগীর আবির্ভাব ঘটে। বাবা সেই ব্যক্তির মুখ দেখেই বলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্যা কি। তখন সেই ভদ্রলোক বাবাকে বলেছিলেন, আপনার যেমন রোগনির্ণয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, আমারও অন্য একটা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং সেটা হল জ্যোতিষশাস্ত্র। বাবা যদিও চিরকাল বামপন্থী, তবুও অধিকাংশ বাঙালির মতো শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর শ্রদ্ধা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর দুর্বলতা পোষণ করতেন। বাবা অসম্ভব উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর-সবাইকে চেম্বার থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বলা যায়। সেই ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে বলেছিলেন—আপনার ১৯৫৩ সালে জন্মানো সন্তানের ব্যাপারে আপনার গভীর দুশ্চিন্তা। সে দুর্যোগের মধ্যে জীবনযাপন করছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। তার ভালো সময় আসছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা এ ব্যাপারটা গোপন রাখতেন যে আমি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হয়ে ঘর ছেড়েছি—তাছাড়া আমার সার্টিফিকেটে জন্ম সাল ১৯৫৪। বাবা আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু উত্তেজনা চেপে রেখেছিলেন। যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়—তখন বাবা তাঁকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেন আর মা তাঁকে নিজের ভাইয়ের মতো যত্ন-আত্তি করেন—পরে তিনি আমাদের পরিবারের অঙ্গ হয়ে যান। তাঁর ক্ষমতার আরও অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। এসব ঘটনাই আমার প্রেরণার উৎস এবং এরপর আমি বই পড়ে হাত দেখা শিখেছিলাম।

ইউ জী সব আলো জ্বালিয়ে তাঁর দু'টো হাত একসঙ্গে আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। জুলী ও তনুজা আমার মতোই প্রায় উপুড় হয়ে তাঁর মেলে ধরা হাতের তালুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। গোলাপি রঙের অদ্ভুত মসৃণ সেই হাতের অপূর্ব সুন্দর রেখাগুলি আমার মনোযোগ এমনভাবে অধিকার করে বসল যেন আশপাশের সমস্ত জগৎ, পৃথিবী, অন্য সমস্ত কিছু, ধীরে ধীরে আমার চেতনার অস্তিত্ব থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

প্রায় মণিবন্ধ থেকে উৎসারিত একটা গভীর রেখা চন্দ্রের তিন-চতুর্থাংশকে বাঁ-দিকে রেখে হাতের মধ্য মঙ্গলকে দু'ভাগে ভাগ করে শনিকে ভেদ করে মধ্যমায় এমনভাবে মিশেছে যেন ভাগ্যদেবী নিজে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সে রেখাটি রচনা করেছেন। এই ভাগ্যরেখার প্রায় সমান্তরাল আরেকটা রেখা রবিকে শোভিত করে অনামিকায় ধাবিত হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি রেখা জীবনরেখা থেকে তৈরি হয়েই ঊর্ধ্বগামী হয়ে বিভিন্ন আঙুলের দিকে চলে গেছে। আমার সত্যি সেদিন মনে হয়েছিল যেন কোনও স্বর্গীয় শিল্পী পরমেশ্বরের আদেশে এ হাতের রেখাগুলি অঙ্কন করেছেন। এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দর! কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল—চুল পড়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাবে এমন একটা স্তব্ধতা। আমিই শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দ পর্বের ইতি করলাম—এমন হাত আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি বলে ঘোষণা করলাম। কে যেন আমায় বলল, শোনা যায় বুদ্ধদেবের হাতে নাকি এরকম সুন্দর রেখা ছিল। "আমি সে ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে পারি না, কারণ বুদ্ধদেবের হাত তো আমি কোনওদিন দেখিনি।" আমি জবাব দিলাম। ইউ জী সবার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। যেন তিনি এ ব্যাপারে সহমত। অন্য সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। এবার আমি ব্যাখ্যা শুরু করলাম। আপনার মস্তিষ্করেখা অর্থাৎ হেডলাইন অত্যন্ত নিখুঁত এবং শেষের দিকে একটা অতি স্পষ্ট তারকা দেখা যাচ্ছে—তার অর্থ হল আপনার মানসিক জগতে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যেহেতু তারকা ভেদ করে আপনার হেডলাইন আরও এগিয়ে গিয়েছে সেহেতু আপনি আপনার মানসিক ভারসাম্য প্রবল বিস্ফোরণ সত্ত্বেও বজায় রাখতে পেরেছেন। তাছাড়া আপনার সুদৃঢ় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনাকে পাগল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। শুক্র ও মঙ্গল থেকে ঊর্ধ্বমুখী রেখা এটাই প্রমাণ করে যে আপনার ভেতরের একটা মৌলিক সৃষ্টিমূলক শক্তি আপনার প্রজ্ঞার চালক। আপনার অসীম সৌভাগ্য এবং অসামান্য যশ।

আমি ইউ জী-র দু'টো হাত পাশাপাশি রেখে আমার দু'হাত দিয়ে ধরে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছি কোথায় কোথায় মিল আছে আর কী কী পার্থক্য আছে। হঠাৎ আমার মনে হল তাঁর হাত দু'টো থেকে অদ্ভুত একটা তাপ নির্গত হচ্ছে—নির্ভুলভাবে অনুভব করলাম সেই উষ্ণতা। ভালো করে কিছু বোঝার আগেই টের পেলাম একটা প্রবল উষ্ণস্রোত আমার দু'হাত বেয়ে ক্রমাগত আমার বুকে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। জীবনে অনেকবার ইলেকট্রিক শক খেয়েছি। এটা অনেকটা সেইরকম কিন্তু ধীরগতির, একটা মৃদু আলোড়ন এবং ততটা অস্বস্তিকর নয়। আমি অবাক বিস্ময়ে ইউ জী-র মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—তনুজা চন্দ্রা এবং জুলী থেয়ার জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে, কেন আমি অমন করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি? আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সরাসরি ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কী করছেন? কেন আমি এসব অনুভব করছি? মনে হল কে যেন আমার ধমনিতে এক ডোজ মাদক দ্রব্য ইনজেক্ট করে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আমার মুখের ভেতরটা, আমার গলা, সমস্ত শ্বাসনালী এবং এসোফেগাস শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। গাঁজা-ভাঙ খাওয়ার পর যেমন গলা বুক শুকিয়ে যায় অনেকটা সে রকম। জীবনে কোনও দিন এরকম জিনিস আমি অনুভব করিনি। চোখ দু'টো সেই সকালবেলায়, যখন আমার মাথা সবচেয়ে জাগ্রত এবং উর্বর থাকে তখনই জড়িয়ে আসছিল—ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। ইউ জী আমার প্রশ্ন পুরোপুরি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, একগ্লাস জল খেয়ে নিন, আর ভালো করে হাতের রেখা বিচার করে বলুন তো আমার হাতে টাকাপয়সা আছে কি না? আমি বললাম, স্বয়ং মা লক্ষ্মী আপনাকে অনুসরণ করছে—পাছে কোনও প্রয়োজন হয়! এরপর আবোল-তাবোল করে হাত দেখার পাঠ চুকিয়ে দিলাম।

আমি ভীষণভাবে সতর্ক হয়ে উঠলাম। একটা চাপা উত্তেজনা মাঝে মাঝেই আমাকে রোমাঞ্চিত করছিল। আমার সমস্ত চিন্তাধারা, সমস্ত ধারণা, সমস্ত কার্যকারণের যুক্তি এবং সম্পর্ক দিশেহারা হয়ে গেল। যতই সেই অভিজ্ঞতা উড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম, ততই যেন শুধু এই ঘটনাটা আমার ভাবনার মুখ্যস্থান অধিকার করে ফেলল। সমস্ত চিন্তার গতিটাই পালটে গেল। যখন তাঁর সমস্ত কথাই প্রায় মেনে নিয়েছি যে—অতিপ্রাকৃত বলে কিছুই নেই, আমাদের মন তার চিন্তা ও আগ্রহের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এমন সব অনুভূতির যোগান দেয় যে আমাদের বিশ্বাস তখন ক্রমশই তার ভিত্তিটাকে পাকা করতে

থাকে—তাহলে হঠাৎ আমার এরকম একটা অভিজ্ঞতা হল কেন? হয়তো অজ্ঞাতে spiritual transmission জাতীয় কোনও মনোভাব পোষণ করে ছিলাম—বুঝলাম না কোনটা সত্যি। সবে যখন ভাবতে শুরু করেছিলাম আমার আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা অলীক এবং এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় ইউ জী-র মন্তব্য আমায় আলোর আভাস দিচ্ছে ঠিক তখনই এই ঘটনা আমায় আবার সেই আঁধারে নিয়ে গেল যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। যখনই ভাবতে শুরু করি যে মোটামুটি বুঝতে পারছি তিনি কী বলছেন, তখনই কোনও একটা ঘটনা আমার বোঝাপড়াকে একটা ছেলেখেলায় পরিণত করে। একটা গভীর হতাশা আমার মধ্যে অদ্ভুত ছোট্ট একটা শূন্যতার জন্ম দিল। যখন ভাবনা সেই শূন্যতাকে ছুঁয়ে থাকে তখন মনে হয়—সব মিথ্যা—শুধু আমার শরীর আর আশপাশের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই একটা অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব—এটাই শুধু সত্য—আর বাদবাকি সব অলীক—স্বপ্নালু রঙিন চিন্তা আর প্রাকৃতিক অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্করহিত ভাবনার পরিণতি। আর যেই আমার গতানুগতিক চিন্তার জগতে নিজেকে ফিরিয়ে আনি তখন আত্মকেন্দ্রিকতা বিভিন্ন ঘটনাকে জোড়া লাগানোর মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুর উপসংহার সৃষ্টি করতে চায়, কোনও একটা পরিণতির মাধ্যমে বিশ্বাসকে একটা অনন্ত রূপ দিতে চায়—তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও। এই দ্বৈততা আমাকে দুই মাথা হাঁসের গল্প মনে করিয়ে দিল। এক মাথা অন্য মাথাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বিষ খেয়েছিল এবং তার পরিণতি হয়েছিল উভয়ের মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই হয়তো এই দ্বৈততার অবসান ঘটাতে পারে। এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বুঝতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে, জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে 'আমি' বেঁচে আছি; এই 'আমি'র অস্তিত্ব ছাড়া হয়তো কোনও সুখভোগ নেই—আর বেদনাও যে সেই সুখভোগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—সেটা বোধগম্য হয়েও কোনও ফল হচ্ছে না। একটা গভীর নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমার চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন হল।

৮.

অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির পায়ে ক্যানসার ধরা পড়েছে। কয়েকদিন পরেই অপারেশন হবে। তাই ইউ জী এবং মহেশ ভাট অধ্যাপক মূর্তিকে দেখতে সানফ্রান্সিসকো যাবেন বলে ঠিক হল। আমরা সবাই মিলে লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে যাব বলে ঠিক করলাম। এবং দু'টো গাড়িতে পাম স্প্রিং থেকে লস এঞ্জেলেসে এসে হাজির হলাম। ইউ জী এবং মহেশ ভাটকে বিদায় জানাবার পর আমরা সবাই হলিউডে ভারতীয় রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্নভোজন করতে গেলাম। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হল—দু'টো দিন ইউ জী সানফ্রান্সিসকোতে থাকবেন এবং আমরা কীভাবে এই দু'টো দিন কাটাব। কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমার মনে হল দু'টো দিন তো দূরের কথা, কীভাবে পরবর্তী দু'ঘণ্টা কাটাব সে ব্যাপারেও কেউ কারও সঙ্গে একমত হতে পারছি না। জুলীর ইচ্ছা আমাকে আধ্যাত্মিক বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানো আর তনুজার ইচ্ছা কোনও সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা। আমি তখন তনুজাকে বললাম যে গত একুশ বছর আমি কোনও সিনেমা হলে ঢুকে সিনেমা দেখিনি। তনুজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেল। অবিশ্বাসের সঙ্গে সবাইকে বলল, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আমি এখানে কী করছি—এখানে নিশ্চয়ই কোনও ঘটনা ঘটতে চলেছে। আসলে এসব বলার কারণ হল তনুজা নিজে চিত্রপরিচালক হওয়ার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তার লেখা একটা স্ক্রিপ্ট 'তামান্না' চলচ্চিত্র সম্মেলনে পুরস্কার পেয়েছে। অথচ এখন যাঁদের সঙ্গে সে সময় কাটাচ্ছে, তাঁদের সবার এমন বিচিত্র পশ্চাৎপট যে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আমি আবার বললাম, আমার রক্তে হয়তো সিনেমা না দেখার ব্যাপারটা মিশে আছে। কারণ আমি জ্ঞানত আমার বাবাকে কোনওদিন সিনেমা হলে ঢুকতে দেখিনি। তখন জুলী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি লক্ষ্মীকে নিয়ে কোনওদিন সিনেমা দেখেননি? লক্ষ্মী আমার স্ত্রী, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোটিনের কাঠামো নিয়ে গবেষণা করত—আমি বললাম 'না, কোনওদিন একসাথে সিনেমা হলে ঢুকিনি'। ততক্ষণে এ ব্যাপারে সবার সবরকম ইচ্ছা প্রায় চুপসে

গেছে। সবার কেমন একটা উদাস ভাব—ঠিক হল পাম স্প্রীং-এ ফিরে গিয়ে যে যার নিজের হোটেল রুমে বিশ্রাম করব। ইতিমধ্যে মারিও এবং লিসা কয়েক পশলা ঝগড়া করার কাজ সেরে ফেলেছে—তাই তারা গম্ভীর। জুলী তখন বললেন, ইউ জী যখন কোথাও যান, যারা পেছনে পড়ে থাকে, তাদের মধ্যে নাকি এরকম একটা ছন্নছাড়া উদাস ভাব জেগে ওঠে। ভাবলাম এ ব্যাপারটা সত্যিই মজার—এখানকার সবকিছুই যেন কল্পকথার মত আজগুবি।

মনে হল আমাদের সাধনার মধ্যে এটা একটা ছুটির দিন। যতক্ষণ ইচ্ছা ভোরে ঘুমাও—কোনও তাড়া নেই। সারাদিন হালকা মেজাজে কীভাবে সময় কাটল তার কোনও হিসেব রইল না। রাতে নিউ জার্সিতে ফোন করলাম। লক্ষ্মী ও আমার দুই মেয়ে শিল্পা-সুমেধার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তারা সবাই আমার অনুপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছে—বিশেষ করে আমার স্ত্রী লক্ষ্মী। মুখে এমন একটা ভাব করে রাখে যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা গভীর ভয় আমার স্ত্রীকে নিজের ছায়ার মতো সবসময় অনুসরণ করে চলেছে। আমার ওপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা তার অস্তিত্বের পরম স্থানকে ছেয়ে ফেলেছে, কিন্তু আমার উদ্বেল ক্ষুধার্ত মনকে সে যে তার ভালোবাসা দিয়ে অবদমিত করতে পারেনি সে কথা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। আর সেটাই হল তার ভয়ের উৎস। যখন নিজেকে অসহায় মনে করে—কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না বলে মনে করে, তখন মাঝে মাঝে করুণভাবে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা তুমি ঈশ্বর দিয়ে কী করবে বল তো! আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, কিন্তু আমার নিজেকে এই অজ্ঞাত আকর্ষণ থেকে বিরত রাখার কোনও ক্ষমতাও নেই। আমি হয়তো এই অভিশাপ নিয়েই জন্মেছি—মনে হয় এই কারণেই এ ধরনের লোকেদের উপদেশ দেওয়া হত—সংসার যেন না করে, নিজের অসহায় অবস্থা পরিবারের লোকেদের অযথা কষ্ট দেয়।

রাতে শুয়ে শুয়ে অতীতের কথা মনে পড়ছে। '৭১ সালের কথা মনে পড়ল। প্রেসিডেন্সি কলেজে সবচেয়ে নিচু ক্লাসের নগণ্য ছাত্র। অথচ ফুটবল খেলার খাতিরে হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতাম—তার ওপর রাজনৈতিক সচেতনতা আরও বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে দিল। সারাটা সময় হয় কফি হাউসে, নয় ফুটপাথের বইয়ের দোকানে বই দেখতে দেখতে কেটে যেত। ধীরে

ধীরে মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস তখন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে এবং সেটা হল সমাজের থেকে আমি যা কিছু পাই তার প্রতিদানে আমার নিশ্চয়ই কিছু করা দরকার। অল্প বয়সের আবেগপ্রবণতা এবং পরোপকারের ঝোঁক আমাকে এসব ভাবতে বাধ্য করত, "একবার ভেবে দেখ, তুমি যা খাও, তুমি যে কাপড়-চোপড় পর, তুমি যে ঘরে থাকো, তা প্রকৃতপক্ষে কার রক্ত-ঘাম এক-করা পরিশ্রমের ফল। অথচ তাদের অধিকাংশই অনাহারে বা অর্ধাহারে শিক্ষাদীক্ষা চিকিৎসার সুযোগ ছাড়াই জীবনের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। তোমার বিলাসবহুল জীবনের প্রকৃত খোরাক হল ওই মানুষগুলো। কি করে এসব জানার পরও কলুর বলদের মতো চোখের চতুর্দিকে কালো পট্টি বেঁধে নাকের আগার দিকে তাকিয়ে নিজের ক্যারিয়ার বানানোর প্রচেষ্টা করে চলেছ? কে তোমার চালক? কোথায় তোমার বিবেক? যাঁদের কীর্তিকথা শুনলে শ্রদ্ধায় তোমার চোখে জল চলে আসত, তাঁরা কি তোমার থেকে কম প্রতিভাবান ছিলেন, তাঁরা কি তাঁদের প্রাণদান করেছিলেন তোমার মতো স্বার্থপর লোকেদের সমাজ গড়ে তোলার জন্য? হে সব্যসাচী, কার বুকভরা আশা, তোমাকে এই নামে ভূষিত করেছিল? যদি কোনওদিন অন্য কাউকে স্বার্থপর বল—বুঝবে তোমার চেয়ে মোটা মাথার দৃষ্টিহীন লোক এই পৃথিবীতে নেই।" অনেক কষ্টে শেষরাতে একটু ঘুম হল।

ইউ জী আর মহেশ ভাট অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তিকে দেখে এসেছেন। আমি, জুলী, মারিও, লিসা এবং তনুজা লস এঞ্জেলেসে গেলাম তাঁদের রিসিভ করতে। সানফ্রান্সিসকো থেকে বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ তাঁরা এসে পৌঁছলেন। সেদিন একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। ইউ জী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, অথচ আমাকে চিনতে পারছেন না মনে হল। আমার চোখের ভেতর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি যেন বহুদূরে আপন মনে কিছু একটা দেখছে। আমি তাঁর মুখের সামনে দু'হাত নাড়িয়ে ইউ জী, ইউ জী বলে কয়েকবার ডাকার পর দেখলাম তিনি ফিরে এসেছেন—এবার মুখে হাসি, বলে উঠলেন, হ্যালো, হ্যালো, কখন আসা হয়েছে, আমাদের ফ্লাইট দশ মিনিট আগেই ল্যান্ড করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তিনি খুব ভালো আছেন। মানসিকভাবে এই ক্যানসারের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য পুরোপুরি তৈরি। দার্শনিক লোক, অথচ আমাকে বললেন, আপনাকে দেখে আমার ভেতরে এক অসাধারণ সাহস জেগে উঠেছে। আবার বললেন যে তিনি নাকি আমাকে নিয়ে এক

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছেন। এবং সেই স্বপ্নের সারমর্ম হল, ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে অধ্যাপক-দার্শনিক নারায়ণ মূর্তির কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই স্বপ্নের কথা শুনে আমি নারায়ণ মূর্তিকে আশ্বাস দিয়েছি যে আপনার এই স্বপ্নের খাতিরেই আপনাকে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। বর্তমানে ড. নারায়ণ মূর্তি সম্পূর্ণ সুস্থ।

আমাদের গাড়িতে ইউ জী বসেছেন সামনের সিটে, আর পেছনের সিটে আমি এবং মহেশ ভাট। জুলী গাড়ি চালাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে আমি আর কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারলাম না, কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। যখন চোখ খুললাম দেখি আমাদের গাড়ি হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে আসছে। জুলী বললেন, 'গাড়িতে পেট্রোলের দরকার, গ্যাস স্টেশনে যাব।' এদেশে পেট্রোলকে গ্যাসোলিন বলে—সংক্ষেপে গ্যাস। তাই পেট্রোল পাম্পের নাম গ্যাস স্টেশন। গ্যাস নেওয়া হল—কফি খাওয়া হল। আমরা গাড়িতে যে যার জায়গায় বসতে যাব, তখন জুলী আমার কানে কানে বললেন, গুহ, আমার গ্যাস নেওয়াটা একটা অজুহাত মাত্র, গাড়ি চালাব কি—চোখ দু'টো পর্যন্ত খুলে রাখতে পারছি না। যেন ভেতর থেকে কেউ জোর করে চোখের সামনে পর্দা ফেলে দিচ্ছে। আপনি একটু চালান—তারপর আবার আমি চালাব। ইউ জী-কে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানো জুলীর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান এবং স্বপ্ন। পৃথিবীতে এর থেকে মহান এবং আনন্দময় কাজ তার চিন্তাভাবনার বাইরে। নিজের প্রিয়তমকে অন্যের হাতে সঁপে দেওয়াটাও হয়তো জুলীর কাছে এর থেকে সহজ কাজ। আজ নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে—তা নাহলে আমাকে বলেন গাড়ি চালাতে! আমি বললাম, সে নয় চালালাম, তা কফি খাওয়ার পরও ঘুম যাচ্ছে না? জুলী বললেন, না কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না। আমি অবশেষে ইউ জী-কে বললাম, জুলী খুব ক্লান্তি অনুভব করছে, মহেশবাবু আমেরিকায় গাড়ি চালাবেন না, তাই এখন আমাকেই গাড়ি চালাতে হবে। আমি তাদের কারওর সামনেই গাড়ি চালাইনি। তাঁরা কেউ জানেন না আমি কেমন গাড়ি চালাই। এই প্রথম ক্যালিফোর্নিয়াতে গাড়ি চালাব। আর গাড়ির যাত্রীরা হলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, বিখ্যাত পরিচালক মহেশ ভাট আর এক আমেরিকান ধনী বিদুষী নারী জুলী থেয়ার। ইউ জী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার লাইসেন্সটা আপনার কাছে আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তাহলে আর কি, আপনি চালান এবং জুলী বিশ্রাম করুক। আমার বাড়িতে

যে গাড়িটা আছে সেটা হল অটোমেটিক—অর্থাৎ গ্যাস প্যাডেল চালালেই গাড়ি চলবে। গিয়ারের কোনও বালাই নেই—গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি গিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়। এখানে জুলীর গাড়িটায় কিন্তু চালককে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে—এর নাম স্টিক সিফ্‌ট বা ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন—ভাগ্যিস আমার সেটা জানা ছিল। সেই বিদ্যেটা কাজে লেগে গেল। যাই হোক শুরু হল আমার ইউ জী-র পাশে বসে গাড়ি চালানো। সারা রাস্তা কেউ কোনও কথাই বললেন না। লজে এসে গাড়ি থামিয়ে যখন সবাই নামলাম ইউ জী শুধু বললেন, ব্যাস, এবার থেকে যতদিন গুহ এখানে আছেন, ততদিন তিনিই আমার গাড়ি চালাবেন। জুলী যদিও আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন, তবুও মনে হল যেন এখন আমার মৃত্যু কামনা করছিলেন বা তাঁর নিজের মহানিদ্রাকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবেন না এমনভাবে মুখভঙ্গি করলেন।

সন্ধ্যায় ঠিক হল আগামীকাল খুব সকালে আমরা সবাই লাস ভেগাসে যাব। তাই সবাই তাড়াতাড়ি যে যার রুমে ফিরে গেলেন। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমার মাথার ভেতরে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অতীতগুলোকে কেমন যেন এই ক'দিন আগেকার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। সবে একটু ঘুমিয়েছি। স্বপ্নে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। মনে পড়ল আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা। একদিন যথারীতি কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিট পার হয়ে লোহার গেটটা অতিক্রম করে কিছুটা হাঁটার পর ডানদিকের বারান্দায় উঠে সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিনতলার বারান্দায় এসে কলেজ স্ট্রিটের ওপর সেই লোহার গেটটার দিকে নজর রাখলাম। ক্লাস বয়কট হয়ে গেছে। সারা কলেজে হয়তো একটা-দু'টো ক্লাস চলছে। একটা চাপা উত্তেজনা চারিদিকে, খবর সরাসরি আসেনি, তবে জানা গেছে একটা বড়সড় অ্যাকশনের তোড়জোড় চলছে। হয়তো সে খবর কলেজ পার হয়ে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনেও পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তা নাহলে বড় বড় দু'টো কালো পুলিশ ভ্যান লোহার গেটের বাইরে এসে দাঁড়াবে কেন? অনেক পুলিশ নেমে দাঁড়াল। সবার হাতে বন্দুক। কেউ গেটের ভেতরেও আসছে না, আর কেউ গেটের বাইরেও যাচ্ছে না। চারিদিক থমথম করছে। হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে কানের পর্দা ফাটানো একটা বোমার আওয়াজ শোনা গেল। উঁকি মারতেই দেখি ধোঁয়ার বলটা ততক্ষণে লোহার গেটের ডানদিক থেকে দোতলা সমান উপরে উঠে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকট আকাশ-ফাটানো শব্দ প্রায় একই জায়গায়।

নিচে দারুণ হইচই হচ্ছে। ট্রাম, বাস, গাড়ি সব থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—হয়তো পুলিশ আহত হয়েছে নিচে। পুলিশ ততক্ষণে বন্দুক উঁচিয়ে লোহার গেট অতিক্রম করে কলেজের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আমি ও আমার বন্ধু তখনও বারান্দার দেওয়াল ঘেঁষে পিলারের পেছনে—শুনলাম নিচ থেকে কেউ বলছে—বারান্দায় কেউ যেন না থাকে। আরেকবার উঁকি মারলাম। ব্যাস, চলল গুলি। মনে হল মাথার পাশ দিয়ে গুলি চলছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি হাতদশেক দূরে একজন লুটিয়ে পড়ল বারান্দার ওপর। সম্ভবত কাঁধে গুলি লেগেছে। দৌড়ে গিয়ে অফিসে খবর দিলাম এবং বললাম যথাশীঘ্র অ্যাম্বুলেন্স ডাকার কথা। ফিরতে ফিরতে দেখি বন্দুক তাক করে হিন্দি সিনেমার কায়দায় পুলিশ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। পাশেই একটা ঘরে একজন প্রফেসর তখনও গোটাচারেক ছেলেমেয়েকে অংক শেখাচ্ছিলেন। আমি আর আমার বন্ধু বিনা অনুমতিতেই ক্লাসে ঢুকে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পড়লাম। প্রফেসর হয়তো ভেবেছিলেন আমরাই বোমা মেরে এখানে লুকোতে এসেছি। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে ক্লাস চালাতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরেই কলেজের একজন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে এক বড়সড় পুলিশ অফিসার আমাদের অর্থাৎ সব ছাত্রছাত্রীদের লাইন দিয়ে ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে আসতে বললেন। দেখি বারান্দায় ততক্ষণে আরও অনেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পাশ দিয়েই স্ট্রেচারে করে সেই গুলি খাওয়া ছেলেটাকে কয়েকজন পুলিশ বাইরে নিয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত অচৈতন্য দেহের যাত্রাপথের সাক্ষী দিয়ে গেল। একজন বড় অফিসার প্রচণ্ড রাগ দেখিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিমা করে বললেন, বিপ্লব করতে হলে কলেজে আসা কেন—ওই দেখ গুলি খেয়েছে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—মা-বাবার কত স্বপ্ন—এখন সেই হতভাগ্য বাবা-মাকে মর্গে গিয়ে লাশ শনাক্ত করতে হবে। ভাবলাম জীবনটা কি রহস্যময়!

৯.

ভোর হতে না হতেই আমরা সবাই লাস ভেগাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। ডাগলাস রোজেনস্টাইনের দামী জাপানি গাড়ি ইনফিনিটিতে ইউ জী বসলেন সামনের সিটে ডাগলাসের পাশে। আমি, ল্যারি মরিস আর ডাগলাসের স্ত্রী অলিভিয়া পেছনের সিটে। অন্য গাড়িটা জুলী থেয়ার ভাড়া করেছে। দুধের মতো সাদা নিশান ম্যাক্সিমো। জুলীর পাশে মারিও এবং পেছনের সিটে মহেশ ভাট এবং তনুজা চন্দ্রা। শুরুতেই কোন রাস্তায় গেলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে সেটা নিয়ে ডাগলাস আর ইউ জী-র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। ডাগলাস গাড়ি চালাচ্ছেন আর বারবার বলছেন, আমার মনে হচ্ছে এটা ভুল রাস্তা, আমরা লস এঞ্জেলেসের দিকে যাচ্ছি। অথচ আমি জানি লাস ভেগাস পাম স্প্রীং থেকে লস এঞ্জেলেসের ঠিক বিপরীত দিকে। ইউ জী এইসব কিছুক্ষণ শোনার পর বেশ রেগে গেলেন। রীতিমতো চিৎকার করে বললেন, আপনার যদি রাস্তা জানা না থাকে, তাহলে হয় অন্যের কথায় ভরসা রাখতে হবে, নয় গাড়ি কোনও গ্যাস স্টেশনে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। তাতেও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে একটি ম্যাপ কিনে দেখে নিন কোথায় আছেন, কোথায় যেতে হবে এবং কীভাবে সেখানে যাবেন। বারবার এসব কথা বলে অন্যদের বিরক্ত করার কোনও অর্থ হয় না। ডাগলাস কিছুক্ষণ পরে একটা গ্যাস স্টেশনে গাড়ি থামালেন। জুলীর গাড়িটাও আমাদের পেছনে পেছনে গ্যাস স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। কিন্তু ইউ জী গাড়ি থেকে নামলেন না। ইউ জী আমাদের সঙ্গে না থাকায় ডাগলাস একটু সাহস পেয়ে গজগজ করছেন আর আমাদের বলছেন—এই বৃদ্ধের সবকিছুতেই এমন একটা নৈশ্চিত্য যা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

দু'টো গাড়িতেই পেট্রোল ভরা হল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ এবং আলোচনার পর ঠিক হল জুলীর গাড়িটা আমাদের পথ দেখাবে। সবাই আর কোনও উচ্চবাচ্য না করে গাড়িতে এসে বসলেন এবং আমাদের গাড়িটা জুলীর গাড়িটাকে অনুসরণ করতে

লাগল। আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম এখনও সেদিকেই যাচ্ছি। অর্থাৎ লস এঞ্জেলেসের দিকে। কেউ কোনও কথা বলছে না, একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সবার ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে সকলের ইন্দ্রিয়গুলো অদ্ভুতভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে চক্ষু ইন্দ্রিয়। মনে হল রাস্তার প্রতিটি চিহ্নের দিকে সবার দৃষ্টি যেন ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। প্রায় মিনিট দশেক এভাবে চলার পর দু'টো বিশাল বিশাল সবুজ রঙের পথনির্দেশকে পরিষ্কার বোঝা গেল আমাদের অবস্থাটা কী। এবার রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা রাস্তা যাবে লস এঞ্জেলেসের দিকে আর একটা যাবে লাস ভেগাসের দিকে। একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে আমরা ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছিলাম।

ডাগলাসের মুখটা অহংকার চূর্ণ হওয়ার অস্বস্তিতে লাল হয়ে গেছে। আমি মুচকি মুচকি হাসছি সেটা গাড়ির পেছনে নজর রাখার আয়নার মধ্য দিয়ে তাঁর চোখে পড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতেই আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রাস্তাটা অত্যন্ত কাউন্টার ইনটিউটিভ—তাই না? মুখের ভাবসাব দেখে মনে হল যেন ডাগলাস বলার চেষ্টা করছে যারা রাস্তার পরিকল্পনা করে এ পথটা তৈরি করেছে তারা অত্যন্ত নিম্নবুদ্ধির লোকজন। ইউ জী-র মুখে অতীত ঘটনার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বললেন, আরও প্রায় ঘণ্টাচারেক লাগবে লাস ভেগাস পৌঁছাতে। অবশ্য সময়টা নির্ভর করবে কত জোরে গাড়ি চালাবে তার ওপর। আমি ডাগলাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি খুব জোরে গাড়ি চালান মারিওর মতো, না ল্যারি মরিসের মতো সংযত হয়ে চালান। এই প্রথম অলিভিয়া মুখ খুললেন এবং বললেন ডাগলাস খুব জোরে গাড়ি চালাতে ভালোবাসে কিন্তু গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে ট্রাফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং অনেক জরিমানা দিতে হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এখন নিজেকে একটু সামাল দিয়ে গাড়ি চালায়। ডাগলাস বললেন, এই কিছুদিন আগে সানফ্রান্সিসকো থেকে লস এঞ্জেলেসে আসছিলাম ইউ জী-কে দেখতে, একদিনে দু'বার টিকিট খেয়েছি (প্রতিটি রাস্তায় গাড়ি চালানোর গতির একটা সীমা আছে—সেটা অতিক্রম করলে এবং ধরা পড়লে পুলিশ টিকিট দেয়। প্রতিটি টিকিটে কিছু পয়েন্ট অর্জিত হয়—বেশি পয়েন্ট থাকা খুব খারাপ ব্যাপার—তাছাড়া প্রতিবার ধরা পড়লেই জরিমানা দিতে হয়) এখন পয়েন্টের এমন অবস্থা যে লাইসেন্সটাই থাকে কিনা সন্দেহ। ল্যারি মরিস বললেন, যার যত বেশি

পয়েন্ট, তার গাড়ি ইনস্যুরেন্স করার সময় তত বেশি প্রিমিয়াম দিতে হয়। পয়েন্ট কমানোর জন্য লোকে 'সেফ ড্রাইভিং' কোর্স নেয়—তাতেও পয়সা খরচ। মোদ্দা কথায় নিয়মভঙ্গ করলে পয়সা লোকসান এবং প্রচুর সময় নষ্ট হয়। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম যার অর্থ এবং সময় দুই-ই আছে তার কোনও অসুবিধা নেই—যেমন জুলী থেয়ার? ল্যারি মরিস বললেন, বারো পয়েন্ট পেলে লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়ে যাবে। ইউ জী বললেন, সেরকম সাংঘাতিক ভুল করলে হয় আপনাকে জীবন দিতে হবে নয়তো জেলে পুরে দেবে।

গাড়ি প্রায় আশি মাইল বেগে চলছে আর আমাদের আলোচনা নানা বিষয়ের ওপর চলতে চলতে প্রিয় টপিক আধ্যাত্মিকতায় এসে দাঁড়াল—একেবারে জে কৃষ্ণমূর্তিতে। আমার কাছে জে কে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, তাঁর বই এমনভাবে পড়েছি এবং তাঁর ওপর আমার এমন দুর্বলতা যে তাঁর নাম শুনলেই আমার ধ্যানধারণা বদলে যায়। আবার মনে পড়ল বাঙ্গালোরে গবেষণার দিনগুলোর কথা। আমার সহকর্মী জয়লক্ষ্মী সবসময় বলত, তুমি এমন জে কে পাগল—তা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসছ না কেন? সে সুযোগ কোনওদিন আসেনি আমার জীবনে। এখন অবশ্য আমার কোনও আক্ষেপ নেই। এর আগে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আড্ডার গল্প পড়েছিলাম—তখন মাঝে মাঝে মনে হতো আমি ভুল সময়ে জন্মেছি—কিন্তু এখন সে আক্ষেপ পর্যন্ত নেই।

আলোচনা যথারীতি দুই কৃষ্ণমূর্তিতে এসে দাঁড়াল। এ ব্যাপারটা ডাগলাসের খুব ভালো লাগে। কারণ তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে মনে করেন। ডাগলাসের যখন ষোলো-সতেরো বছর বয়স তখন সুইজারল্যান্ডে সকালে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনতেন আর বিকেলে ইউ জী-র কাছে সেইসবের ব্যাখ্যা শুনতেন। এরকম অভিজ্ঞতা থাকার জন্য ডাগলাস সবসময় বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই দুই কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে যে রহস্যময় যোগসূত্র আছে সে ব্যাপারে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অন্যান্য সবার থেকে অনেক গভীর। আমারও এসব আলোচনা শুনতে অত্যন্ত ভালো লাগে। আমি ডাগলাসকে খুব সমর্থন করলাম সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করলেন তাঁদের চিন্তাধারায় কোথায় কোথায় মিল আছে। মনে হল সাদামাটা বাংলায় যাকে বলে গ্যাস খেয়ে গেছেন সেরকম অবস্থা হয়েছে তাঁর। আনন্দের অতিশয্যে আবার কোনও কোনও

ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে দুই কৃষ্ণমূর্তির উপমা দিতে শুরু করলেন—আবার বললেন, জানেন ডা. গুহ আমার মনে হয় জে কে হলেন জন দ্য ব্যাপটিস্টের মতো। যিশু আসার আগেই যেমন সবাইকে জানান দিয়েছিলেন—রক্ষাকর্তা আসছেন বলে—কত লোককে ব্যাপটাইজ করেছিলেন, সেইরকম জে কৃষ্ণমূর্তিও চিৎকার করে তাঁর দর্শন সারা পৃথিবীতে প্রচার করে গেছেন। আর ইউ জী হলেন যিশুর মতো, সেই দর্শনের সারমর্ম। এই দু'জনের অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে তা আমি জানি এবং সামনা-সামনি দেখেছি। তখন সবাই ইউ জী-র কাছে আসতেন জে কে কী বলতে চান সেসব নিয়ে আলোচনা করতে। সবাই এটাও ধরে নিয়েছিলেন যে জে কে-র ব্যাপারে ইউ জী-র জ্ঞান সাধারণ শ্রোতাদের থেকে অনেক অনেক গভীর। এসব আলোচনার মধ্যে ইউ জী মেজাজে ঘুমিয়ে নিলেন—যেন আমরা আবোল-তাবোল বকছি।

আমরা হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এলাম মধ্যাহ্নভোজন করতে। নিরামিষাশী হওয়ার পর থেকে এদেশে বাইরে কিছু খাওয়াটা আমার পক্ষে বেশ ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা পাতা, কাঁচা সবজি, যাকে বলে স্যালাড, যেসব আমার একদম ভালো লাগে না। আমার ভাজার মুখ, তাই আলুভাজা—যাকে এখানে বলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই—সেটা আমার ভালো লাগে। কিন্তু সেসব খেয়ে আর কতদিন চালানো যায়। পাউরুটির মধ্যে মাংসভাজা দিয়ে বার্গার তৈরি হয়। আজকাল অনেক জায়গায় মাংসভাজার বদলে সবজিভাজা দিয়ে ভেজি বার্গার মানে ভেজিটেবল বার্গার তৈরি হয়—কিন্তু সেসব বেশিরভাগ জায়গায় পাওয়া যায় না এবং এখানেও পাওয়া গেল না। শুকনো দু'পিস পাউরুটি কোক দিয়ে গলাধঃকরণ করলাম। ইউ জী একটা অ্যাপল পাই আর এক গেলাস গরম জল খেলেন। ডাগলাস বেশ কয়েকটা বিভিন্ন ধরনের জিনিস অর্ডার দিয়ে বউ অলিভিয়ার সঙ্গে যুত করে অন্য একটা টেবিলে বসে পড়লেন। আমার ও ইউ জী-র তুলনায় অন্তত চারগুণ বেশি খাদ্য। ইউ জী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে আছে এই ডাগলাস জে কৃষ্ণমূর্তির খাওয়াদাওয়া নিয়ে কেমন রসিকতা করেছিল।

কয়েকদিন আগে ইউ জী ডাগলাসকে আমাদের সবার সামনে ডাগলাসের সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির মধ্যাহ্নভোজনের অভিজ্ঞতার গল্প সবিস্তারে বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ডাগলাস যেদিন যা বলেছিলেন সেটাই এখন বলি। সুইজারল্যান্ডে

ডাগলাস ইউ জী-র সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়ার কয়েকদিন পরে আধ্যাত্মিক অন্বেষণের ব্যাপারে ইউ জী'র কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইউ জী বলেছিলেন যদি সম্ভব হয় তাহলে জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে। জে কৃষ্ণমূর্তির ব্যক্তিত্ব তখন হিমালয়ের মতো বিশাল আকার ধারণ করেছে। তাঁর বক্তৃতা শোনা এক কথা, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা বেশ কষ্টকর। যুবক ডাগলাস অনেক পীড়াপীড়ি করে দু'মিনিটের জন্য দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সাক্ষাতে জে কে ডাগলাসকে বলেছিলেন, আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি, আপনি যদি সেখানে আসেন তাহলে আলোচনার অনেক সুযোগ আসবে। ডাগলাস জে কে-র প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। এছাড়া ডাগলাসের তখন যোগাসন শেখার প্রবল আগ্রহ—সেকথাও জে কে-কে জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজে দেশিকাচার বলে একজন বিশিষ্ট যোগ শিক্ষকের কাছে জে কে নিজে যোগের তালিম নিয়েছিলেন। তাই কোথায় যোগাসন শেখা যাবে সে ব্যাপারটাও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল।

জীবনে প্রথম ডাগলাস ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখবেন। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষ, নাম শুনলেই দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব যেন বস্তুজগতকে ছাপিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে জানান দিয়ে যায়। ডাগলাস মাদ্রাজে দেশিকাচারের কাছে যোগসাধনা শুরু করে দিলেন। আর যখনই জে কৃষ্ণমূর্তি বক্তৃতা দিতেন—তখনই একদম স্টেজের কাছাকাছি কৃষ্ণমূর্তির মুখোমুখি বসতেন যেন কৃষ্ণমূর্তি কিছুতেই তাকে ভুলতে না পারেন। যখনই সুযোগ আসত তখনই দেখা করে একটু গল্পগুজব করতেন। একদিন কৃষ্ণমূর্তি ডাগলাসকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। ডাগলাস পরমানন্দে সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। এখান থেকেই শুরু হয় জে কৃষ্ণমূর্তির ভোজনের রসময় গল্পকথা।

মার্কিনি ডাগলাস তখন সতেরো বছরের লম্বা-চওড়া ক্ষুধার্ত এক যুবক। আর জে কৃষ্ণমূর্তি তিয়াত্তর বছরের ছিপছিপে প্রবীণ ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষক। দু'জনে একটা ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি বসলেন। প্রথমে এল পশ্চিমি ঢঙের থালা। বিভিন্ন সবুজপাতা, কাঁচা শশা, কাঁচা ব্রকোলি, কাঁচা লাল বাঁধাকপি, লেটুশ, গাজর আর টকটকে লাল রঙের টম্যাটো চাকতি করে কাটা। সুস্বাদু ইতালিয়ান সস দিয়ে শুরু হল মধ্যাহ্নভোজন। ডাগলাস ভাবলেন আজকের মধ্যাহ্নভোজনে স্যালাডটা

দারুণ হয়েছে। চেটেপুটে খেয়ে যখন মনে মনে তৈরি হলেন যে কী প্রশ্ন নিয়ে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে আলোচনা করবেন—তখন কৃষ্ণমূর্তি ইশারা করে বাবুর্চিকে বললেন পরবর্তী থালা আনতে। এবার এল দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় থালি। পাঁপড়ভাজা, রসম, সম্বর, তরকারি, বাটার মিল্ক, দই আর পর্বতাকার বাসমতি চালের ভাত—সঙ্গে তিনটে ছোট ছোট স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে ঘি, আমের পিক্‌ল আর নারকোলের চাটনি। ডাগলাসের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। জে কে দিব্যি চেটেপুটে সব উড়িয়ে দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন, যেন বজ্রাসন করছেন। অনেক কষ্টে ডাগলাস ম্যারাথন রানারের পর্যায়ের দৌড়ের মতো একটু একটু করে সবটা শেষ করে করুণ দৃষ্টিতে জে কৃষ্ণমূর্তির অভিব্যক্তিবিহীন মুখের দিকে তাকালেন। জে কে ওস্তাদ খিলাড়ির মতো বললেন, ইয়ংম্যান শরীরকে যত্ন করতে জানা একটা নিগূঢ় শিল্পকলা। দিনের বেলা খাওয়ার শেষে একটু মিষ্টি, যাকে আপনাদের দেশে ডেসার্ট বলে, খাওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবার জে কে বাবুর্চির সহকারীকে সব থালা নিয়ে যেতে বললেন। ডাগলাস ভাবলেন বাঁচা গেল—খাওয়াদাওয়া তাহলে শেষ। কিন্তু ডাগলাস নিঃশ্বাস শেষ করার আগেই যা দেখলেন তা তাঁর মস্তিষ্ক বিশ্বাস করতে চাইল না। মনে হল বহুদূর থেকে জে কে-র কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনলেন—এটা ভারতীয় মিষ্টি। ভারতীয় কায়দায় ডেসার্টে সেদিন ছিল বিরাট এক জামবাটি ভর্তি পায়েস, বেশ কয়েকটা রসমালাই আর একবাটি পানতুয়া। ডাগলাস ভাবলেন এবার বোধহয় প্রাণটাই যাবে। পালাবার কোনও পথ নেই, মার্কিনি আত্মাভিমান, এই ১২৫ পাউন্ডের বৃদ্ধ ভারতীয় ভদ্রলোকের কাছে ১৬৫ পাউন্ডের মার্কিন জোয়ান দরকার হলে মাথা নিচু করে পরাজ্ঞান ভিক্ষা করতে পারেন কিন্তু খাওয়ার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়াটা মৃত্যুর সমান বলে মনে হতে লাগল। অথচ খেতে গেলেও যে সসম্মানে টেবিল থেকে উঠে যেতে পারবেন এমন কোনও নিশ্চয়তাও বোধ হচ্ছিল না। এদিকে শরীরটাও ভেতর থেকে যেন বিদ্রোহ করছে। খাবার দেখে কেমন একটা বিতৃষ্ণার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। অন্তরাত্মা কেন যেন সর্বত্যাগের অসাধারণ বাসনার কথা লোমকূপে লোমকূপে ঘোষণা করছে। চোখ দু'টোরও বলিহারি, আধ ঘণ্টা আগে এমন জিনিস দেখলে কেমন অসাধারণ প্রেরণার বিকাশ ঘটত, দারুণ একটা ভালো লাগার জন্ম দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিহরণ জাগিয়ে এই দেহযন্ত্রটা বিভিন্ন গ্লান্ডগুলোকে দিয়ে রস নিঃসরণ ঘটিয়ে তৈরি হয়ে যেত একাত্ম হওয়ার জন্য। মনে হতো একেকটা মিষ্টির টুকরো জিহ্বাগ্রের স্পর্শ পাওয়ার পরম বাসনায় অধীর হয়ে

উঠেছে। আর এখন মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। প্রকৃতির ব্যবহার যেন সমুদ্রের ঢেউয়ে চড়ার মতো, উপরে উঠিয়ে ধপাস করে নিচে ফেলে দিল। এসব ভাবতে ভাবতেই জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বাটি সব খালি। ডাগলাস আমতা আমতা করে খাচ্ছে, আর রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছে, বাবুর্চি এখন মৃত্যুতর দেবতা—খালি হাতে এলেও মৃতদেহটাকে নিয়ে যেতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে এবং খালি হাতে বাবুর্চিকে দেখাটাই যেন এখন তাঁর অন্তিম বাসনা বলে মনে হল। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের মনের জোর তো আর প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতো নয় যে যখন যা ভাবা হয় অমনি সেটাই ঘটে যায়। এক্ষেত্রে উলটোটাই হল। বাবুর্চি বিশাল দু'টো আইসক্রিম নিয়ে হেলেদুলে ঘরে ঢুকল—আর শোনা গেল মৃত্যুঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে জড়ানো জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দৈববাণী, 'এটা আপনাদের দেশের ডেসার্ট।'

ইউ জী যথারীতি গরম জল দিয়ে বমনধৌতি সারতে রেস্টুরেন্টের পেছনে আবর্জনা ফেলার বড়সড় একটা ড্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি আশপাশে পায়চারি করতে লাগলাম। আর যেন কিছুই দেখছি না এরকম একটা ভান করে মরুভূমির ধু-ধু বালির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইউ জী কয়েক ঝলকে সমগ্র আহারের পঁচানব্বইভাগ ইঁদুর, মাছি এবং স্ক্যাভেঞ্জার প্রাণীদের জন্য দেহমন্দিরের বাইরে নিক্ষেপ করলেন। সবাই ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ডাগলাস রোজেনস্টাইন খাওয়াদাওয়ার কোয়ালিটি নিয়ে একটু সমালোচনা করলেন। আমি তাঁকে একটা চুইংগাম ধরিয়ে দিলাম। মৃদু ধন্যবাদ শোনার পর শুধু কয়েকটা চোয়াল নাড়ানোর আওয়াজ ছাড়া আর কিছু কানে এল না। হুহু করে গাড়ি চলতে লাগল নেভাদা মরুভূমির বুক চিরে—তেতে-ওঠা কালো রাস্তার ওপর দিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম জুলীর গাড়িটা বিশ্বস্ত সাদা ঘোড়ার মতো প্রভুকে অনুসরণ করছে। ড্রাইভারের পাশে বসে মহেশ ভাট কাউবয় সিনেমার নায়কের মতো আমাদের দিকে তাঁর ডানহাতে যেন একটা পিস্তল আছে এমন ভান করে মুঠোহাত থেকে তর্জনী-মধ্যমা খুলে অঙ্গুষ্ঠ ঊর্ধ্বমুখী করলেন। এবার অঙ্গুষ্ঠ যেই নামাচ্ছেন আর পুরো হাতটা ঝাঁ করে উপরে উঠিয়ে নিচ্ছেন—এভাবে একই প্রক্রিয়ায় আমাদের তিনবার গুলি করার নাটক দেখালেন।

লাস ভেগাসে পৌঁছে গেছি। এমন নাটকীয় এ জায়গাটা যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা যায় না। এখানে প্রকাশ্যে জুয়া খেলা হয়, শরীর ভাড়া করা হয়, আর নানা রকমের নেশার সামগ্রীতে ভরপুর এই শহর। সভ্য সমাজের সৃষ্ট মরালিটির দিকে ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি নিয়ে প্রায় উন্মুক্ত বক্ষ প্রদর্শন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী লাস ভেগাস। তার লাস্যময় আহ্বানে বড় বড় রথী-মহারথী সর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এতে অন্য কারও কোনও হুঁশ নেই—পরবর্তী পথিকের কাছে বেতের মতো কোমরের বারাঙ্গনাটি যেন সেই একই ললনা। এই শহরের মূল কর্মকাণ্ড হল জুয়া খেলা। আর এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল সমাজ। লক্ষ লক্ষ অতিথিকে সেবা করে এবং তাদের যত প্রাণ চায় তত আনন্দ দান করে বাড়ি ফেরাবার কাজ করেই এখানকার বাসিন্দাদের সমস্ত জীবন কেটে যায়। এখানকার লোকেদের জীবনযাত্রার কথা ভাবতে ভাবতে আর চারিদিকের অসাধারণ ঘরবাড়ি, বিশাল বিশাল হোটেল, চোখ-ধাঁধানো আলোর রোশনাই দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম আমার আশপাশের লোকজনের কথা। পিছনে ফিরে দেখি জুলীর গাড়ির কোনও হদিস নেই। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে যখন কোনও হদিস পাওয়া গেল না তখন ইউ জী-কে বললাম, জুলীরা হারিয়ে গেছে—আমরা কিছুই ঠিক করিনি কোথায় উঠব। ইউ জী নির্বিকার নিশ্চিন্ত স্বরে বললেন, কোথায় আর যাবে!

আমাদের এখন কোথায় যাওয়া দরকার এই ব্যাপারটা নিয়ে নানা রকম আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেল। প্রায় দু'বার দু'টো আলাদা পার্কিং লটে ঢুকতে ঢুকতেও ঢোকা হল না। ইউ জী বললেন, আরেকটু এগিয়ে চলুন। ডাগলাস এবার প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনও পরামর্শই দেবেন না। কারণ তিনি যখনই কোনও পরামর্শ দেন, সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন এবং যখন সে কাজটা প্রায় সম্পন্ন হতে যাবে তখনই ইউ জী অন্য কিছু করতে বলেন। এটাই ডাগলাসের সমস্যা—এই সব ঘটনা তাঁর অভিমান ক্ষুণ্ন করে। আমরা আরও অনেক ঘাটের জল খেতে খেতেও না খেয়ে অবশেষে এমজিএম গ্র্যান্ড হোটেল ক্যাসিনোর নিকটবর্তী একটা বিশাল পার্কিং লটে ঢুকলাম। প্রায় কানায় কানায় ভর্তি এই গাড়ি রাখার নির্ধারিত জায়গায় একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া রীতিমতো দুষ্কর। অনেক কষ্টে যখন একটা জায়গা পাওয়া গেল, দেখি জুলী, মহেশ ভাট, তনুজা চন্দ্রা আর মারিও তাদের দীর্ঘ মোটরভ্রমণের ক্লান্ত দেহগুলোকে নিয়ে হেলেদুলে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। জুলীর

চোখ ইউ জী-র ওপর পড়তেই চিৎকার করে বলে উঠলেন, ও মাই গড! এটা একেবারে অসম্ভব! একেই বলে ইউ জী-র অলৌকিক শক্তির খেলা! আমি বললাম, এটা একটা বিরল কোইন্সিডেন্স। জুলী ভ্রূকুটি করে আমাকে হেলাফেলায় উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিমায় বললেন, কোইন্সিডেন্স! হাজার হাজার গাড়ি রাখার জায়গা এবং শয়ে শয়ে হোটেল আছে এই ক্যাসিনো সিটি লাস ভেগাসে। আমি ভেবেছিলাম যে আপনাদের হারিয়ে ফেলেছি এই শহরে। আমাদের কারও কাছেই কোনও সেলফোন নেই যে কোনওরকম যোগাযোগ করা যাবে। কি করে সম্ভব যে আমরা তিনবার এখানে ঢুকি ওখানে ঢুকি করতে করতে অবশেষে এখানে এসে ঢুকলাম যেখানে ইউ জী-ও ঢুকেছেন। জুলীর দৃঢ়তা দেখে আমার মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের দৃশ্যটা মনে পড়ল... পর্বত হতে নদী বাহিরায় যবে সিন্ধুর উদ্দেশে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি...। ইউ জী-র abnegation-এর সামনে অবশ্য এসব শুকনো পাতার মতো উড়ে গেল।

আমাদের সবার মধ্যেই হয়তো মিস্টিফাইং করার একটা গভীর প্রবণতা আছে এবং এই প্রবণতা শুধু বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেই মনে রাখার চেষ্টা করে এবং সেগুলো মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে—এরপর হয়তো সামান্য কোনও ঘটনাও আর নির্লিপ্তভাবে দেখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। জুলীর পশ্চাৎপট হল পাঁচ বছর ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি এবং পাঁচ বছর ইয়ুংয়িয়ান সাইকোলজি। ইউ জী-র মন্তব্য হল ওইসব সাইকিয়াট্রিস্টদেরও ওই একই রোগ ছিল। আমাদের দেশের লোকেদের যেমন কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস—তার থেকে পশ্চিমাদের এইসব বিশ্বাসের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। মানুসের যেমন চোখ, কান, নাক, জিহ্বা বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ আছে—সেইরকম কি 'সাইকি' বলে কিছু আছে? সাধারণ লোকেদের এভাবেই বোঝানো হয়—বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নেবার যেমন পদ্ধতি আছে—সেরকম 'সাইকি'র যত্ন নেবার পদ্ধতিও ওইসব সাইকিয়াট্রিস্টরা লিখে রেখে গেছেন। আমাদের ঋষিরা এইসব মায়া বলে পাঁচ হাজার বছর আগেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইউ জী-র সেখানেও negation আছে, তাঁর মতে ওইসব তত্ত্ব ঋষিদের মাথায় এসেছিল সোমরস খাওয়ার ফলে। জুলী এইসব যুক্তিতর্কের ধারেকাছে ঘেঁষেন না। তাঁর কথা, আপনাদের লজিক আপনাদের জীবনে কাজ করুক সেটাই আমি চাই। কিন্তু আমার জীবনে কী কাজ করে সেটা আমি জানি—আপনাদের দর্শন আমার কাছে অকেজো।

১০.

এমজিএম গ্র্যান্ড ক্যাসিনোতে ঢুকলাম। চারিদিকের আওয়াজ, রংবেরঙের আলোর ঝলকানি আর একটা বিশাল দেওয়াল জুড়ে সিনেমার পর্দার মতো চলচ্চিত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে যেন বাইরের কোনও কিছু হরণ করে নিয়েছে। মানুষের এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমি যেন নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেললাম। তিরিশ ফুট চওড়া আর একশো ফুট লম্বা দেওয়াল নিয়ে একজন গিটার বাজিয়ে গান গাইছে, সেটারই একটা চলচ্চিত্র। কিন্তু কার্পেটের ডিজাইনের মতো সেই একই দৃশ্যের প্রায় তিরিশ-চল্লিশবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সারা দেওয়াল জুড়ে। আমরা সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট আর দু'পাশে সারি সারি স্লট মেশিন। আপনাকে বিশেষ ধরনের কয়েন কিনে ওই মেশিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট পরিমাণের কয়েন ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর হয় একটা হাতল টেনে নিচে নামাতে হবে, নয়তো একটা বোতাম টিপে দিতে হবে। চোখের সামনে কতগুলো সংখ্যা বা চিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে হতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বা চিত্র সমন্বয়ে শেষ হবে। যদি সবচেয়ে দামী সমন্বয় লেগে যায়, তাহলে সাইরেন বাজার মতো আওয়াজ করে, নানারকম রঙিন আলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করে দেবে। ঝনঝন করে পয়সাবৃষ্টি হতে থাকবে আর সেই ধাতুর চাকতিতে চোখের সামনে পাহাড় তৈরি হয়ে যাবে।

এই আলো আর শব্দের সঙ্গে কিছু পাওয়ার গভীর আনন্দ মিলেমিশেই হয়তো সৃষ্টি হয় একটা অপরিসীম চাহিদার—যাকে বলা যেতে পারে নেশা। কেউ কেউ কদাচিৎ সেটা পায় এবং সেটা হয়তো কখনও আমার ভাগ্যেও থাকতে পারে এই আশা বাড়ায় নেশা। ভাবছি নেশা জিনিসটা কী—পয়সাবৃষ্টির ঝঙ্কার হয়তো হাইপো-থ্যালামাসের বিশেষ কোনও নিউক্লিয়াস থেকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে পাঠায় অনির্বচনীয় সংবাদ। এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড যাকে প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা আজ্ঞা চক্র বলে মনে করতেন, সেটাকে পশ্চিমা শারীরবিদরা বলেন 'কন্ডাকটর অফ দ্যা এনডোক্রাইন

অর্কেস্ট্রা'। এরই নির্দেশে আমাদের দেহে বহু কিছু ঘটে চলেছে। সেটা না মানলেও অবশ্য তার কাজ বন্ধ হয় না। বেচারা কন্ডাকটর হয়তো সংবাদের তার পেয়ে উত্তেজিত হয়ে সুরেনাল গ্ল্যান্ডকে বলল রক্তে অ্যাড্রেনাইল মিশিয়ে দিতে—সেই রক্ত যখন মাথায় গেল তখন যে আনন্দধারা বয়ে চলল তার সামনে অন্য সব বিচার-বিবেচনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হল। এই পরমানন্দের অবস্থা মস্তিষ্ক-নিউরনের মধ্যে সাইন্যাপ্সের সহযোগে আতসবাজির মতো এক গভীর নকশা তৈরি করে। এই নকশা কীভাবে যেন সেই ঝঙ্কারের প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমের পরিণতি! সে তো সবাই জানে। গলার সোনার হার খুলে চলে গেল স্লট মেশিনে, হাতের রোলেক্স ঘড়ি সেটাও গেল, ঝঙ্কারের প্রেম—সেই ঝলমলে আলো আর ধাতুর চাকতির পাহাড় আরেকটিবার দেখার আশায় রক্তে লেগেছে আগুন। রাজা তার দায়দায়িত্ব রাজত্ব সব ভুলে যায়—এই ধরুন আমাদের মহাভারতের যুধিষ্ঠির—যাঁর পরিচয় ধর্মে, কর্মে মতিস্থির—তাঁর পরাজ্ঞান পর্যন্ত সেখানে কাজ করল না। মানুষ তার একমাত্র সম্পত্তি নিজের দেহটাকে পর্যন্ত ধ্বংস করতে পিছপা হয় না।

চলতে চলতে একটা স্লট মেশিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দৃশ্যটা বেশ মজার। মেশিনের সামনে রাখা চেয়ারে সোনালি ফ্রেমের দামী চশমাপরা অন্তত সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা লম্বা একটা সিগারেট ধরিয়ে বড়সড় একটা কৌটো ভর্তি কয়েন নিয়ে বসে পড়লেন। আমি ইউ জী-কে চোখের ইশারায় দৃশ্যটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি খেলবেন নাকি এক হাত? ইউ জী আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, আপনার আর আমার এ জীবনে আর জুয়া খেলা হল না। আমাকে একটু হকচকিয়ে যেতে দেখে চটপট প্রসঙ্গটা নিজের দিকে টেনে নিলেন। বললেন, আচ্ছা আমি কেন জুয়া খেলব—পয়সা আমি না চাইলেও কীভাবে যেন এসে যায়। আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাহলে দেখুন একটা মজা—বলেই হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। এমন একটা ভাব যেন ঈশ্বরকে অঙ্গীকার করছেন—আমার হাতে যদি পয়সা না আসে তাহলে ত্রিনয়ন খুলে দেব। হঠাৎ দেখি জুলী তাঁর প্রভুর মানরক্ষার জন্য একগাদা ডলারের নোট ইউ জী-র হাতে ধরিয়ে দিলেন। নোটগুলো আমার চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে ইউ জী বললেন, দেখলেন তো পয়সা কামানো কেমন সহজ সরল ব্যাপার। পাঁচটা একশো ডলারের নোট রেখে বাদবাকি নোটের তাড়া জুলীকে ফিরিয়ে দিলেন।

মহেশ ভাট সবসময় লোকজনকে দেখানোর এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তাঁরা কী করছেন এবং কেন করছেন। এটা করার সময় তিনি ইউ জী-কেও মাঝে মাঝে জড়িয়ে ফেলেন। সে যাই হোক, টাকার ব্যাপারটা যেই একটু শান্ত হয়েছে, মহেশ ভাট ইউ জী-র কানে প্রায় মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন—যদিও আমরা সবাই সেটা শুনতে পাচ্ছি, কারণ সেটাই মহেশ ভাটের উদ্দেশ্য—আচ্ছা এইসব লোকজন আপনাকে এত টাকাপয়সা দেয় কেন? ইউ জী সরাসরি বললেন, তা আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, যারা দেয় তাদের জিজ্ঞাসা করুন। এবার মহেশ ভাট জুলী থেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, জুলীজী আপনি ভাবছেন ইউ জী-কে পয়সা দিলে আপনার পয়সা অনেকগুণ বেড়ে যাবে, তাই না? যেমন লোকে তিরুপতি, বৈষ্ণোদেবী বা কালীঘাটে পয়সা দেয়। আর এই ব্যবসায়িক ভাবনা যদি আপনার মধ্যে নাও থেকে থাকে তাহলে ভাবছেন ইউ জী-কে খুশি করতে পারলে আপনার প্রচুর পরিমাণ আধ্যাত্মিক মালমশলা অর্জন হবে। জুলী ততক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। মহেশ ভাট তখন সবার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা সবাই ভুল করছেন, ইউ জী-র মেশিনটা একটা ব্ল্যাক হোলের মতো—সর্বস্ব গ্রাস করে ফেলবে—কোনও কিছু ফেরত আসবে না। ইউ জী তখন হাসতে হাসতে বললেন, মহেশবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তনুজা চন্দ্রা যিনি মহেশ ভাটের খুব ঘনিষ্ঠ, তিনি এবার বাঘিনীর মতো মহেশ ভাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং উচ্চস্বরে রীতিমতো ঝগড়া করার ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন সবসময় ইউ জী-র দেওয়া একটা ডলার আপনার মানিব্যাগে রাখেন? উত্তর দিন?" মহেশ ভাট গম্ভীর নাটকীয় স্বরে বললেন, "সে টাকাটা আমি ইউ জী-র মানিব্যাগ থেকে চুরি করেছিলাম, আমার তস্করবৃত্তির নমুনা রাখার জন্য সেই ডলারটা আমি সবসময় আমার ব্যাগে রাখি। তাছাড়া সবাই ইউ জী-কে পয়সা দিতে চান, কিন্তু আমি সবসময় তার কাছ থেকে পয়সা নিতে চাই।" সবাই চুপ, মহেশ ভাট ইউ জী-র দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার! চারিদিকে শুধু টাকার খেলা।"

মনে পড়ছে ছোটবেলায় একটা গান শুনতাম '... বন বন বন... টাকায় ঘুরছে এই দুনিয়াটা ...' এমন কী আছে যা টাকায় কেনা যায় না! যাঁরা এসব পরিত্যাগ করতে বলেন তাঁরা কতটা সৎ সেসব বোঝা খুব দুষ্কর। কি জিনিস এই টাকা! এমনকী গদাধর চাটুজ্জের মতো মানুষও সব গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার পর একটু ঘাবড়ে

গিয়েছিলেন—লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেয় তাহলে কী হবে? সত্যি কথা হল মানুষ সব অধিকার করে বসেছে... খিদে পেলে একটা গাছের ফল ছিঁড়ে খাওয়ার জো নেই—দু' পয়সা মাইনের পেয়াদা পিটিয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে—নয়তো জেলে পুরে দেবে। সেখানেও বিনা পরিশ্রমে খাওয়া জুটবে না। ভাবলাম মানুষ জোট বেঁধে কী সর্বনাশটাই না করেছে। সে যাই হোক, কিন্তু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের পর টাকার কী দরকার? মানুষের সেটা বোঝা হয়ে গেলে লাস ভেগাসের কী দশা হতো তা ভেবে আর কাজ কি? কিন্তু আমরা এখানে কী করছি? জুলী তার ভিডিও ক্যামেরা বার করাতে ডাগলাস ছুটে এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন।

ডাগলাসের কথা লাস ভেগাসের কর্মকাণ্ডে আমার কানে এসেছিল কি না জানি না, তবে আমার মাথার মধ্যে যে ভাষণ জেগে উঠেছিল সেটা ছিল এরকম। মনে হল একজন সংবাদদাতা জীবন্ত ধারাবিবরণী শোনাচ্ছেন—এই যে ছোট একটা দল দেখছেন, এটা হল ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির বাহিনী। তীর্থ করতে এসেছেন লাস ভেগাসে। এটা একটা সাংঘাতিক দল। যেমন লাস ভেগাস সভ্য সমাজের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে অবহেলায় মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আছে—সৃষ্টি করেছে এক নতুন জীবনযাত্রা—ঠিক সেইরকম এই দলটা সমাজ মরুভূমির মাঝে অস্তিত্বের এক নতুন বীজ বাপন করতে চলেছে। মানুষের সাধারণ হালকা অভিজ্ঞতায় এই দলের লোকেদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের নজর হল দেহের মধ্যে এক অসাধারণ বীজ বপন করে একটা নতুন অস্তিত্বের জাগরণ ঘটানো—এই জাগরণ মস্তিষ্কের সমস্ত প্রোগ্রাম নতুন করে লিখে দেবে—প্রকৃতির সঙ্গে ঐকিকভাবে বাঁচতে বাধ্য করবে—এবার শুনলাম ডাগলাস বলছে, সাবধান! সাবধান! সাবধান! হঠাৎ ডাগলাসকে দেখে মনে পড়ল বাবার তাস খেলার বন্ধুদের কথা—খেলা শুরু হওয়ার আগে এমন বকুনি মারতেন মনে হতো—প্রত্যেকেই যেন একেক বছরের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন।

মহেশ ভাট জুলীর হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে ইউ জী-র পেছনে ফোকাস করে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। ইউ জী-র দু'টো হাতই পিছনে। বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাতের কবজি ধরা আর ডানহাতের তিনটে আঙুলের মধ্যে কড়কড়ে পাঁচটা একশো ডলারের নোট হাওয়ায় দুলছে। কয়েক মিনিট শ্যুটিং চলার পর ইউ জী টের পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললেন, পেছনে কেন, সামনাসামনি

আসুন। আমরা বললাম, আপনার পয়সা কামাবার ব্যাপারটা আমরা অমর করে রাখতে চাই। মানুষ মরে গেলে সব শেষ হয়ে যায়—পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে কি না সেটা জানা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সেলুলয়েডের এই চিত্রের মাধ্যমে প্রিয়জনের কাছে তাঁকে পুনর্জীবিত করে তোলা সম্ভবপর। ইউ জী এবার সরাসরি আক্রমণ করলেন। বললেন, "আমার এই যে টাকার প্রতি অনুরাগ, ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা উপহাস করছেন—আপনারা কি আপনাদের নিজেদের গভীর ইচ্ছাগুলো কখনও খেয়াল করে দেখেন? সৎভাবে নিজেদের মর্মস্থলে একবার ডুব মেরে অনুধাবন করে দেখুন, দেখবেন সেখানে টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে সেইসব টাকা দিয়ে কেনা যাবে। অথচ মজার ব্যাপারটা হল, আমাকে আপনারা টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না। একবার এক বিখ্যাত জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠী গণনা করে বলেছিলেন, আমি যদি মা লক্ষ্মীকে পদাঘাতও করি তবুও তিনি আমার পিছু ছাড়বেন না।" এইসব বলতে না বলতেই আমরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললাম। আমি বললাম, আমাদের এইরকম একটা অবস্থায় আসার মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়ে দিন—তাহলে সব ঝামেলা শেষ—কাওকে আর তোষামোদ করতে হবে না—কারও কাছে আর কোনওদিন মাথানিচু করার দরকার হবে না। ইউ জী আমাদের যা বললেন তা নিজের কানকেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। বললেন, কায়দা একটা আছে। আমি এমন গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম মনে হল বাইরের শব্দময় জগৎ যেন হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। তাঁর ঠোঁট দু'টো ছাড়া আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার চোখের সামনে থেকে লোপাট হয়ে গেল—শুনতে পেলাম সেই কম্পমান ঠোঁটের পশ্চাৎ থেকে উৎসারিত ধ্বনি—"যখন তোমার কাছে আর কোনও পয়সা থাকবে না, পয়সা রোজগার করার কোনওরকম কায়দাও থাকবে না—কাল কী খাব তাও জানো না—অথচ মনে কোনও আক্ষেপের লেশমাত্র নেই—তখন সমস্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো তার আপন আপন জায়গায় জাদুর মতো এসে হাজির হবে। আর এই যে শেষ বাক্যটা বললাম, এটা যতদিন মাথায় থাকবে ততদিন কিছুই হবে না!" বুঝলাম এসব জিনিস কোনওদিন কারও কাছ থেকে শেখা যায় না—এটা শেখার জিনিস নয়—এসব কোনওদিন চেষ্টা করে করা যায় না। হঠাৎ মনে হল চোখ বুজে বসে থাকলেই যদি নরেনবাবুর মতো হওয়া যেত তাহলে কি আর আমার স্বপ্নের মাতৃভূমিতে মেরুদণ্ডের অভাব হতো! জানি না কোথা থেকে এইসব বিচিত্র উপমা আমার মাথার মধ্যে আসে।

আমরা লাস ভেগাসে পা দিতে না দিতেই এমনভাবে মেতে গেছি যে আমরা তখনও জানি না সেই রাতটা লাস ভেগাসে কাটাব না পাম স্প্রীং-এ ফিরে যাব। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক এমজিএম-এ কাটিয়ে আমরা পার্কিং লটে আমাদের গাড়ির সামনে ফিরে এলাম। থাকব না ফিরে যাব, সেসব নিয়ে আলোচনা উঠল। ইউ জী-র কথা মোটামুটি শেষ কথা। তিনি বললেন, "এতদূর যখন আসা হল, তখন রাতের লাস ভেগাস না দেখে ফেরাটা উচিত হবে না। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একজন রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে একটা বড়সড় হোটেল রুম বুক করে এলেন। আমরা সবাই মিলে সেই নির্ধারিত ঘরের দিকে এগোলাম। রুমটা বাইশ তলায়, লিফটে করে পৌঁছে গেলাম। লিফট থেকে বেরিয়ে দেখি চওড়া কার্পেটে মোড়া বারান্দা। দু'পাশে সারি সারি ঘর। তিন-চারটে ঘর বাদে বাদে একটু খালি জায়গা, আর সেখানেও স্লট মেশিন। যদি কখনও অতিথির মনে হঠাৎ জুয়া খেলার বাসনা জাগে তখন যেন বেশিদূরে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়। কারণ হাঁটতে হাঁটতে হয়তো তার মন পালটে যেতে পারে। আমরা নির্ধারিত ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। একটা প্লাস্টিকের কার্ডে অনেকগুলো ফুটো আর সেটাই হল ঘরের চাবি। দরজায় তালার জায়গায় পেতলের একটা চৌকো প্লেট—সেখানে তিন সেন্টিমিটার বাই তিন মিলিমিটার একটা ছিদ্র। মারিওর হাতে সেই প্লাস্টিক কার্ড। তিনি কার্ডটা ছিদ্রে প্রবেশ করালেন এবং হাত ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। দরজা খুলল না। ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ইতালিয়ান মাফিয়াদের এরা খুব ভালো করে জানে।" মারিও করুণ সুরে বললেন, "তিন বছর আগে এ কথা বললে হয়তো তার একটা গুরুত্ব থাকত। কিন্তু এখন আমি কুলিগিরি করেও আমার পেট চালাতে পারছি না, বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে, এখন আপনি কি করে এইসব বলছেন।" ডাগলাস এবার এগিয়ে এসে কার্ডটা হাতে নিলেন। এমন একটা ভাব যেন এ এক দুরূহ কাজ। কার্ডটা পেতলের স্লটে ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে কার্ডটা বের করে নিলেন। এবার নব ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল যেন 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটা শুধু তাঁরই জানা।

সবাই মিলে ঘর দেখতে লাগলাম। ইউ জী এখানে একটু বিশ্রাম করবেন। আমরাও স্নান, খাওয়াদাওয়া করে রাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সকালে ফিরে যাব। এইরকম একটা পরিকল্পনা আছে। বসার ঘরে একটা চেয়ারে ইউ জী বসে

পড়লেন। ডাগলাস ইউ জী-কে দশ ডলারের একটা নোট দিলেন থাকা-খাওয়ার জন্য। চাঁদা ওঠানো হচ্ছে। ইউ জী বললেন, আমার কাছে মাত্র ছাব্বিশ ডলার খুচরো আছে। ল্যারি মরিস সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো নোট অনেক ভাঁজ করে পুঁটলি বানিয়ে ইউ জী-র হাতে গুঁজে দিলেন—যে রকম ট্রাফিক পুলিশের হাতে ট্রাক ড্রাইভারের চেলা নোট গুঁজে দেয়, অনেকটা সেইরকম মনে হল। ইউ জী ল্যারি মরিসের দেওয়া টাকা গুনতে শুরু করলেন। কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ, পয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ, একান্ন..., একটা অট্টহাসি দিয়ে বলে উঠলেন, একেই বলে calculated Jews অর্থাৎ 'হিসাবী ইহুদি'। আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, একদম ঠিক ঠিক দ্বিগুণ! ল্যারি ভীষণ লজ্জা পেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে পুরো মানিব্যাগটা, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডসহ ইউ জী-র পায়ের ওপর রেখে দিলেন। ইউ জী সযত্নে মানিব্যাগটা ল্যারি মরিসের হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ইউ জী বললেন, একে বলে পরিবর্তন। এই ল্যারি মরিস দু'দিন আগেও পকেটে হাত ঢোকাতেন পয়সা দেবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পয়সা দিতেন না। আমার মনে হতো ল্যারি মরিসের হাতের আঙুলেও ব্রেন আছে—অন্যের নাম করে হাত পকেটে ঢুকলেও—আঙুলের যেন পয়সার ওপর অপরিসীম বিরক্তি এমন একটা ভাব দেখিয়ে হাতকে পকেট থেকে পয়সা ছাড়া বেরিয়ে আসতে বাধ্য করত। এবার ইউ জী সব টাকাগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী-র সামনে মাটিতে বসে পড়লাম। বললাম, আপনার যখন এতই বিতৃষ্ণা এবং অবহেলা ঠিক আছে—মা লক্ষ্মী তুমি আমার কাছে এসো বলে সব কুড়িয়ে কাছিয়ে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে নিজের পকেটে পুরে দিলাম! মনে পড়ল আমাদের বাড়িতে মা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন... টাকার জন্যই... দোলপূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ... লক্ষ্মী দেবী বামে করে বসি নারায়ণ... ইউ জী শুধু বললেন, দেখলেন তো যা সহজে আসে তা সহজেই চলে যায়...।

রাতে লাস ভেগাসেই থাকা হবে। আর এই একটা ঘর, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, সবার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এমজিএম থেকে বেরিয়ে এলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি ইউ জী-র পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমার বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে পারদর্শী আঙুলের ক্ষমতার নমুনা দেখিয়ে তাঁর পকেটে

লুকিয়ে লুকিয়ে যত টাকা কুড়িয়েছিলাম সব যথাস্থানে রেখে দিলাম। ইউ জী-র অসাধারণ awareness, ইন্দ্রিয়গুলো অসম্ভব সজাগ। টের পেয়ে গেলেন। আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, আরে রেখে দিন—রেখে দিন। আমি বললাম... এ জীবনে আর জুয়া খেলা হল না, কোনওরকম নেশার সামগ্রী স্পর্শ করতে পারি না, কারও সঙ্গে রাত কাটাতে প্রবৃত্তি হয় না—পয়সা দিয়ে আমি করব কী এখানে? তাছাড়া জ্যোতিষীর কথাটাই সত্য হোক। মা লক্ষ্মীর আপনার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া হয়তো কোনও গতি নেই। বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে দেখি মহেশবাবু কার্পেট থেকে কী যেন একটা তুলে নিলেন। তনুজা চন্দ্রার চোখে সেসব এড়ায় না, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, ইউ জী, ইউ জী, মহেশ আবার আপনার টাকা নিল। ইউ জী-র পকেটে যখন টাকা রেখেছিলাম, সেটা বের করার সময় হয়তো একটা ডলার পড়ে গিয়েছিল। ব্যাস, মহেশ ভাট বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে সেটা দখল করে নিয়েছেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি গর্বিত। মহেশ ভাট বুক চিতিয়ে বললেন, "ফাইন্ডার কিপার, লুজার উইপার।" যে পায় সে রেখে দেয়, আর যে হারায় সে কাঁদে—কথাটা আমার রহস্যময় বলে মনে হল। চোখে চোখ রাখলাম জিজ্ঞাসাভরে, ঠোঁটে এক অদ্ভুত বিজয়ের হাসিমাখা আনন্দ। হয়তো ইউ জী বলে-যে ব্যক্তিত্ব—সে ব্যাপারটাই এই রকম—এই এত লোকের মধ্যে আর পাঁচজনের মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক অতুলনীয় ক্ষণজন্মা পুরুষ—কেউ কিছুই জানে না—হয়তো মহেশ ভাট জানতে পেরেছেন এ এক আলাদিনের প্রদীপ! হয়তো আমার চিন্তাভাবনা এবং ইউ জী-কে আমার ভালো-লাগা—মহেশ ভাটের কথার মধ্যে এইসব দেখতে বাধ্য করছে। ইতিমধ্যে ইউ জী অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। আপাতত যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ রাতে কোথায় থাকা হবে এবং ক'টা ঘরের দরকার, সেইসব কথার মধ্যে। ইউ জী-কে ঘিরে আমরা পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার কার ঘরের দরকার। সবার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, আমি একা থাকতে চাই। জুলী, মারিও, ল্যারি, সবাই যার যার তার তার একাই থাকতে চায়; ডাগলাস-অলিভিয়া একটা রুমে, মহেশ ভাট এবং তনুজা চন্দ্রা বললেন, তাঁরা কোনওরকমে একটা রুমে ভাগাভাগি করে রাত কাটিয়ে দেবেন। ইউ জী খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, আমরা যদি এতগুলো রুম নিই তাহলে হয়তো একটা রুম ফাউ পাওয়া যাবে। এবার নিজেকে দেখিয়ে বললেন, সেই বিনি পয়সার ঘরটা এই অনাথের প্রাপ্য। আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম অ-নাথ! হে ঈশ্বর তুমি সমস্ত ভারতবাসীকে এমন অনাথ করে দাও।

'হলিডে ইন'-এ অনেকগুলো রুম নেওয়া হল। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমার রুমটা ঠিক ইউ জী-র ঘরের উলটোদিকে। আধ ঘণ্টা পরে সবাই ব্যালকনিতে এসে মিলিত হবেন, এরকম ঠিক হল। যে যাঁর নিজের নিজের রুমে চলে গেলাম। পকেটে মানিব্যাগ এবং রুমাল ছাড়া আর কিছুই নেই। হোটেলে প্রায় সব কিছু আছে। একটা চিরুনি, পুঁচকে পেস্ট এবং টুথব্রাশ হলেই মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। রুম বন্ধ করে ব্যালকনিতে চলে এলাম। আমিই প্রথম—এরপর জুলী, মারিও, ইউ জী এবং ল্যারি হাজির হলেন। মহেশ ভাট এবং তনুজা চন্দ্রার কোনও খবর নেই। রুমে টোকা মেরে কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। মারিও জানালেন যে তাঁরা বলছিলেন তাঁদের খুব খিদে পেয়েছে। হয়তো আশপাশে কিছু খেতে গিয়ে থাকবেন। ইউ জী বললেন, চলুন এখন আমরা একটু ঘুরে আসি। পরে রাত্রে আবার সবাই মিলে ঘুরতে যাব। আমরা সিজার প্যালেসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

১১.

আমি, ড. ল্যারি মরিস, মারিও, সিস্টার জুলী থেয়ার এবং ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি জুন মাসের উত্তপ্ত লাস ভেগাসের রাস্তা দিয়ে হলিডে ইন থেকে সিজার প্যালেসের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আজ জুন মাসের কুড়ি তারিখ। আমার স্ত্রী লক্ষ্মীর জন্মদিন। এই দিনে আমার বাবা দেহত্যাগ করেন এবং এই কুড়ি তারিখ আমার বিবাহের দিন। জুলী হয়তো ইউ জী-কে একথা জানিয়েছেন—তাই ইউ জী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম আপনার নাকি আজ বিবাহবার্ষিকী! আমি বললাম, এই বুড়ো বয়সে আবার বিবাহবার্ষিকী! আমার প্রথম বিবাহবার্ষিকীতেই আমরা একসঙ্গে ছিলাম না। আর এখন সেইসবের কোনও গুরুত্ব নেই। তবে আজ রাতে ফোন করে লক্ষ্মীকে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে হবে। এবার ইউ জী একটু রসিকতা করে বললেন, আপনার এটা করা উচিত হয়নি। আপনি সংসারী মানুষ—এইরকম একটা দিনে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। তা নয় আপনি কতগুলো ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকের সঙ্গে জুয়াখেলার পীঠস্থানে মনের আনন্দে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছেন। আমি আর কী বলব। একটু হেসে বললাম, কপালের লিখন, কে করিবে খণ্ডন!

আমার কালো চুল ভর্তি মাথার তালুটা রোদ্দুরের প্রখর তেজে আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। সবার চোখে কালো চশমা। শুধু ইউ জী ছাড়া। আমি তাঁর কষ্টের একটু উপশম হবার কথা মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, একটা সানগ্লাস কিনব আপনার জন্য? ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার সেইসবের কোনও প্রয়োজন হয় না। আপনাদের মানসিক দৃঢ়তা এত কম যে আপনাদের যে যা বলে তাই শোনেন—আসলে চোখ জানে কত আলোতে কতটা খোলা থাকা দরকার। আমি ভাবলাম এই বুড়ো এক কঠিন জিনিস—রেব্যান বা ওকলি কোম্পানির ভাড়াটে চক্ষু বিশেষজ্ঞরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকত তাহলে নানারকম কেস হিস্ট্রি এবং তাঁদের গবেষণার স্ট্যাটিসটিক্স দিয়ে বুড়োকে হয়তো জব্দ করা যেত যে—রোদ্দুরে কালো চশমার কি অসাধারণ উপযোগিতা—কিন্তু আমার পক্ষে তাঁকে রাজী করানো

অসম্ভবের পরবর্তী স্তরে যাবার মতো ব্যাপার। ইউ জী-র কাছে একটাই প্রমাণ আর তা হল তাঁর নিজের চোখ। এই ৭৮ বছর বয়সেও তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন বাজপাখির মতো। ইউ জী-কে সহমত করানো তো দূরে কথা, আমি বরঞ্চ উল্টোটাই করলাম। তাঁকে সহানুভূতি দেখানোর খাতিরে আমার চশমার ওপর থেকে ঘন বাদামি রঙের অ্যাটাচমেন্টটা খুলে ফেললাম।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল শরীরটায় যেন কীরকম একটা ভিন্ন অনুভূতি হচ্ছে। ভাবলাম হয়তো রোদ্দুরের প্রখর তেজে শরীরের ত্বক চিড়বিড় করছে। রাস্তার ধারে রেলিঙে হাত লাগাতেই সাংঘাতিক শক খেলাম। স্থির তড়িতের এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সিজার প্যালেসে ঢুকতে গিয়ে দরজার হাতলে হাত দিতেই খেলাম আরেকটা শক, পুরো হাতটা ঝনঝন করে উঠল। মনে হল কনুইয়ের পাশে টোকা মারলে যেমন হাত ঝিমঝিম করে অনেকটা সেরকম। দরজাটা সামনে খুলতেই দেখি অন্য একটা জগত।

বিশাল ক্যাসিনো। শয়ে শয়ে স্লট মেশিন। দরজাটা পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরের পরিবেশের সঙ্গে আমার ইন্দ্রিয়গুলোর ভারসাম্য আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। ইউ জী অবশ্য বলেছিলেন, এসব এক হাঁড়ি ভাতের মতো, একটা টিপলে যে রকম অন্যগুলো কেমন তা জানা হয়ে যায়, ঠিক সেইরকম—ইফ ইউ সি ওয়ান ইউ হ্যাভ সিন দেম অল। আমার অবশ্য মনে হল এটা অনেক আলাদা। যদিও একই স্লট মেশিন। সেই দু'টো লুডোর ছক্কা বা পাশার ছক্কার মতো জিনিস টেবিলে ছুড়ে দেওয়া, ব্ল্যাক জ্যাক, বিশাল বোর্ড ঘুরিয়ে দিয়ে কোথায় এসে থামে তার জন্য অপেক্ষা করা—তবুও পরিবেশটা আলাদা। দু'পাশে সাজানো দোকান অতিক্রম করতেই এক অভিনব জায়গায় এসে হাজির হলাম। দেখলাম মাথার উপর নীল রঙের আকাশ—হালকা সাদা তুলোর মতো মেঘের টুকরোগুলো অলসভাবে... 'ফেরে ভেসে ভেসে..., নেই কোনও কাজে তাড়া'... মনে হল যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে জুলিয়াস সিজারের অধীনস্থ এক নগরী। শরৎকালে সেই নগরের এক রাস্তায় মেলা বসেছে, রাস্তার পাশের বাড়ির ছাদে ছাদে গ্রিক পুরুষের মূর্তি, তারা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে রাস্তার দৃশ্য। দোকান অবশ্য সেই নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্যাকস ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের মতো... আর ভেতরে দামী পোশাক—ইতালিয়ান ডিজাইনার জরজিও আরমানি বা ডনা ক্যারন। কোনও

কোনও দোকান খদ্দেরদের আকর্ষণ করার জন্য ম্যাজিক খেলার আয়োজন করেছে। খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে কোনও কোনও দোকানে। যে দোকানে ভালো কটনের বা সিল্কের জামাকাপড় পাওয়া যায়, সেইসব দোকানে ইউ জী ঢুকে অনেক সময় কাটান। আমার নজর একটা মজাদার স্টুডিওর ওপর পড়ল। আমি সেখানেই ঢুকলাম। আমার পেছনে পেছনে অন্য সবাইও সেখানে এসে হাজির হলেন।

এখানে তাৎক্ষণিক ছবি তুলে আপনাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু এর একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। দোকানের বাইরে অনেকগুলো জীবন্ত ছবি সাজানো আছে। কিছু ছেলেদের, কিছু মেয়েদের। ছেলেদের ছবিগুলো পেশীবহুল বিশাল বিশাল সুপুরুষ, যেন গ্রিক বীর, রোমান যোদ্ধা বা বর্তমান যুগের মনোরঞ্জনের কর্ণধারদের প্রতিমূর্তি। মেয়েদের ছবিগুলো আরও জীবন্ত—এক টুকরো কাপড় বুকে যেন ভুল করে পরানো হয়েছে। আর এক টুকরো কোমরের নিচে নিয়মরক্ষা করার জন্য; অপূর্ব সব দেহের গড়ন, মৃদু পেশী থেকে শুরু করে সেই রাজকন্যার মতো যার কুড়িটা তোশকের নিচে একটা কড়াইশুটির দানা থাকায় পিঠে অত্যাচারের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। সমস্ত ছবির সাধারণ বিশেষত্বটা হল—কোনও ছবিরই মুখ নেই। আপনার মুখের ছবি তুলে যে কোনও একটা আপনার পছন্দমতো দেহের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দেবে যে আপনার নিকটাত্মীয় পর্যন্ত ভুল করে বসবে। আমাদের মধ্যে একজন ইউ জী-কে রসিকতা করে বললেন, এই উগ্র সুন্দরীর দেহে আপনার মুখটা খুব মানাবে স্যার। ইউ জী নির্দ্বিধায় বললেন, আপনার যেখানে প্রাণ চায় সেখানে এই মুখটা বসিয়ে দিতে পারেন। তাহলে তুলব একটা আপনার ছবি? জিজ্ঞাসা করলেন বন্ধুটি। পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি, এইসবের যখন ছবি তোলেন—তাদের কি কখনও জিজ্ঞাসা করেন? ইউ জী বললেন। ভদ্রলোকের মুখটা ইউ জী-র প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ঘনীভূত হয়ে উঠল, হাসির মাঝেও চোখের কোনায় দেখা গেল দু'টো স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু।

নগরের চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছালাম। লোকজনের বেশ ভিড় হয়েছে এবং ক্রমাগত ভিড় বাড়ছে। মোড়ের মাথায় রাস্তার মধ্যেই একটা গোলাকার উঁচু বেদী, তার ওপর অনেকগুলো প্রস্তরমূর্তি। একটা মূর্তি সিংহাসনে বসা, হাতে রাজদণ্ড—হয়তো জুলিয়াস সিজার। রাস্তার ওপরেই জনসমক্ষে বিচার হবে কারও—রাজা

নিজে হাজির। ধীরে ধীরে চারদিকের আলো মৃদু হয়ে এল, মাথার উপর কৃত্রিম আকাশে আঁধার নেমে এল। প্রস্তর মূর্তিগুলোর ওপর হল অন্য তীব্র আলোর অভিসার। বিভিন্ন মূর্তির বিভিন্ন জায়গা থেকে সূক্ষ্ম রঙিন লেজারের তীব্র আলোর রেখা আকাশের বুকে উঠে গেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় স্থিরভাবে অপেক্ষা করছে—যে পথে আলো যাচ্ছে সেই পথের পুরোটাই রঙিন হয়ে আছে। হঠাৎ গগনভেদী আর্তনাদে বিচারের নাটক শুরু হয়ে গেল। প্রস্তর মূর্তিগুলো কথা বলছে আর অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করছে। রাজার চেয়ারটা অকস্মাৎ আধুনিক আমলাদের সুইডেল কেদারার মতো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। পাথরের মূর্তিগুলোর মধ্যে চলার ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেসবের ভেতর থেকে উৎসারিত লেজারের আলো সকলের সামনে উপস্থাপন করল অতি মনোরম রঙিন আলোর মেলা। বিস্ময়কর এই আলোর সুন্দর পরিবর্তনশীল নকশা দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্লট মেশিনের কয়েন কিনে ফেলেছে—কোনটা কোনদিন পয়া মেশিন সেসবও নাকি পাকা জুয়াড়িরা গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে। মারিও ততক্ষণে একটা সবুজ রঙের বিরাট বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে ব্ল্যাক জ্যাক খেলতে শুরু করেছেন। পকেট থেকে একটা ডলার দিয়ে কয়েকটা গুটি কিনে যিনি খেলা পরিচালনা করছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সাত। পরিচালক কয়েকটা তাস বেটে এখানে-ওখানে ছুড়ে দিলেন। আরও কিছু প্রক্রিয়ার পর দেখলাম মারিও খুব খুশি। জুলীও উত্তেজিত—এক মিনিটেরও কম সময়ে মারিও এক ডলারকে একশো ডলারে পরিণত করেছেন। এরপর যুত করে বসে সিংহবিক্রমে খেলা শুরু করে দিলেন। জুলী দৌড়ে গিয়ে ইউ জী-কে খবর দিলেন—মারিও একশো ডলার জিতেছে। ইউ জী বললেন, একশো ডলার আর কতক্ষণ টিকবে, এবার ঠিক হারবে। জুলী ফিরে এসে দেখেন মারিও পুনর্মুষিক ভবঃ। জুলীর মনটা উসখুশ করছে। তাঁর অনেক পয়সা। জুয়া খেলার মধ্যে একটা বন্য মাদকতা আছে। তাই সখ জাগছে। শেষ পর্যন্ত ইউ জী-কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি খেলব ক'টা হাত? ইউ জী বললেন, একটা শর্তে যদি আপনি রাজি থাকেন। জুলীর সঙ্গে ইউ জী-র শর্ত হয়ে গেল—যত ইচ্ছা আপনি জুয়া খেলুন আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি যত খুশি হেরে যান তাতেও আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু যখনই জিতবেন সঙ্গে সঙ্গে সেইটুকু আমার। জুলীর

হাবভাব দেখে মনে হল তাঁর মন বলছে, তোমার আনন্দে আমি যে উন্মাদ হই, কি করে হে নাথ সেকথা তোমারে জানাই! মহানন্দে জুলী সেই শর্তে রাজি হয়ে গেলেন, আর পরম উৎসাহে জলের মতো স্লট মেশিনে পয়সা ঢালতে লাগলেন। কচ্চিৎ-কদাচিৎ যখন কিছু ভাগ্যে জুটছে চিৎকার করতে করতে এসে ইউ জী-র হাতে দু' ডলার—চার ডলার ধরিয়ে দিচ্ছেন। আর ইউ জী উৎফুল্ল বালকের মতো ছোঁ মেরে জুলীর হাত থেকে পয়সা নিয়ে পকেটে রেখে দিচ্ছেন। এবার বুঝলাম কীভাবে ইউ জী সবসময় জেতেন। তিনি সবসময় বলেন, কাউকে জিততে হলে অনেককে হারতে হয়।

সিজার প্যালেস থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনে দেখি একটা আগ্নেয়গিরি। সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর গর্জন করে অগ্ন্যুদ্গার হচ্ছে। দূরে দেখলাম পিরামিড এবং তার পাশে স্ফিংক্স—মানুষ-সিংহের বিশাল মূর্তি। শুনলাম বালক রাজা টুটেনখামেনের কবর খুঁড়তে গিয়ে হাওয়ার্ড কার্টার তার নোট বইতে সমস্ত আর্টিফ্যাকট যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল তা লিখে রেখে যান এবং সেই আবিষ্কারের হুবহু নকল তৈরি করা হয়েছে—কিং টাট টুম্ব এন্ড মিউজিয়াম। আধুনিক কারিগরি চতুর্দিকে এমন নকল জগৎ তৈরি করেছে যে কয়েক ঘণ্টা থাকার পর মনটা যেন ইট-পাথরের মতো কৃত্রিমতায় ভরে যায়। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা মনে এমন একটা ভরবেগ সৃষ্টি করেছে যে সেই সর্বগ্রাসী মনের খোরাক জোগাতে মানুষকে অভিনব সব জিনিস ক্রমাগত উদ্ভাবন করতে হচ্ছে। লাস ভেগাসে এলে এইসবের প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাবে।

আমরা হোটেলে ফিরে এসেছি। মহেশ ভাট এবং তনুজা চন্দ্রা অনেকবার আমাদের খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে হতাশ হয়ে হলিডে ইনের লাগোয়া ক্যাসিনোর নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা রাস্তার ওপারে একটা ভালো খাবারের দোকান আবিষ্কার করেছেন। সেখানে গিয়ে খাওয়াদাওয়া হল। ইতিমধ্যে আমি সুযোগ বুঝে একটা ক্ষুদ্র পেস্ট এবং ব্রাশ কিনে ফেললাম। একটু বিশ্রাম করে এবার সবাই মিলে রাতের লাস ভেগাস দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

১২.

বিশাল বিশাল সব সাইনবোর্ড, নিয়নের চোখ-ঝলসানো আলো বিভিন্ন বিরতিতে জ্বলছে আর নিভছে—এর পরিণতি হল দূরের দর্শকের চোখে একটা চলমান দৃশ্য ভেসে ওঠা। মনে পড়ল কলকাতার দুর্গাপুজোর কথা। সেখানকার দৃশ্যাবলীর ভাবনাচিন্তাগুলো অবশ্য অনেক আলাদা ছিল। দেখলাম একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা নিয়নের টুপি পরা মানুষ, একহাতে মদের বোতল অন্য হাতে এক তরুণীকে ধরে ঝলমল করে দাঁড়িয়ে আছে; মদের বিজ্ঞাপন। একটু পরে দেখলাম এক আলোর যুবতী কাৎ হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। একটা পা সটান, আর অন্য পা'টা হাঁটু ভেঙে গোড়ালি উঁচু করে পায়ের আঙুল শুয়ে-থাকা পায়ের ওপর বুলিয়ে নিচ্ছে হাঁটু থেকে উরুর দিকে। তারপর সেই পা'টা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে অনেক উপরে। এক হাতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে একটা স্পোর্টস কার। একটা জায়গায় মাথার উপর দিয়ে নিয়নের দৃশ্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার এসে সেই জায়গায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

অলসভাবে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আর আলোর রোশনাই দেখতে দেখতে আমাদের অনেকটা সময় কেটে গেল। কারওরই আর জুয়া খেলায় বিশেষ আগ্রহ নেই। আমরা একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ঢুকলাম। সবাই কিছু কিছু রাত কাটানোর মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে ফেললেন। ফিরে এলাম। হোটেলের লাউঞ্জে বসে একটু আড্ডা মারা হল। কথায় কথায় জানা গেল কার কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে। সবাই মোটামুটি হেরেছেন। ইউ জী জিতেছেন—আর আমি নিরপেক্ষ—একবারও একটা মেশিনে হাত দেওয়া হয়নি। জুলী তখন আমাদের সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, গতবার যখন ইউ জী-র সঙ্গে লাস ভেগাসে এসেছিলেন তখন তাঁর এমন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে তা গল্পের থেকেও অদ্ভুত। আমার সে গল্প শোনার আগ্রহ দেখে সবাই চুপ করে বসলেন। জুলী মন্ত্রমুগ্ধের ভাব নিয়ে গল্প বলতে লাগলেন।

"আমরা ঠিক করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পাঁচশো ডলার জেতা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমানে জুয়া খেলব।" আমার মনে পড়ল দেশের কথা। সেখানে কালিপুজো বা শিবরাত্রিতে লোকে এইরকম দীর্ঘক্ষণ ধরে জুয়া খেলত। "আমাদের জেতার অর্থটা আপনারা আজকে অবশ্য জানতে পেরেছেন—তবুও আবার বলি। আমরা সবাই কয়েন কিনে যে যাঁর মতো নিজের নিজের কৌটো নিয়ে মেশিনের সামনে বসি। যখনই কেউ মেশিন থেকে কিছু ফেরত পান—তখন সেটা অন্য একটা কৌটোতে চলে যায়—আর সেটা ইউ জী-র জিত।" আমি ভাবলাম আমাদের জীবনে এরকম ব্যাপার সবসময় ঘটছে। যেমন ধরুন জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী— বেশিরভাগই ফলে না, আর যখন একটা দু'টো ফলে যায় লোকে সেইসব পুঁজি করে রাখে। মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় গিয়ে মানত করার ফলগুলো যদি সৎভাবে বিবেচনা করা যায়—তাহলে দেখা যাবে এটাও সেই ব্যাপার। আমার মানসপটে ভেসে উঠল কাতারে কাতারে লোকের মুখ—কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর, তিরুপতি, বৈষ্ণোদেবী—আরও কত শত জায়গায় চলেছে মানুষের মিছিল। "যে পয়সাটা ফেরত আসে না তার কোনও হিসেব নেই। যাই হোক আমরা সবাই মিলে পরম উৎসাহে জুয়া খেলে চলেছি। দেখতে দেখতে রাত দু'টো বেজে গেল। আমরা হিসেব করতে বসলাম। দেখলাম ঠিক ঠিক সাড়ে চারশো ডলার জেতা হয়েছে। ইউ জী আমাদের গুড নাইট বলে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন। এবং যাবার আগে আমাকে একমুঠো কয়েন দিয়ে বললেন, এই শেষ—এটা ফুরোলে ঘরে চলে যাবেন। আমি সেই কয়েনগুলো নিয়ে একটা মেশিনের সামনে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ খেললাম। শুধুই হারছি—ভাবলাম একটু ঘুরে আসি—অন্য একটা মেশিনে এসে বসলাম।"

"হেরে গেছি—শেষ কয়েনটার দিকে কিছুক্ষণ করুণভাবে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল ইউ জী-র মুখটা দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, পাঁচশো ডলার জিতে দেব—সে বুঝি আজ আর হল না। আমাদের পাপের বোঝা এতই বেশি যে আমাদের সংকল্প পর্যন্ত শক্তিহীন। ইউ জী-র ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, তিনি অন্য জগতের মানুষ—তাঁর এক অভিনব শক্তি—দেখি তাঁর শক্তি যদি আমার মধ্যে সঞ্চার করতে পারি। ইউ জী-কে স্মরণ করে স্লট মেশিনে কয়েন ঢুকিয়ে দিয়ে রুপোলি রঙের হাতলটায় তাঁর দেবদুর্লভ শক্তির উদ্রেক ঘটিয়ে দিলাম মহা টান।

জলতরঙ্গের মতো নানারকম ধ্বনি জাগাতে জাগাতে ধাতব চাকতিখানি দ্যূতক্রীড়ার আধুনিকতম যন্ত্রটির অতল গর্ভে হারিয়ে গেল। চোখের সামনে কতকগুলো সংখ্যা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে চলেছে। আমার মনে হল এই দৌড় যেন কোনওদিন বন্ধ না হয়, কারণ থেমে গেলেই যে আমার আশার ইতি ঘটবে। এইসব যন্ত্রশক্তি পদার্থবিদ্যার অমোঘ নিয়মে চলছে—আমার মনের কাকুতি-মিনতির হিসেব-নিকেশ এদের স্পর্শ করতে অক্ষম। যন্ত্র সময়মতো ধীরগতি হয়ে অবশেষে অচল হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত সমুদ্রগর্ভের স্তব্ধতা—শুধু আমার হৃদ্‌যন্ত্রের মহাধ্বনি আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। তারপর আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে রঙিন আলো আর বিচিত্র শব্দ করতে করতে শুরু হল কয়েন বর্ষণ। সেই ঝঙ্কার—যার প্রেম লাস ভেগাসের একমাত্র পুঁজি। আমি বাকরুদ্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাসে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। মনে হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার তীব্র চিৎকারে খানখান করে এই অস্বস্তির সমাপ্তি ঘোষণা করি। কিছুক্ষণ পর সব কয়েন তুলে গোনা শুরু করে দিলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিজের মাথার গণকযন্ত্রের ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। হে যিশু, হে মহম্মদ, হে বুদ্ধ, কেন আমার জীবনেই শুধু ঘটে চলেছে এই ঐশী শক্তির আশ্চর্য লীলা! আবার গুণলাম—একই ফল। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, একবার এসে সাক্ষ্য দিয়ে যা—আমাকে যে সবাই পাগল বলে! এ যে ঠিক ঠিক পঞ্চাশ ডলার, এক পয়সাও কমবেশি নয়! কি করে এইসব জিনিস মানুষের তৈরি জগতে এখনও সম্ভব হয়! আমি দ্রুতপায়ে সবাইকে জড়ো করে মিছিল করে ইউ জী-র কক্ষে এসে দরজায় কলিংবেল চেপে ধরলাম। ইউ জী একটু বাদে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শুধু ডানহাতের কবজি অবধি বাড়িয়ে আঙুল নাচাতে লাগলেন। আমি সেই পঞ্চাশ ডলার তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম। ফুরুৎ করে হাতটা আবার দরজার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আলো নিভে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল—কোনও ঘটনার কোনও রেশটুকু কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।... ক'টা ক্লান্ত পায়ের ঘরে ফেরার আওয়াজে সে রাত শেষ হয়ে গেল।"

ইউ জী ধৈর্য ধরে সব শুনলেন এবং অবশেষে বললেন, এই ভদ্রমহিলাকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। ওইসব দৈবশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করানোর জন্য নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বলবেন, মিরাকল! মিরাকল! জুলীর কথা ছাড়ুন—তিনি যেসব তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সেগুলোর সৃষ্টিকর্তারাও ভণ্ড। তাঁদের স্বনামধন্য

মনস্তত্ত্ববিদ, যাঁর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে মানুষের মনের রোগ সারানো হয় বলে জুলীদের গভীর বিশ্বাস—সেই ভদ্রলোক তাঁর তত্ত্ব সত্য প্রমাণ করার জন্য পেশেন্টদের কেস হিস্ট্রি নানাভাবে পরিবর্তিত করে উপস্থাপন করতেন। বিবিসি-তে আমি নিজে যেসব প্রোগ্রাম দেখেছি। জুলীর কাছে এইসব যুক্তির কোনও মূল্য নেই—তিনি মারিওকে প্রায় ঝাঁকুনি দিয়ে বারবার অনুনয়-বিনয় করে শুধু সত্যিই সেদিন মেশিন থেকে পঞ্চাশ ডলার এসেছিল কি না সেটা সবার সামনে বলতে বললেন। মারিও ইউ জী-র দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। জুলী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, বলুন আমি সত্যি বলছি কি না?' মারিও সম্মতির ইঙ্গিতে একবার মাথা দুলিয়ে চুপ করে রইলেন।

আমরা যে যার রুমে শুতে চলে গেলাম। বিছানায় শুয়ে টিভিটা চালিয়ে দিলাম, কিন্তু টিভি দেখতে ভালো লাগল না। পরিশ্রান্ত চোখ দু'টো খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল, টিভি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। বুকটা খুব ব্যথা করছে, অদ্ভুত একটা চাপ আর বুকের ভেতর থেকে থেকেই একটা অভিনব মোচড় অনুভব করলাম। ভালো করে কারণটা বোঝার চেষ্টা করতেই আঁতকে উঠলাম। দেখতে পেলাম আমার সামনে একটা খাটিয়ার ওপর সাদা কাপড়ে গলা অবধি ঢাকা একটা মৃতদেহ। ভালো করে নজর দিতেই দেখলাম ইউ জী-র প্রশান্ত মুখ, চোখ দু'টো মুদিত। একটা গভীর দুঃখের স্রোত বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। বুকের ভেতরের মোচড়টা এমনভাবে বেড়ে উঠল যে সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বুকের চাপটা অসহ্য হয়ে উঠল। অবশেষে একটা আর্তনাদ করে সমস্ত শরীরটা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমটা ভেঙে গেল... ভারসাম্য ফিরে এল। দেখি চোখের জলে বালিশটা ভিজে গেছে। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম—চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চোখদু'টো জবা ফুলের মতো রক্তাভ, যেন পিঁপড়ে কামড়েছে। চটপট পোশাক পালটে তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

পাঁচটা বেজেছে। আমার প্রায় উলটো দিকেই ইউ জী-র রুম। তাঁর দরজায় এসে মৃদু টোকা দিলাম। কয়েকটা অসহ্য মুহূর্তের পরে ভেতরে কিছু শব্দ শোনা গেল। আরও কয়েক মুহূর্ত পরে খুব ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। ইউ জী আমায় একদম সরাসরি বললেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি ভালো আছি।

সবাইকে বলে দেবেন, সাড়ে পাঁচটায় লাউঞ্জে আবার দেখা হবে। আমাকে বুদ্ধি-বিবেচনার চরম সীমায় দাঁড় করিয়ে রেখে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি ঘরের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিলেন। কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। জুলীর গলার স্বরে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ইউ জী দরজা খুলছেন না নাকি? আমি বললাম, না, না, আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটায় লাউঞ্জে আসবেন।

আমরা লাস ভেগাস থেকে ফেরার জন্য তৈরি হয়ে যে যার রুমের চাবি লাউঞ্জে ফেরত দিয়ে দিলাম। এবার মারিও জুলীর গাড়ি চালাবেন। ইউ জী বসবেন তাঁর পাশে এবং পিছনের সিটে মহেশ ভাট এবং তনুজা চন্দ্রা। ডাগলাসের ইনফিনিটিতে সামনের সিটে তাঁর পত্নী অলিভিয়া এবং পেছনে ল্যারি মরিস, আমি এবং জুলী। ল্যারি মরিস আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি নিজে কবিতা লেখেন—তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হল তাঁর একেকটি শব্দই তাঁর কবিতার একেকটি লাইন। একটা কবিতায় তিনি ইউ জী-কে সম্বোধন করেছেন "Cosmic Naxalites" বলে। ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট করে প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তারপর আধ্যাত্মিকতার টানে দার্শনিক-সাহিত্যিক নারায়ণ মূর্তির সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন নির্বাণলাভের আশায়। ধীরে ধীরে শুরু হয় কবিতা লেখা এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া। দেশে ফিরে এসে এক গির্জার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িত হন এবং কিছুদিনের মধ্যে নিজেই একটা চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি সেই চার্চের মিনিস্টার। যখনই সময় পান চলে আসেন ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটাতে। তার এক বান্ধবী আছে সুজান। শনি-রবি যদি ল্যারি তার গির্জায় অনুপস্থিত থাকেন—তখন সুজান তার পুরোটাই দেখাশুনা করেন। ইউ জী-র ব্যাপারে ল্যারির মতামত মোটামুটি এরকম যে—ইউ জী-কে জানতে হলে যেটা চাই সেটা হল ভক্তি এবং ভালোবাসা। আমাকে এবার ল্যারি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করছেন—তা আপনার সঙ্গে এইসব ভবঘুরে আধপাগলা লোকেদের আলাপ হল কি করে? আমি বললাম, সে এক লম্বা কাহিনি। এর কোনও সংক্ষিপ্ত উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে? আমি বললাম, ভালো যদি না-ই লাগত তাহলে এতদিন এই রকম আনন্দ ফূর্তি করে কাটানো কি সম্ভব হতো?

এই গাড়িতে ইউ জী নেই। ডাগলাস তার স্ত্রীর সঙ্গে গানবাজনা এবং এ ব্যাপারে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক রকম আলোচনা করলেন। জুলীর মেয়ে যেহেতু গানের লাইনে আছে, সেহেতু জুলীর কাছ থেকে অনেক পরামর্শ নিলেন। অলিভিয়া গান গায়, রেকর্ড বার করার জন্য প্রডিউসার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বাজারে সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—মনোরঞ্জনের ব্যবসায় যেহেতু অনেক পয়সা—সেজন্য লোকেদের অসম্ভব প্রচেষ্টা—আর যাঁদের হাতে এসবের চাবিকাঠি তাঁরাও যতটা সম্ভব তাঁদের শক্তি জাহির করেন। ডাগলাস হঠাৎ করে খুব ধনী হয়ে গিয়েছিলেন। ধনসম্পদের উপস্থিতি বাড়ির সকলের জীবনযাত্রাকে অতি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়। আয়ের কোনও স্থিরতা ছিল না—কিন্তু উচ্চমানের জীবনযাত্রা যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাকে লাগাম দেওয়া—মানুষের নেশা ত্যাগ করার মতোই কষ্টকর। পুঁজি কমতে থাকে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায়। এখন বড়লোক থেকে অদূর ভবিষ্যতে গরীব হয়ে যেতে পারেন এরকম দুশ্চিন্তা ডাগলাস এবং তাঁর স্ত্রী অলিভিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। ডাগলাসের কাছে যেটা সবচেয়ে অস্বস্তিকর সেটা হল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সামনে অভাবের সংসারে বাস করার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা। পৃথিবীতে যে ভাবনাটাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন সেটা হল—যারা একদিন তাঁর অর্থনৈতিক মাপকাঠির সীমানায় আসার যোগ্য ছিল না, তারা একদিন তাঁর অর্থাভাব দেখে সহানুভূতি জানাবে! মনে পড়ল কাজী নজরুল ইসলামের গানটা... চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়...। আমার ভেতরটা ঘন ঘন শুকিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই এক গভীর মহানিদ্রা আমার দেহ থেকে আমাকে মুহূর্তে বিলোপ করে দিচ্ছে। একটু জল খেয়ে চোখ বুজতে বুজতে ভাবলাম, লাস ভেগাসে গত চব্বিশ ঘণ্টায় সেসব ঘটনা ঘটল তা হয়তো আমার জীবনের এক অমূল্য রতন। আমাদের মনের অস্তিত্ব কি শুধুই এক স্মৃতিসম্ভার!

১৩.

আজ ওকোটিলো লজে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির অতিথি হয়ে আসছেন পার্বতী কুমার নামে এক জ্যোতিষী। তিনি হায়দরাবাদের লোক, বাঙ্গালোরে ইউ জী-র দুই প্রিয়তম বন্ধুর একজন হলেন চন্দ্রশেখর আর একজন মেজর দক্ষিণামূর্তি। মেজর দক্ষিণামূর্তি তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে ইউ জী-র ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছেন। এই ভক্ত সম্প্রদায়ের আড্ডার শিরোমণি হলেন মাদ্রাজের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মাল্লাদী কৃষ্ণমূর্তি। ভক্ত ধনীলোকের বাড়িতে সাধারণত সাধুসন্ত, জ্যোতিষীদের আনাগোনা থাকে। ইউ জী-র সঙ্গে এই পার্বতী কুমারের আলাপ হয় মাল্লাদী কৃষ্ণমূর্তির বাড়িতে। ইনি মাল্লাদী কৃষ্ণমূর্তির ব্যক্তিগত জ্যোতিষ উপদেষ্টা। বর্তমানে পার্বতী কুমারের অনেক খদ্দের—এই যজমানদের কেউ কেউ আবার ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও বসবাস করেন। তিনি সামান্য ভরণপোষণের খরচার বিনিময়ে এই যজমানদের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরামর্শ দেন। তাছাড়া জন্মলগ্নে গ্রহদের অমঙ্গল ফলদায়ক ঘরে থাকার কিছু কিছু মুশকিল আসান করার বিরল কায়দাকানুন তার করায়ত্ত আছে বলে যজমানদের ধারণা। এই ধারণার ফলে পাবর্তী কুমারের যজমান সম্প্রদায় তাঁকে গুরুর মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। পেশায় ছিলেন অ্যাকাউনটেন্ট, এখন অবসরপ্রাপ্ত। কথাবার্তায় বোঝা গেল বর্তমানে তাঁর ব্যস্ততা কর্মজীবনের থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া যজমানদের ব্যাকুলতায় তাঁকে অনেকবার সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে। তাঁদের মঙ্গলময় জীবনই তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এইরকম একজনের টানেই হয়তো আজ তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে। লস এঞ্জেলেসের কাছে বসবাসকারী দু'টো পরিবার, ইউরোপ থেকে দু'জন ভদ্রলোক এবং দু'জন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পার্বতী কুমার আসছেন মধ্যাহ্নভোজন করতে।

অতিথিদের জন্য ইউ জী নিজে এঞ্জেল হেয়ার (এক ধরনের সেমাই) রান্না করছেন। জুলীকে বলেছিলেন রান্না করতে, জুলী শুরু করে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে না পারায় নিজেই রান্নার কাজের মুখ্য

দায়িত্বটা নিয়ে নিয়েছেন। আমাকে লজের বাইরের গেটে অপেক্ষা করতে বললেন, যেন অতিথিদের ইউ জী-কে খুঁজে বার করতে অসুবিধা না হয়। মার্কিন মুলুকের এই জায়গায় এই ধরনের লজে ভারতীয় লোকজন খুব একটা দেখা যায় না, তাই পরস্পরকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হল না। দলটাকে দেখেই বোঝা গেল কে পার্বতী কুমার। তাঁর মুখে একটা মিষ্টি হাসি সবসময় লেগে আছে। আমি গিয়ে তাঁকে ভারতীয় কায়দায় অভিবাদন জানালাম। আমার নামটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন নামের মানেটা আমার জানা আছে কি না। তারপর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন এটা ছিল অর্জুনের আরেকটা নাম। তারপর জুলীর ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমায় নানারকম প্রশ্ন করলেন এবং অবশেষে বললেন, ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির মতো অবতার পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকা অফুরন্ত প্রারব্ধ কর্মফল ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। মনে মনে ভাবলাম, ইউ জী-র গালাগাল এবং তথাকথিত পবিত্র জিনিসের বা ধর্মীয় সংস্কারজনিত ভাবনার ওপর তাঁর অকথ্য প্রাঞ্জল বিবরণের দিকটা হয়তো পার্বতী কুমারের এখনও অগোচরেই আছে।

অতিথিরাও বিভিন্ন রকমের দক্ষিণ ভারতীয় খাবার তৈরি করে এনেছেন। খুব খাওয়াদাওয়া হল। তারপর পার্বতী কুমারের সঙ্গীসাথীরা অনেক ছবি তুললেন। বিশেষ করে ইউ জী-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই ঘটনাটা যেন অমর হয়ে থাকে এই রকম একটা প্রচেষ্টা। এইদিকে জুলীও তার ভিডিও ক্যামেরায় এইসব মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার প্রয়াস জারি রাখলেন। ইউ জী যথারীতি তাঁর হাতটা পার্বতী কুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আমার হাতের রেখা এত ঘন ঘন বদলায় কেন? অর্থাৎ যে হাতটা আপনি এর আগে মাদ্রাজে দেখেছিলেন, এটা সে হাত নয়। একদম বদলে গেছে, ভালো করে দেখুন আবার। পার্বতী কুমারের উপস্থিত বুদ্ধিটা দেখলাম সবদিক বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভালোভাবেই তৈরি। বললেন, এইরকম একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের হাত দেখে কিছু বলা খুবই কঠিন কাজ। সাধারণ লোকেরা এইসব ব্যক্তিত্বের অগাধ গভীরতার কোনও আভাসই কোনওদিন পেতে সক্ষম হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এই ধরনের লোকেদের জীবনযাপন গ্রহ-সমন্বয়ের প্রভাবে চলে কি না সেই ব্যাপারেও আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে অনেক আলোচনা আছে—এইসব লোকেরা তাঁদের কর্মধারাকে গ্রহ ফলের উপরে নিয়ে পরিচালনা করতে পারেন। সৃষ্টির আদি শক্তির সঙ্গে

একাত্ম প্রাণকে এইসব নিয়ে কখনও ভাবনাচিন্তা করতে হয় না। ইউ জী-কে এইসব ফাঁকা আওয়াজ কোনওরকম বিচলিত করে না। উলটে প্রশ্ন করলেন, তা সেইসব বুঝি কীভাবে, টাকাপয়সা তো কিছুই চোখে পড়ছে না। পার্বতী কুমার বললেন, কোনও এক বিদেশিনী আপনাকে অগাধ সম্পদ দান করবেন। খাওয়াদাওয়া সেদিন অবশ্য জুলীর ঘরেই হয়েছিল। ইউ জী বললেন, আমাকে হয়তো এবার চীন দেশেই যেতে হবে। কারণ শুনেছি সেখানে নাকি এক মিলিয়ন (দশ লাখ) মিলিয়নেয়ার আছেন। তাও আবার ডলারে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহিলা। ইউরোপ আমেরিকার লোকজন আমাকে কোনওদিন কিছু দেবে বলে মনে হয় না।

ইউ জী একবার তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তামিলনাড়ুর এক স্বনামধন্য জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন—গল্প বলা শুরু করলেন পার্বতী কুমার। সেই জ্যোতিষী সাধারণত একটা বই খুলে জাতকের সম্পর্কে পড়া শুরু করেন। প্রাচীনকালে কোনও এক ঋষি দিব্যদৃষ্টির সহযোগে সেই বই লিখে গেছেন। বইটা এমন ভাষায় লেখা, যা শুধু সেই জ্যোতিষীই পড়তে পারেন। বর্তমান জ্যোতিষী এই বই পড়া শিখেছেন তাঁর বাবার কাছে; তাঁর বাবা শিখেছেন পিতামহের কাছে এবং এইভাবেই আদি লেখক সেই ঋষি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য এই বিদ্যা রেখে গেছেন। জ্যোতিষবিদ্যাই হল তাঁর বংশপরম্পরায় পারিবারিক বৃত্তি। বইটা এমনভাবে লেখা যেন দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ 'লর্ড শিবা' তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে জাতক সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। সেদিন ইউ জী-র ভাগ্যে যে লেখাটা উঠেছিল—সেটা পড়ে জ্যোতিষী নিজেই চমকে গিয়েছিলেন। শিবঠাকুর তাঁর প্রিয়তমাকে বলে চলেছেন, আজ এখানে এমন একজন লোক আসবেন যাঁকে আমি নিজে হাত ধরে পর্বতশিখরে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তাঁর সামনে খুলে দিয়েছিলাম সেই দিব্যজ্ঞানের ভাণ্ডার, যা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পাগলের মতো সন্ধান করে চলেছে। এইরকম এক মহাপুণ্যবান লোকের পক্ষে এখানে এসে ভাগ্যের কথা জানতে চাওয়া অত্যন্ত চপলতার কর্ম। ইউ জী বললেন, এইসব কি কোনওদিন প্রমাণ করা যায়—যেমন ধরুন আপনার সুইস ব্যাংকে অনেক টাকা আছে সেটা প্রমাণ করা যাবে, কিন্তু আমার ব্যাপারটা একেবারেই কুহেলিকাময়। পার্বতী কুমারও যথারীতি বললেন, ভবিষ্যৎ একদিন সেই প্রমাণ দেবে। ইউ জী বললেন, ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে আমার ভেতর কখনও কোনওরকম

চিন্তা জাগে না। বর্তমানে আমার পকেটে কত আছে সেটাই আমার মাপকাঠি। পার্বতী কুমার এবার যেন দৈববাণী শোনাচ্ছেন এমন ভাব করে বললেন, 'যাঁরা অমর হওয়ার জন্য প্রাণপণে কাজ করে চলেছেন, সময় তাঁদের ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, অথচ যাঁদের এইসব ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, মানুষ তাঁদের অমর করে রাখে।'

পার্বতী কুমার তাঁর শিষ্যদের অনেকরকমভাবে একটা কথা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তাঁদের জীবনে আজকের দিনটার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই দিনটার কথা যেন তাঁরা কোনওদিন ভুলে না যান। ভবিষ্যতে যখন ইউ জী-র সম্পর্কে গুণীমানী লোকেদের লেখা বই পড়বেন—তখন হয়তো আজকের দিনটার কথা ভীষণভাবে মনে পড়বে। এরপর মহেশ ভাটকে দেখিয়ে বললেন, এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন আমাদের সামনে নানারকম রসিকতা করছেন—ইনি ভারতবর্ষের স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক। প্রতিদিন তাঁর বাড়ির সামনে প্রতিভার নমুনা দেওয়ার জন্য উঠতি অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং পরিচালকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক ইউ জী-র জীবনচরিত, বায়োগ্রাফি লিখেছেন। পেঙ্গুইন সেই পুস্তক পাবলিশ করেছে। এটা অনেক মাস ধরে ভারতে বেস্ট সেলার ছিল। ইউ জী সবসময় মহেশ ভাটকে বলেন, আপনি ভাবেন যে আপনি আমাকে ভালো করে জানেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না। পার্বতী কুমারের মন্তব্য হল, এই পৃথিবীতে ইউ জী-কে বোঝার মতো লোক খুবই বিরল।

আজ ইউ জী-র অতিথি পার্বতী কুমার। তাই অতিথি এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সম্মান দেখাবার জন্যই হয়তো ইউ জী পার্বতী কুমারের মন্তব্যের ওপর কোনও মন্তব্য করলেন না। সাধারণত এই ধরনের কথাবার্তা বলার পশ্চাতে-যে বক্তার অহং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস অজান্তে করে ফেলে, সেটাকে প্রকাশ্য করার জন্যই ইউ জী সবসময় এইসব মন্তব্যকে অসম্ভব দৃঢ়তায় আঘাত করেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য মানুষ, তাঁর কোমল ব্যবহার—সমস্ত অতিথির হৃদয় আনন্দে ভরে দিয়েছে। পার্বতী কুমার এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর মধুর উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করল যে এক আদর্শ অতিথিপরায়ণতার দায়িত্ব কেমনভাবে পালন করতে হয় তা ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি খুব ভালো করে জানেন।

এইবার বিদায়ের পালা। আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের পার্কিং লটের দিকে এগোলাম। পার্বতী কুমার আমাকে অনেক কিছু বললেন—আমার সব্যসাচী নামটা অনেকবার উচ্চারণ করলেন। অবশেষে গাড়িতে ওঠার আগে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাঁর রথের সারথি পরমেশ্বর নিজে, তাঁর জীবনযুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত'।

আমাদের মন যখনই কোনও জিনিসকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, তখনই অতীত তাৎপর্যের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক দেখার প্রয়াস করে। যে অতীত বহুবার আমাদের সামনে মহান বলে চিহ্নিত হয়েছে, তা আমাদের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা এবং নিও কর্টেক্সের মধ্যে একটা জোরালো যোগাযোগ স্থাপন করে—আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় একটা গভীর অনুভূতি। অনুভূতি একটা বিশেষ অবস্থা এবং হিপ্পোক্যাম্পাসে এই অবস্থার একটা বিশেষ নকশা তৈরি হয়ে যায়। বর্তমানে যখন কোনও ঘটনা মহান বলে মনে হয় তখন ওইসব পুরনো নকশার প্রয়োগ না করলে অনুভূতি জোরদার হয় না। যদি কোনও ঘটনা সত্যিই গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে তখন তাকে প্রকাশ করার সোজা রাস্তা হল পুরনোর সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেওয়া। গভীরভাবে বিচার করার জন্য প্রচুর মনোযোগ, সাহস, বিবেক এবং উঁচুমানের চালিকাশক্তির প্রয়োজন—বেশিরভাগ লোকের মধ্যে এইসবের একটাও দেখা যায় না। ফলে যখন সত্যিই নতুন কিছুর আগমন ঘটে তখন তার উপযোগিতা অত্যন্ত সীমিতসংখ্যক লোকজনের কাছেই ধরা পড়ে। পার্বতী কুমারের গাড়ি ধীরে ধীরে চোখের সামনেই দিগন্তে মিলিয়ে গেল। জানি না তাঁর সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে কি না।

ইউ জী-কে দক্ষিণ ভারতীয় রান্নার খাবার খেতে হয়েছে। সেদিন পার্বতী কুমারের শিষ্যদের ভক্তিভরা নৈবেদ্যে ছিল রীতিমতো তেল-ঝাল-মশলার উপযোগে তৈরি ঘরোয়া খাবার; ইউ জী সেইসব প্রত্যাখ্যান করেননি। আমি জানি এই জাতীয় খাদ্যে তাঁর খুবই কষ্ট হয়। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন খেতে গেলেন অত ঝাল দেওয়া খাবার; ইউ জী আমার দিকে কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, আপনি সেইসব বুঝবেন না, আমি অসহায়। মনে পড়ল প্রথম প্রথম ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি কী

করেছিলাম। ইউ জী-র প্রিয় খাদ্য মুগডালের প্যানকেক। যাকে তেলুগু ভাষায় বলে পেসারাট্টু। আমার স্ত্রী লক্ষ্মী তৈরি করে আমার হাতে করে নিউইয়র্কে পাঠায় সঙ্গে অবশ্য টম্যাটোর চাটনিও ছিল। আমি ইউ জী-কে খাওয়ানোর পর তাঁর হাবভাব দেখে ভেবেছিলাম চাটনিতে খুব কম ঝাল ছিল। শত হলেও অন্ধ্রপ্রদেশের লোক তো। পরের দিন লক্ষ্মীকে বলে ঝাল চাটনি বানিয়ে ইউ জী-কে দিয়েছিলাম। মনে পড়তেই আমার বুকে একটা ধাক্কা লাগল, আমাকেও সেদিন তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। আমার আনন্দের আতিশয্যের কারণে তিনি নিজের কষ্টের কথা ভেবে আমার অনুরোধকে অবহেলা করতে পারেননি। পরে জানি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। এইসব ভাবতে ভাবতে আমার বুকের ব্যথাটা যেন একটা বৃত্তাকার বস্তুতে পরিণত হল এবং শ্বাসনালীর কাছাকাছি এসে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আমি মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ইউ জী-র পাশাপাশি চলতে চলতে আবার জুলীর ঘরের কাছাকাছি এসে হাজির হলাম।

আমি আর ইউ জী শুধুমাত্র দু'জন বর্তমানে জুলীর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম, যে আধ্যাত্মিক সংস্থার সাথে এতদিন জড়িত ছিলাম অর্থাৎ শ্রী রামচন্দ্র মিশন—তার অনেক শিক্ষিত, আধুনিক সভ্যরা এইকথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে মিশনের বর্তমান সভাপতি শ্রী পার্থসারথী রাজাগোপালাচারী তাঁদের অনেকের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার নিজস্ব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও পেয়েছেন। ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং পরিষ্কারভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জীবনে কি এইরকম কোনও গভীর পরীক্ষামূলক উপলব্ধি হয়েছে, যেটা স্মরণ করে আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন যে আপনার বন্ধুদের মতো আপনিও একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন? আমি একটু ভেবে দেখলাম, এইরকম কোনও ঘটনাই আমার ব্যক্তিগত জীবনে ঘটেনি যার জন্য মিশনের সভাপতিকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে অভিহিত করতে পারি। ইউ জী-র প্রশ্নের উত্তর পেলাম, 'না'। চোখে চোখে রেখে বললাম, না, সেইরকম কিছু দেখিনি। ইউ জী ঘরের ভেতরে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন কিছু একটা হাতে নিয়ে। আমরা দু'জনে আবার হাঁটছি। জানি না কোথা থেকে আমার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ সব অদ্ভুত পরস্পরসম্পর্কহীন স্মৃতির কথা এসে হাজির হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী-কে কিছু না কিছু একটা প্রশ্ন করে বসি। এইরকমভাবেই হঠাৎ করে ইউ জী-কে

জিজ্ঞাসা করলাম আমার এক বন্ধুর কথা, যাঁর মামা ইউ জী-কে খুব ভালো করে চেনেন। এবং বন্ধুটি সুযোগ পেলেই রমণাশ্রমে যাতায়াত করেন। ইউ জী কোনও কথাই বলছেন না। আমিই বকবক করে চলেছি। আমরা প্রায় পুরো লজটা একবার পরিক্রমা করে ফেলেছি। আবার জুলীর ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। আমি বললাম, শুনেছি রমণ মহর্ষি কোনও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। কিন্তু পূজ্জাজী (অনেকে আবার বলে পাপাজী) বলে একজন ভদ্রলোক নাকি দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে তিনি তিরুভান্নামালাইয়ের অরুণাচলশিব রমণ মহর্ষির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। ইউ জী তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার চোখের দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করে অসম্ভব গুরুত্বের সঙ্গে বললেন, আমার চোখে চোখ রেখে বলুন তো আরেকবার, আপনি কী বললেন। আমি যেকোনওরকম ব্যবহারই ইউ জী-র কাছ থেকে আশা করতে পারি, তাঁর এমন কোনও কথা বা ব্যবহার নেই যা বর্তমানে আমাকে খুব আশ্চর্য করতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যা বোঝার চেষ্টা করছি, যা বুঝতে পারছি বলে মনে করছি তা কিছুতেই ঠিকমতো মাথায় ঢুকছে না—অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে! ইউ জী-র জীবনে এই রমণ মহর্ষির কী ভূমিকা থাকতে পারে, কেন তিনি সেই মহর্ষির আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি হতে পারে এমন একজনের কথা তীব্রভাবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন? ভাবতে ভাবতে আমি নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

ইউ জী-র তখন হয়তো চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্র। ভারতবর্ষের ধর্মপরম্পরার ওপর অসাধারণ বিরক্তি—দর্শন পড়তে এসে মনে হচ্ছে কোথায় যেন সবটাই ধোঁকাবাজি। এমন সময় ইউ জী-র এক বিশেষ ব্রাহ্মণ বন্ধু জুটল। বন্ধুটির সরলতা, ধর্মীয় ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ ইউ জী-র ক্ষুধার্ত মনকে একটু সান্ত্বনা দিত। একদিন কথায় কথায় সেই বন্ধু বললেন, তিরুভান্নামালাইতে এক মহর্ষি থাকেন। সবাই তাঁকে অরুণাচলের শিব বলেন। নাম রমণ মহর্ষি, একদম খাঁটি জিনিস। আমি সেখানে একটা অদ্ভুত শান্তি পাই। সত্যি কথা বলতে কি সনাতন হিন্দুধর্মের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন এই রমণ মহর্ষি। হিন্দু ধর্মের প্রতিশ্রুতি যে কতটা সত্য তা এই মহর্ষিকে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। বন্ধুটি মাঝে মাঝেই ইউ জী-কে বলতেন চল আমরা দু'জনে মহর্ষিকে একবার দর্শন করে আসি। অনেক আলোচনা তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, একদিন দু'জনে মিলেই রমণ মহর্ষির আশ্রমে তাঁকে দর্শন করতে যাবেন। বন্ধুটি রমণ

মহর্ষির অসাধারণ প্রভাবের অনেক গল্প ইউ জী-কে শোনালেন। ততদিনে পল ব্রান্টনের লেখা বই *'এ সার্চ ইন সেক্রেড ইন্ডিয়া'* বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইউ জী বইটা কিনে রমণ মহর্ষি সম্বন্ধে লেখা অধ্যায়টি খুব ভালো করে পড়লেন। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে এবং বই পড়ে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে মহর্ষির সামনে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আস্তে আস্তে সব চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যায়। ইউ জী অবশ্য এইসব একদম মেনে নিতে চান না—নিজের পরীক্ষার ফলেই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। যাই হোক, তাঁরা দু'জনে অরুণাচলে রমণ মহর্ষির আশ্রমে এসে হাজির হলেন। দু'জনেই মহর্ষির স্তব্ধ ঘরে তাঁর সামনাসামনি এসে বসলেন।

রমণ মহর্ষির ঘরে যদিও লোকজন আছে, কিন্তু কোনওরকম আওয়াজ নেই। যখন কখনও কেউ কোনও প্রশ্ন করেন, তখন মহর্ষি তার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। ইউ জী ভালো করে চারদিকের পরিবেশ দেখলেন। তারপর অর্ন্তমুখী হয়ে নিচের ভেতরে কোনও রকম পরিবর্তনের আভাস পাবার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ— কোনও ইঙ্গিত বা আভাস খুঁজে পেলেন না। মনে মনে ভাবলেন, লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কৌপিন পরা এই বৃদ্ধ মানুষটি বসে বসে সবজি কুটছেন, এরপর রান্না করবেন, খাবেন আর সবাই বসে বসে নিঃশব্দে তাঁকে দেখবেন—এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক কীভাবে আমাকে সাহায্য করবেন? ইউ জী আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারলেন না। সোজাসুজি রমণ মহর্ষিকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ঈশ্বর উপলব্ধির কোনও স্তর আছে কি? প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই রমণ মহর্ষি উত্তর দিলেন, না, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোনও স্তর নেই। হয় তুমি উপলব্ধি করেছ, নয় তো কিছুই হয়নি। আবার চারদিক নিঃস্তব্ধ। শুধু লোকজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইউ জী আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। সবাই বলে মহর্ষির আশ্রম এক অবিশ্বাস্য শান্তিময় বাতাবরণ, এই পরিবেশে নাকি মন চিন্তামুক্ত হয়। কিন্তু ইউ জী নিজের মধ্যে সেই সবের কোনও লক্ষণ দেখতে পেলেন না। ইউ জী আবার প্রশ্ন করলেন, আমি জানি না আপনার মধ্যে কী আছে, কিন্তু যদি বিশেষ কিছু থেকে থাকে তাহলে কি তা আপনার পক্ষে আমাকে দেওয়া সম্ভব? এবার মহর্ষি ইউ জী-র দিকে ঘুরে সরাসরি তাঁর চোখে চোখ রাখলেন। কয়েক মুহূর্তে আশপাশের লোকজন, সমস্ত ঘর, মন্দির, পাহাড় সেই স্তব্ধতার গর্ভে লীন হয়ে গেল। মহর্ষি তাঁর চোখে করুণার উদ্রেক করে বললেন, আমি হয়তো দিতে পারি কিন্তু আপনি কি সেসব গ্রহণ করতে পারবেন? ইউ জী-র ভেতরটা সেদিন অসাধারণভাবে দৃঢ়

হয়ে গিয়েছিল। মুখে যদিও কিছু বলেননি, শুধু মহর্ষির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভেবেছিলেন, এই পৃথিবীতে যদি একজনও সেই জিনিস গ্রহণের যোগ্য হয়, তাহলে সেই জন শুধু আমি।

সেই এক সাক্ষাৎ। সারা জীবনে আর একবারও রমণ মহর্ষির সঙ্গে ইউ জী-র কোনও যোগাযোগ ঘটেনি। অথচ আজ কেন তিনি আমায় অন্য কিছু বলার চেষ্টা করলেন। ইউ জী কোনওদিন সোজাসুজি কিছু বলবেন না, বিশেষ করে এই ধরনের ব্যাপারে। সবসময় তিনি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমরা যা শুনছি, বা তাঁর ব্যবহার, হাবভাব, কথোপকথন থেকে যা বুঝছি বলে মনে করছি সেইসব নাকি প্রায়শই আমাদেরই তৈরি করা জিনিস। এইসব যেমন তাঁকে আর কোনওদিন জিজ্ঞাসা করা যাবে না—তেমনি এইসব অন্য কাউকে বলেও কিছু বোঝানো যাবে না। আমার শুধু এটুকুই মনে হয়েছিল যে, ইউ জী রমণ মহর্ষির আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেননি এবং পূজ্যাজী ওরফে পাপাজী যে মোটেই রমণ মহর্ষির আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি নন সেটাও যেন না বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

১৪.

আগামীকাল সবাই যে যাঁর গন্তব্যে ফিরে যাবেন। আমার কেন জানি না কিছুতেই আর ফিরে যেতে মন চাইছে না। সেই লাস ভেগাসে ভোররাতে বুকের ভেতর যে অস্বস্তিকর মোচড়টা শুরু হয়েছিল তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এখন মনে হচ্ছে যেন শ্বাসপ্রশ্বাসেও কষ্ট হচ্ছে। একটা কিছু ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত চাপের সৃষ্টি করছে। গতকাল রাত্রে বারবার মনে হয়েছে, আমি এতদিনে ঠিক ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। যা ছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, তার বিকাশ অবশেষে আমি নিঃসন্দেহে অনুভব করছি। এমন একজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছি, যাঁর জীবন মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের এক অভূতপূর্ব প্রতিফলন। একটা গভীর আনন্দ আমার সমস্ত কোষে কোষে খেলে বেড়াচ্ছে—পুলকে মনে হচ্ছে অস্থির হয়ে যাব। এই অসাধারণ অনুভূতিই কি সচ্চিদানন্দের শেষভাগ—কে জানে? ওকোটিলো লজ থেকে বারমুদা লজের মাঝে একটা অন্ধকার মরুভূমি। মনে হয়েছিল জামাকাপড় খুলে মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ফিরি। আমার এমন একটা সামাজিক পরিচিতি যে এসব লিখতেও দ্বিধাগ্রস্ত লাগে, কিন্তু এটাই সত্য। এটাই এখন আমার মনের প্রকৃত অবস্থা। আজ রাতেই সব গুছিয়ে হোটেলের ভাড়া চুকিয়ে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। কাল ভোর পাঁচটায় ইউ জী-র ঘরে আমি একলা যাব। তারপর সবাই মিলে লস এঞ্জেলেসে যাব।

রাতে ঘুম আসছে না। ভাবছি কে এই ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, কীভাবে মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে আমার জাগ্রত চেতনার পরম গতিবিধির ওপর এমন একটা অস্বাভাবিক অধিকার জন্মিয়ে ফেললেন। মনে পড়ছে মাত্র সাত মাস আগে আমার সঙ্গে ইউ জী-র প্রথম দেখা হয় এবং তার ঠিক তিন মাস আগে আমি ইন্টারনেটে ইউ জী-র 'কথোপকথন' পড়া শুরু করি। তখন ইউ জী-র বই পড়ে মোটামুটি এই রকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, এই ভদ্রলোক যা বলছেন তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক বেশি মিল আছে, বিশেষ করে আমার আধ্যাত্মিক সংস্থা যেসব কথা বলতে চায় তার তুলনায়। যদিও আমি আধ্যাত্মিক সাধনায়

তখন ডুবে ছিলাম, তবুও প্রশ্নগুলো আমায় সবসময় বিচলিত করত আর সেখানে আমি কোনওভাবেই সেই সব প্রশ্নের আলোচনার পরিবেশ পেতাম না। সেই সমস্ত প্রশ্নগুলোই ইউ জী-র লেখায় একটা বিশেষত্ব পেয়েছে। বুঝেছিলাম এই ভদ্রলোকের মধ্যে এক অসাধারণ সত্যসাহস আছে। যাই হোক সেই সময় আমার ধারণা এই রকম একটা উপসংহারে এসে পৌঁছায় যে আধ্যাত্মিকতা বলে যদি কিছু থেকেও থাকে, তবুও এই ব্যাপারে কারও কাছ থেকে সত্যিকারের কোনওরকম সাহায্য একেবারেই অসম্ভব—তাই অন্য কারও সঙ্গে এমন ভাবনা নিয়ে আর কোনওদিন দেখা করতে যাচ্ছি না। ফলে ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করার আর কোনও আগ্রহ জাগল না।

ইন্টারনেটে সময় পেলেই ইউ জী-র 'কথোপকথন' পড়তাম। ইতিমধ্যে মহেশ ভাট এক মাস ইউ জী-র সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীন একটা ডায়েরি লিখেছিলেন, তা 'A Taste of Death' নামে ইন্টারনেটে ছাপা হয়েছে। সেই লেখাটা পড়ে ইউ জী-র সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম। একটা আশ্চর্য রকমের কৌতূহল আমার মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করল। একদিন সকালবেলা ল্যাবরেটরিতে একা একা বসে কাজ করছি, হঠাৎ মনে হল আমার মাথার মধ্যে কে যেন একটা বলে উঠল, আজ যদি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কোনও লোকের সন্ধান পাও, তাহলে কি তুমি তাকে একবারের জন্যও দেখতে যাবে না? আমার গলা ধরে গিয়েছিল। আমি আমার অফিস ঘরে ফিরে এসে কম্পিউটারে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি ইন্টারনেট সাইট থেকে ওয়েব মাস্টারের ই-মেল আইডি নোট করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলাম। এই ভদ্রলোক হলেন অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তি যাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু আগেই উল্লেখ করেছি। চিঠিতে ছিল আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ইউ জী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন। আর শেষ প্রশ্নটা ছিল, ইউ জী এখন কোথায় আছেন। নারায়ণ মূর্তি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমায় উত্তর পাঠান। ইউ জী-র কোনও সংগঠন নেই। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ, কখন কোথায় থাকবেন এবং যাবেন তা কেউই ঠিকঠাক বলতে পারবে না, অর্থাৎ তাঁর গতিবিধি কোনও পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে না। কিন্তু কীভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে তার কোনও সরাসরি উত্তর পাওয়া গেল না। এই ব্যাপারে আর কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অধ্যাপককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠির উত্তর পাঠালাম। আমি আবার চুপচাপ। কাজের চাপে যদিও দিন কেটে যায়, কিন্তু মন

কোথায় যেন কিছু একটা চায়, একটা ধীরগতির, অথচ গভীর হতাশার স্রোতের ওপর বসে চলছে আমার ব্যস্তসমস্ত কর্মময় সংসারী জীবন। প্রায় সপ্তাহতিনেক পরে সকালে গাড়ি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে শুধু একবার দেখা করার জন্য এমন একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠল যে সেকথা কাউকে কোনওভাবে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই আমার অফিস ঘরের কম্পিউটার থেকে একটি ইলেকট্রনিক মেইল অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তিকে পাঠিয়ে দিলাম। এবার অবশ্য সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম, কীভাবে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়। অধ্যাপক দার্শনিক নারায়ণ মূর্তি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাঠালেন এবং তাঁর উত্তর দেখে আমার হৃদ্‌যন্ত্রটা বেশ কয়েকবার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। এবং বিস্মিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত হয়তো তার কাজ করাও বন্ধ করে দিয়েছিল।

আগামীকাল ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি নিউইয়র্কে আসছেন এবং তিনি যাঁর বাড়িতে উঠবেন তাঁর নাম জুলী ক্লার্ক থেয়ার। ম্যানহাটনে ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাট আছে এবং তাঁর ফোন নাম্বারটাও আমাকে লিখে পাঠালেন অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তি। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জুলী থেয়ারকে ফোন করলাম। তিনি ঘরে ছিলেন না। কিন্তু ফোনের অ্যানসারিং যন্ত্রের উত্তর শুনে নিশ্চিত হলাম যে এটা সঠিক নাম্বার। যদিও আমি কোনও মেসেজ রাখলাম না। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করলাম, জুলী থেয়ার তখনও ফেরেননি—এবার অবশ্য ফোনের উত্তর দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে আমার নাম, দূরভাষে আমার প্রান্তের নম্বর জানিয়ে একটা অনুরোধসহ ছোট সংবাদ রেখে দিলাম। যদি ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির আপত্তি না থাকে, তাহলে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে কখন, কীভাবে সাক্ষাৎ করা যায় সেটা যেন তিনি দয়া করে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেন। ফোনের সামনে বসেই দেখলাম ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। কোনও উত্তর আসছে না। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ফোন করতে লাগলাম। অবশেষে বাড়ি ফিরে রাত ন'টায় ম্যাডাম জুলী থেয়ারের সঙ্গে প্রথম ফোনে কথাবার্তা হল।

জুলী থেয়ার বেশ কয়েকদিন ধরেই ইউ জী-র সঙ্গে ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ লন্ডনে থাকাকালীন ইউ জী ঠিক করলেন, দু'দিনের মধ্যেই নিউইয়র্কে ফিরে আসবেন। জুলীকে গতকাল রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন—এবং জুলী আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। অনেকদিন অ্যাপার্টমেন্টটা খালি পড়ে ছিল। তাই সারাদিন ধরে

ঘর পরিষ্কার করা, এখানে ওখানে গিয়ে যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক সামগ্রী জোগাড় করায় তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমাকে ফোন করার সুযোগ পাননি। তাছাড়া শুধু আমি নই, অনেকেই ফোন করে খবর রেখেছেন এবং সবাই অনুরোধ করেছেন তাঁদের ফোন করতে। ভেবেছিলেন রাতে সব কাজ সেরে এক এক করে সবাইকে উত্তর দেবেন। আগামীকাল ইউ জী লন্ডন থেকে দুপুর নাগাদ নিউইয়র্কে এসে পৌঁছাবেন। আমাকে জুলী বললেন, আগামীকাল সন্ধ্যায় যদি আমি তাঁদের বাড়িতে ফোন করি, তাহলে সরাসরি ইউ জী-র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আসতে পারে। জুলী থেয়ারের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে, তাঁর খুব আগ্রহ আমি যেন ইউ জী'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু এইসব ব্যাপারে ইউ জী-র মতামত এমনভাবে স্থান-কাল-পাত্র-নির্ভরশীল যে আজ পর্যন্ত জুলী বুঝে উঠতে পারলেন না কখন ইউ জী 'হ্যাঁ' বলবেন আর কখন ইউ জী 'না' বলবেন। জুলীর আপাতত এমন একটা ধারণা হয়েছে যে ইউ জী-র সঙ্গে কে দেখা করতে চায় আর না চায় সে ব্যাপারে ইউ জী-র কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ইউ জী যেন এক বিশাল নদী। বর্ষায় ফুলে উঠে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। কে তার জল খেল, আর কোন গাছটা ভেঙে জলে পড়ল, তার সঙ্গে খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর বয়ে চলার কোনও সম্পর্ক নেই। তবুও ফোনে বিদায় জানানোর আগে জুলী থেয়ার আমাকে কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে কীভাবে কথোপকথন করলে সেটা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে এবং লোকজনের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে যদি তাঁর অনীহা তাঁর কথোপকথনে প্রকাশ পায়, তাহলে আমি যেন সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব না দিই। ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার গভীর আগ্রহ যদি আমার মধ্যে সত্যি সত্যি দানা বেঁধে থাকে, তাহলে সেই কথা এই অন্তর্যামী ক্ষণজন্মা পুরুষটির দৃষ্টিতে ধরা পড়বে এবং সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই বলে দেবেন, কখন কোথায় দেখা করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এইসব কোনও কিছুই যদি কাজ না করে, অর্থাৎ ইউ জী যদি সরাসরি বলে দেন যে তিনি এখন সময় দিতে পারবেন না, তাহলেও যেন আমি একেবারেই হতাশ হয়ে না পড়ি। আবার যেন দু' একদিনের মধ্যেই ফোন করি। আমার আগ্রহ দেখলে ইউ জী নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবেন। ভাবলাম কে এই ভদ্রমহিলা জুলী থেয়ার। যিনি মনেপ্রাণে চান যে আমার সঙ্গে যেন ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সাক্ষাৎ ঘটে!

পরের দিন সময়মতো ফোন করলাম। দু'বার ফোন বাজতেই জুলী ফোন ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনি একটু ধরুন। আমি ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করে

দেখি। আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম তাঁদের কথোপকথন। আমার উত্তেজনা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে অতিজাগ্রত স্তরে নিয়ে এসেছে। জুলী আমতা আমতা করে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করছেন, বলেছিলাম নিউ জার্সি থেকে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, তিনি এখন ফোনের অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন। কী বলব তাঁকে? ইউ জী বললেন, ধরতে বলুন, আমি এক্ষুনি আসছি। জুলী আমাকে ফোনটা ধরে অপেক্ষা করতে বললেন। অপরপ্রান্তে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমি ফোনটা কানে চেপে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই প্রথম ইউ জী-র গলার আওয়াজ শুনলাম ।

—হ্যালো ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি বলছি।

—হ্যালো নমস্কার স্যার, আমার নাম সব্যসাচী গুহ, আমি নিউ জার্সি থেকে বলছি। আমি আপনার সমস্ত 'কথোপকথন' ইন্টারনেটে পড়েছি এবং সেই সূত্রে অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে জুলী থেয়ারের টেলিফোন নাম্বারটা পেয়েছি। আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। প্রকৃতপক্ষে যতশীঘ্রসম্ভব আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আমি আজকেই এখানে এসেছি। আগামীকাল একটু এয়ারলাইনস অফিসে গিয়ে টিকিট বুকিং করার কাজ আছে। আগামী পরশু আপনি আসতে পারবেন?

—কখন এলে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না?

—আপনি নিশ্চয়ই অফিসে কাজকর্ম সেরে তারপর আসবেন। আপনাদের বাড়ি থেকে ম্যানহাটনে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

—আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম করি। ফলে আমার সেই রকম তাড়া নেই। তাছাড়া আমার ছুটি নিয়ে আসতে কোনও অসুবিধা নেই। আপনি যখন বলবেন, তখনই আমি আসতে পারব। নিউ জার্সিতে আমি ব্রান্সউইক বলে একটা ছোট শহরে থাকি, সেখান থেকে ম্যানহাটনে আসতে খুব বেশি হলে ঘণ্টাদেড়েক সময় লাগে।

—আমি খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি, আর জুলী বোধহয় রাত দু'টো র পর আর ঘুমান না। আপনি যদি ছুটি নিয়েই আসতে চান তাহলে যত সকালে পারেন চলে আসুন।

—তাহলে আগামী পরশু সকালবেলা আমি আসছি। অশেষ ধন্যবাদ স্যার।

—আপনি একটু ধরুন, আমি জুলীকে ডেকে দিচ্ছি। তিনি আপনাকে এখানে আসার পথনির্দেশ দিতে পারবেন।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর আবার ফোনে জুলীর আওয়াজ শোনা গেল। তিনি বললেন, আমার আজ একাদশে বৃহস্পতি। তা না হলে এইরকম ঘটনা নাকি তিনি কখনও দেখেননি। এর আগে অ্যালেন ক্রিস্টাল নামে জুলীর এক বান্ধবী অনেকবার ইউ জী-র বই পড়ে এবং অনেক ভিডিও দেখে ইউ জী-কে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যখন অবশেষে ইউ জী-কে ফোন করেছিলেন—ইউ জী নাকি বলেছিলেন, শুধু শুধু আমাকে দেখতে এসে পয়সা নষ্ট করবেন! যাই হোক আমাকে জুলী বিস্তারিত পথনির্দেশ দিয়ে দিলেন। আমি বাসে যাব। কারণ আমাদের বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড খুব কাছে। বাস যাবে পোর্ট অথরিটি পর্যন্ত। তারপর 42nd স্ট্রিট থেকে পাতাল রেলে করে আপটাউনের ট্রেন ধরে 59th স্ট্রিট, কলম্বাস সার্কেল, সেখান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট ধরে হেঁটে, 64th স্ট্রিটের এক নং বাড়িতে যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে সহজ সরল আনন্দপূর্ণ এই কথোপকথন আমার এত ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল পুরোনো এক প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন পরে কথাবার্তা হল। এবার তাঁকে দেখার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। জুলীর এত চেতাবনি—আমি কোনও কিছুর আভাসই পেলাম না। আগামী পরশু সকাল আটটায় নিউইয়র্কে জুলীর অ্যাপার্টমেন্টে ইউ জী-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল।

আমি নিয়মিত ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি। তবুও ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম। যদি সেদিন ঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙে তাহলে ইউ জী কী ভাববেন! নিয়মানুবর্তিতা গভীর আগ্রহের পরিচায়ক। এ কথা আমি পরিষ্কার করে দেখাতে চাই আর না চাই দৈবদুর্যোগে যেন আমার আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আগ্রহটা হেলাফেলার পর্যায়ে চলে না যায়, তার সতর্ক বন্দোবস্ত করার পরেই রাত্রে শুতে গেলাম। তবুও রাত দু'টো থেকে আমার ঘড়ি দেখা শুরু হল। হয়তো গভীর নিদ্রার বশে অ্যালার্ম শুনতে পেলাম না, এই রকম ঘটনার সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করা যায় না। যাই হোক, ঠিক সকাল আটটায় সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট এবং 64th স্ট্রিটের মোড়ে এক নম্বর বাড়ির সামনে হাজির হলাম। এই বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের প্রধান দরজায় প্রহরী আছেন। তাঁকে বললাম সেভেন-এ'র জুলী থেয়ারের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে। আমি কীভাবে সেখানে যাব। প্রহরীর একটা ছোট্ট ঘর আছে, ঢুকতেই লোহার গেটের ঠিক ভেতরের বাঁ-দিকে।

সে ঘরে আছে একটা টেলিফোন, একটা চেয়ার-টেবিল, টেবিলে একটা নোটবুক এবং ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনের একটা ছোট্ট মনিটর। অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের কোথায় কী হচ্ছে তা ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে। প্রহরী সেভেন-এ'তে ফোন করলেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর দেখিয়ে দিলেন কোথায় যেতে হবে। এরপর একটা বাঁধানো খোলা চত্বর পার হয়ে একটা বড় বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রহরী তার ছোট ঘরেই একটা সুইচ টিপে ধরে আমাকে ইঙ্গিত করলেন ভেতরে যেতে। ইলেকট্রিক লক খুলে দিয়েছেন। আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। লিফটে চড়ে সাততলার 'এ' অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে কলিংবেল টিপলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। এক ভদ্রমহিলা ঠিক আমার সমান লম্বা, খুব ছোট করে ছাঁটা চুল, মস্তক মুণ্ডন করার দু' সপ্তাহ পরে যে রকম মাথার অবস্থা হয়, অনেকটা সেইরকম। পরনে ঘাঘরা এবং জামা। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'জুলী, জুলী থেয়ার। আমি করমর্দন করতে করতে বললাম, সব্যসাচী গুহ।' ভেতরে ঢুকেই জুতো খুলে ফেললাম। কোট রাখার জায়গায় জ্যাকেট রেখে এগিয়ে গেলাম বসার ঘরের দিকে। চোখে পড়ল ডানদিকে এবং বাঁদিকে একটা একটা করে বেডরুম। বিশাল লিভিং রুম। খালি জায়গায় একটা টেবিল টেনিস বোর্ড বসানো যাবে। ঘরের কোনায় একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো—কিছু ফুলের টব, একটা বড় কালো শিবলিঙ্গ, তারপর ব্যালকনি। ঠিক সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট অ্যাভিনিউয়ের উপরে। আমি ছাড়া তিনজন বসা যাবে এইরকম একটা সাদা সোফায় বসলাম—জুলীর ইঙ্গিতে। ব্যালকনির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল পার্ক। নাম সেন্ট্রাল পার্ক। পার্কের ওপারে ইস্ট সাইড। সেখানে সারি সারি আকাশছোঁয়া বিভিন্ন ডিজাইনের বড় বড় বাড়ি। জুলীর লিভিং রুম থেকে নিউইয়র্কের এক অদ্ভুত রূপ দেখা যায়।

জুলী ছাড়া আর জীবন্ত কিছু এখনও আমার চোখে পড়েনি। বাঁদিকে দু'টো দরজা। একটা দিয়ে রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে। অন্য একটা দরজা দিয়ে লম্বা ডাইনিং টেবিল চোখে পড়ল। এই বাড়িতে মার্জার-সারমেয় জাতীয় কোনও প্রাণী হয়তো বসবাস করে না। বসে বসে ভাবছি, কোথায় আমি জন্মেছি আর এখন কোথায় এসে এহেন এক অজাতশত্রু, ক্ষণজন্মা পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। আমি ভারতীয়, তিনিও ভারতীয়। অথচ দেখা হচ্ছে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এক মার্কিনি ভদ্রমহিলার বাড়িতে। আমার উত্তেজনা ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। কী ধরনের

কথাবার্তা হবে কে জানে! অবশেষে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি। এই প্রথম দর্শন! ছোটখাট, প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, ফর্সা, লম্বা চুল, দাড়ি কামানো মুখমণ্ডলে এক বিরল আভিজাত্য। অমায়িক হাসিতে পুরো মুখটা ভাস্বর হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন; আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলালাম। সোফায় বসতে বসতে তাঁর পাশেই বসতে ইঙ্গিত করলেন। জুলীও এসে যোগদান করলেন। উলটোদিকের আরেকটা সোফায় বসলেন। ইউ জী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কী বলে সম্বোধন করব। আমি বললাম, আমার নাম সব্যসাচী গুহ। এখানে অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে কর্মস্থলে সবাই প্রথম নামে ডাকে। তা পুরো নামটা বেশ কষ্টকর, তাই সকলে সাবিয়া (Sabya) বলেই ডাকেন। জুলী বললেন, আমরা যদি ড. গুহ বলে ডাকি তাহলে আপনার কোনও আপত্তি আছে? আমি বললাম, ডক্টর, মিস্টার লাগাবার দরকার নেই, খালি নামই ভালো। এবার ইউ জী বললেন, আমরা তাহলে আপনাকে গুহা বলেই ডাকব। সেই থেকে ইউ জী-র পরিচিত বন্ধুদের কাছে আমি 'গুহা' বলেই পরিচিত। এবং ভারতীয় লোকজন গুহাজী বলে ডাকেন।

আমি আর ইউ জী মুখোমুখি বসে আলোচনা করছি। ততক্ষণে জুলী উঠে চলে গেছেন। মনে হল ইউ জী-র মুখটা আরও উজ্জ্বল, রক্তিম হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত মনোযোগ তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দগুলোর সঙ্গে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক শব্দ তখনই একটা ধারণাকে তুলে ধরে এবং ভাবনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে যখন শব্দগুলোর মধ্যে একটা অদৃশ্য সম্পর্ক থাকে। যদি সে সম্পর্ক চেতনার জগতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন বাক্যের আওয়াজ আর কাউকে খুঁজে পায় না। আমার অবস্থা নিজের কাছে বারবার সেরকমই মনে হচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনলাম আলোচনার মধ্যে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলোকে আরও ভালো করে জানার ও বোঝার এই বোধহয় সুবর্ণতম সুযোগ। ইউ জী-র মতামতের অসীম মূল্যের কথা ভেতরে ভেতরে গুঞ্জরিত রাখার প্রয়াসের মাধ্যমেই হয়তো এই প্রবল সম্মোহন থেকে নিজেকে মুক্ত করা গেল। আমার সবচেয়ে যেটা জানার ইচ্ছা ছিল তা হল, আমার অসাধারণ অভিজ্ঞতাগুলোর পশ্চাতে কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে কি না, তার ওপর ইউ জী-র মন্তব্য কী হতে পারে, সেইসব কথা। আমি খুব ধৈর্য নিয়ে ধীরে ধীরে ইউ জী-কে সব বলার চেষ্টা করলাম। আমি ছোটবেলা থেকে যোগাসন এবং ধ্যান করি।

গত চার-পাঁচ বছর ধরে এক আধ্যাত্মিক গুরুর তত্ত্বাবধানে গভীর আগ্রহ এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ধ্যানসাধনায় নিযুক্ত আছি। ধ্যানে আমার বহুবিধ, অসাধারণ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। যতই আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ততই আমার অন্যকিছু করার ইচ্ছা কমে আসছে। মনে মনে ভাবলাম ইউ জী হয়তো এবার আমার অভিজ্ঞতাগুলো বিস্তারিত বলতে বলবেন এবং বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে সেইরকম কোনও সাড়া পেলাম না। উপরন্তু এইসব অভিজ্ঞতা যেন ছেলেখেলা, এইরকম একটা মনোভাব দেখিয়ে ইউ জী ঘোষণা করলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মন যা জানে না, তা কখনও অভিজ্ঞতার আওতায় আসতে পারে না। হঠাৎ করে এইরকম একটা কথা মেনে নিতে পারলাম না। এটা গভীরভাবে ভাবা দরকার। পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকম উদাহরণ প্রয়োগ করে হয়তো আলোচনা করা যেতে পারে; ইউ জী-র মন্তব্যের নিশ্চয়ই একটা লজিক আছে। তবে বুঝলাম এইসবে তিনি মোটেই আগ্রহী নন—একটু অবশ্য হতাশ হয়েছিলাম। এইসব আশ্চর্য ঘটনার কোনোই গুরুত্ব নেই! হঠাৎ মনে হল ইউ জী-র জীবনেও অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং সেইসবেরও কি কোনও গুরুত্ব নেই! আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে বললাম, আপনার জীবনে যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে—তার কি কোনও অর্থ নেই! ইউ জী সরাসরি উত্তর দিলেন, 'আমার জীবনে যে শারীরিক বিপর্যয় ঘটেছে সেটাকে অভিজ্ঞতার আওতায় আনা যাবে না। তাই সেইসব ঘটনাকে আমি অভিজ্ঞতা বলি না। আসল কথা হল, আমার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে সেইসব কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।' আমি অবশ্য এভাবে কখনও কিছু ভাবিনি। আমার বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান এই কার্যকারণের ভিত্তির ওপরেই দণ্ডায়মান। আমি যখন কোনও কিছু করি তখন তার পরবর্তী ধাপ কী হবে তা ধারণা করতে পারি এই কার্যকারণ-সম্পর্কের জ্ঞান থাকার জন্যেই। অতএব পালটা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার কিন্তু মনে হয় আপনার জীবনে যা ঘটেছে—তা একটা অ্যাকাডেমিক নিদর্শন, একটা ক্লাসিক্যাল উদাহরণ। আপনার আপসহীন মনোভাব, অপার কষ্টসহিষ্ণুতা, একনিষ্ঠ সাধনা, সংসার-ত্যাগ, সুখবর্জন এবং পরিণতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, আবার ফিরে আসা। এরপর অকল্পনীয় শারীরিক পরিবর্তন—এইসব হয়তো আপনার কঠোর তপস্যারই ফল। আমার বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ইউ জী-র মুখমণ্ডলে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। তাঁর নির্ভীক দ্বিধাহীন অভিব্যক্তি তাঁর শক্ত হয়ে ওঠা চোয়ালের পশ্চাৎপট থেকে সাবলীল ভঙ্গিমায়

উৎসারিত হতে লাগল। এমন তার বিন্যাস, এমন তার নৈশ্চিত্য—মনে হল সন্দেহ এবং ভয় সেইসবকে কোনওদিন স্পর্শ করতে পারবে না। যাই হোক তাঁর বক্তৃতার উপসংহার, যাকে আমি বলি মূলমন্ত্র তা হল, তাঁর জীবনের কোনও দু'টো ঘটনার মধ্যে কোনওদিন কোনওরকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ঘটনাগুলো দৈবক্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনা। এবার আমি চুপ। যাঁর নিজের সম্বন্ধে এইরকম দৃঢ় ধারণা, তাঁকে আমার অভিজ্ঞতার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা নিতান্তই ছেলেমানুষী। আমি আর কোনও মতামত প্রকাশ করলাম না। আমাকে এইরকম হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে দেখে ইউ জী আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, আমি আর আপনি দু'টো কুকুরের মতো শুধু ঘেউ-ঘেউ করে চলেছি। এর বাইরে আমাদের কথোপকথনের আর কোনও গুরুত্ব নেই। এরপর আলোচনা করার মতো আর কিছু থাকতে পারে! মনে হল কোথায় যেন কিছু একটা সমস্ত মানসিক গতিময়তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে—ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ইউ জী-র জীবনকাহিনি লিখেছেন মহেশ ভাট। সেই বইটা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী চিৎকার করে জুলীকে ডাকলেন এবং বললেন তাঁর কাছে যদি বইটা থাকে তাহলে যেন এক্ষুনি এনে দেখান। জুলী বইটা নিয়ে এলেন। ইউ জী বইটা খুলে কয়েকটা ছবি দেখালেন। বিস্তারিতভাবে অন্যান্য যাদের ছবি আছে তাদের সঙ্গে ইউ জী-র সম্পর্কের কথা বললেন। ইউ জী-র স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ছাড়াও ছিল ভ্যালেনটাইন, পারভিন ববি এবং মহেশ ভাটের যুবক বয়সের ছবি। সেই সময় জুলী এসে ইউ জী-কে বললেন, আপনি বলেছিলেন একটা জ্যাকেট দেখবেন। তা এখন সেই দোকানটা খুলেছে। আজকে খুব বড় সেল। তাড়াতাড়ি না গেলে ভালো জিনিস কিছু থাকবে না। ইউ জী আমাকে ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। নিউইয়র্কের এক বিখ্যাত দোকান বার্নি। সেখানে সাতশো ডলারের জ্যাকেট সাড়ে তিনশোয় পাওয়া যাবে আজ। ইউ জী এবং জুলী সেখানে যাবেন। আমি মনে মনে ভাবলাম আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়সীমা হয়তো শেষ। এবার এখান থেকে যাওয়ার তোড়জোড় করা উচিত। যেই না এই কথা ভাবলাম সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, আপনার কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে? আমি বললাম, না, না, আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। আমার কোনও তাড়া নেই। ইউ জী বেশ খুশি হয়ে

জুলীকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, গুহা যদি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তাহলে আমরা দোকান থেকে ফিরে এসে একসাথে মধ্যাহ্নভোজন করতে পারি। আপনাদের এতে কোনও আপত্তি আছে? আমরা দু'জনে বেশ আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

এই বিশাল বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে আমি এখন একা। দু'ঘণ্টার পরিচয়ে আমাকে একা ঘরে রেখে জুলী এবং ইউ জী বাজারে গেছেন। একটু আশ্চর্য লাগছে! আমি মহেশ ভাটের লেখা ইউ জী-র জীবনকাহিনি পড়তে শুরু করলাম। মহেশবাবু তাঁর নিজের সম্পর্কেও অনেক কিছু লিখেছেন। মনে পড়ল ইউ জী কিছুক্ষণ আগেই মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মতে এই জীবনকাহিনিটিকে মহেশ ভাটের নিজের একটা ছোটখাট আত্মপরিচিতিমূলক কাহিনি বললে ভুল হবে না। মহেশ ভাটের লেখা থেকে যেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় সেটা হল এইরকম—ইউ জী-র জীবনটা অত্যন্ত রহস্যময় এবং তাঁর সঙ্গে আপনি যতই সময় কাটাবেন, দেখবেন এই রহস্য সমাধান করা তো দূরের কথা উলটে সেটা আরও গভীর সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। যে সমস্ত ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ইউ জী যেরকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে এই কথাই বারবার বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকী ইউ জী যখন কিছু বলেন, সেটা শুনলে মনে হয় যেন একটা যুক্তি আছে, একটা সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু যেই আপনি সেই কথা অন্য কারও সামনে পুনরাবৃত্তি করতে যাবেন, আপনার নিজেরই কেমন খটকা লাগবে। আমার মাথায় কিছুক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তিকর চাপ অনুভব করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে এই চাপ রীতিমতো যন্ত্রণায় পরিণত হল। বই পড়া বন্ধ করে চোখ বুজে নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া চেষ্টা করলাম। মাথার যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু চেতনায় স্থান পেল না। ইতিমধ্যেই ইউ জী এবং জুলী দোকান থেকে ফিরে এলেন। তাঁরা ইউ জী-র জন্য খুব ভালো একটা জ্যাকেট দেখে এসেছেন। সন্ধ্যায় বা আগামীকাল কিনে আনবেন। আমি গোপনে জুলীকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কাছে মাথাব্যথার কোনও ওষুধ আছে কিনা। তিনি আমাকে এখানকার সবচেয়ে প্রচলিত মাথাধরার বড়ি টায়লানলের একটা বোতল হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে একসাথে দু'টো ট্যাবলেট খেয়ে নিলাম। কারণ এই রকম মাথাধরা নিয়ে কথা বলা তো দূরের কথা, শুনতেও অস্বস্তি লাগে।

জুলী ইউ জী-র প্রিয় ইডলি একটা ছোট প্লেটে করে ইউ জী-কে দিলেন। আমাকে ভীষণ অবাক হয়ে যেতে দেখে ইউ জী বললেন, এসব জুলী তৈরি করেনি। আমার নাতি কিট্টু গতকাল রাত্রে এনেছিল। জুলী এখন সেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে তাতে ঘি ঢেলে আমাকে দিয়েছেন। এক মিনিট পরে আমার প্লেটও চলে এল। খেতে খেতেই বললাম, আমার স্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা, সেও খুব ভালো ইডলি, ধোসা, উত্তাপম বানাতে পারে। এবার ইউ জী-র উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পশ্চাৎপট। আমি বললাম, আমি কলকাতার কাছাকাছি হুগলি জেলার হিন্দমোটর নামের একটা শিল্পনগরে বড় হয়েছি। সেখানেই স্কুল অবধি পড়াশোনা। বিড়লা গ্রুপের অ্যাম্বাসেডর গাড়ি তৈরির প্রধান কারখানা হিন্দুস্থান মোটর্সের সুবাদে নগরের নাম। এরপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে পড়তে এক রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। ইউ জী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কলকাতা তাঁর খুব প্রিয় শহর এবং ভ্যালেনটাইনেরও কলকাতা ছিল সবচেয়ে প্রিয়। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিজে দেখা করি। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য হিসাবে তিনি আমাকে তাঁর লেখা একটা কবিতার বই উপহার দেন। আমার স্ত্রী যখন আমেরিকা থেকে ফিরছিলেন, তখন তাঁর হারানো লাগেজের সঙ্গে আমার অনেক বই, চিঠি, দরকারি কাগজপত্র হারিয়ে যায়। তার মধ্যেই ছিল সেই বইটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মীর সঙ্গে কোথায় দেখা হয়। উত্তরে বললাম, রাউরকেল্লায় রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। এরপর আমি বাঙ্গালোরে এবং লক্ষ্মী বম্বেতে পিএইচডি করে। এই সময় আমরা বিয়ে করি। আমার স্ত্রী তেলুগু ব্রাহ্মণ আর আমি বাঙালি কায়স্থ পরিবারের ছেলে। লক্ষ্মী আমার মায়ের কাছ থেকে বাঙালিদের মতো মাছ, মাংস রান্না করা শিখেছে। খুব ভালো রান্না করে, কিন্তু কোনওদিন সেইসব মুখে ছুঁয়েও দেখেনি। ইউ জী আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অবশেষে বললেন, আপনার স্ত্রী নির্ঘাত একজন সেইন্ট। তা না হলে এইরকম অত্যাচার সহ্য করলেন কি করে। আমি খুব হাসলাম এবং হাসতে হাসতে বললাম, প্রেম মানুষকে দিয়ে কতকিছু করায়; আমি অবশ্য সম্পূর্ণ নিরামিশাষী। ইউ জী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বাঙালি, কিন্তু মাছ-মাংস খাই না কেন? বললাম, শ্রী রামচন্দ্র মিশনের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করি প্রায় সাড়ে চার বছর আগে। তিন মাস ধ্যান করার পর টের পেলাম মাছ, মাংস, ডিম খেতে একদম ভালো লাগছে না। ধীরে

ধীরে এইসব খাবারের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য হল না। অবশেষে আমার জীবন থেকে আমিষ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন একদম শেষ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে সেই সময়। আমি মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিয়ার, ওয়াইন বা হুইস্কি গ্রহণ করতাম। একদিন এক পার্টিতে আবিষ্কার করলাম বিয়ারের গন্ধে পর্যন্ত গা গুলিয়ে উঠছে। দু-তিনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই খেতে পারলাম না। ব্যাস, আমার জীবন থেকে অ্যালকোহল চিরজীবনের মতো শেষ হয়ে গেল। লোকে কত চেষ্টা করে এইসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আর আমি চেষ্টা করেও আর খেতে পারলাম না। এইসব ঘটনায় আর কারও মাথাব্যথা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমার স্ত্রী লক্ষ্মী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। হয়তো গোপনে কোনও ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছিল। আর সেই সাফল্যে তার পরমানন্দের অনুভূতি হয়েছিল। ইউ জী মুচকি হাসলেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ, ইউ জী তিনটে ইডলি খেয়েছেন। আমিও তিনটি ইডলি খেলাম। আমরা তিনজনে বসে গল্প করছি। 'মাইন্ড ইজ এ মিথ' বইটা আমার খুব ভালো করে পড়া আছে। আমি কথায় কথায় সেই বইয়ের একটা জায়গা উল্লেখ করলাম। বললাম, প্রথম দিকে এক জায়গায় লেখা আছে, 'যদি ইউ জী আপনাকে (আধ্যাত্মিক ব্যাপারে) সাহায্য করতে না পারে তাহলে আর কারও পক্ষে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।' ইউ জী আমার উদ্ধৃতি শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। জুলীও জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় এটা লেখা আছে। আমি বইটা খুলে দেখালাম। আমি বললাম, এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে আমি আপনার নিজের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই। ইউ জী-র উত্তর শুনে সেদিন অবশ্য আমার খুব ভালো লেগেছিল। তিনি বললেন, দেখুন এইরকম কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। যিনি এই কথা লিখেছেন, এটা যদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত বা মন্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমি নিজে এই ধরনের কথা কোনওদিন বলব না।

ইউ জী লক্ষ্য করলেন আমার তাত্ত্বিক আলোচনা করার প্রবণতা প্রায় শেষ। হয়তো হালকা কোনও বিষয়ে কথাবার্তার মধ্যে সময় কাটানোর জন্যই তিনি জুলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি যে বিভিন্ন জ্যোতিষ, সাইকিক আর হস্তবিশারদদের বলা আমার জীবনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একত্র করেছিলেন সেই

বইটা কাছাকাছি থাকলে একটু নিয়ে আসুন। হয়তো গুহর এতে বেশ মজা লাগবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য? আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমি এইসব জিনিস ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। মাঝে মাঝে এমন অসাধারণ ঘটনা ঘটে যখন মনে হয় হয়তো বা এর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কিছু থাকলেও থাকতে পারে। আবার যখন দেখি এদের বলা ভবিষ্যৎ মিলছে না, তখন মনে হয় এসব আসলে একটু বুদ্ধি করে আন্দাজে ঢিল মারা। অবশ্য কারও কারও মতে এসব ব্যাপার সামান্য মিললেও এই কথা বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে কিছু একটা আছে। এবার আমি ইউ জী-র মতামত শোনার জন্য গভীর আগ্রহ বোধ করলাম। এখন পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে প্রায় সমস্ত কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নেতি, নেতি; তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর তাঁর অভিমত জানার আমার ভীষণ ইচ্ছা হল। ইউ জী আমার আগ্রহের অতিশয্য দেখে বললেন, এই কোষ্ঠীবিচার বা হাতের রেখা বিচারের ব্যাপারটা এমনভাবে আমাকে অবাক করেছে যে, এই ব্যাপারে আমার মতামত এখনও মুলতুবি আছে। শুনুন তাহলে আপনাকে আমি আমার জীবনের কয়েকটা ঘটনা শোনাই। এরপর বিচারের ভার আপনার।

আমি তখন কলেজে পড়ি, যে বন্ধুটি আমায় রমণ মহর্ষির কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে-ই একদিন আমাকে উত্তেজিত হয়ে বলল, এক অসাধারণ জ্যোতিষীর খবর পাওয়া গেছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নাকি প্রস্তরলিপির মতো ব্যাপার। বহু লোক এইসবের সাক্ষী। চল, একবার তাঁর কাছে আমাদের কোষ্ঠীবিচার করি। আমি তখন একটা অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সংসার করব কি করব না। আমার দাদু-ঠাকুরমা আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য এমন উঠেপড়ে লেগেছিলেন যে আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাই বন্ধুর কথা শুনে ঠিক করলাম, জ্যোতিষের কাছে যাব। আমার কোষ্ঠী নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। অনেক গণনা করে তিনি বললেন, এটা যদি আপনার ছক হয়, তাহলে আপনার বিবাহ হবে ঠিক তিন মাসের মাথায়। আমি বাড়ি ফিরে কয়েন টস করলাম। তাতেও দেখা গেল, ভাগ্যদেবী আমার বিয়ে করার স্বপক্ষে। পরের দিন ঠাকুরমাকে খবর পাঠালাম। মেয়ে দেখ—তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করছি। ঠাকুরমা অবাক হয়ে দাদুকে বললেন, আমার মনে হয় ও কাউকে নিজেই দেখে রেখেছে,

তাই হঠাৎ এইরকম পাগলামি করছে, বলে তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করব! দাদু বললেন, আমি গোপালকে চিনি। সে যদি কাউকে পছন্দ করে তাহলে তাকে ঘরে এনে আমাদের সামনে হাজির করবে। সেসব কিছু নয়—চল মেয়ে দেখি। বিশ্বাস করবেন না, ঠিক ঠিক তিন মাসের মাথায় আমার বিয়ে হল। আমি হাসিমুখে নিঃশব্দে মাথা নাড়ালাম। ইউ জী উৎসাহভরে আরও ঘটনা বলতে লাগলেন।

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমার দাদু, থুমালাপল্লি গোপাল কৃষ্ণমূর্তি, এক স্বনামধন্য আইনজীবী, আমাকে নিয়ে মাদ্রাজের এক বিখ্যাত নাদি বিশারদের কাছে যান। কৌমার নাদি—এরা নাকি তালপাতা পড়ে আমার জন্ম-জন্মান্তরের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, কয়েকশো বছর আগে এই তালপাতায় যাঁরা যাঁরা এখানে আসবেন তাঁদের ভবিষ্যৎ লিখে রেখে গেছেন এক ঋষি। বর্তমান জ্যোতিষী সেই ঋষির সরাসরি বংশধর। ভদ্রলোক আমাদের সামনে এক তাড়া তালপাতা এগিয়ে দিয়ে সেখান থেকে একটা তালপাতা বের করে নিতে বললেন, এবং এতেই নাকি আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব লেখা আছে। আমি একটা তালপাতা নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। প্রথমেই তিনি আমার বাবা-মায়ের নাম উল্লেখ করলেন। সেই তালপাতার ওপর প্রাচীন তামিল ভাষায় লেখা দেখে মনে হল এইসব লেখা প্রচলিত তামিল ভাষা থেকে অনেক আলাদা। আমি বললাম, আমার বাবা-মার নাম ঠিক ঠিকই লেখা আছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে এই তালপাতায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে এটা নিঃসন্দেহে আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তা ছিল এইরকম। এই বালক এক অসাধারণ যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অর্থাৎ পূর্বজন্মে সামান্য কারণে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়নি। সেইজন্য তাঁকে আবার জন্ম নিতে হয়েছে এবং এই জন্মে তাঁর সিদ্ধিলাভ একেবারে নিশ্চিত। ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মধ্যে একটা বিরল মৌলিক পরিবর্তন আসবে এবং তারপর থেকে বাদবাকি জীবন তিনি বিশ্বের চারপ্রান্তে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী হবেন। আমি সত্যি সত্যি খুব অবাক হয়ে গেলাম।

জুলী একটা বড়সড় বই এনে আমাদের সামনে হাজির হলেন। বইটিতে বিভিন্ন জ্যোতিষী কখন কোথায়, ইউ জী-র ছক বা হাত দেখে কী বিচার করেছেন, কী মতামত দিয়েছেন বা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেইসবের সংকলন করা আছে। বাঙ্গালোরে ইউ জী-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু চন্দ্রশেখর অনেক সাহায্য করেছেন জুলীকে এই

বইটা তৈরি করতে। ইউ জী বেশ কয়েকটা মজার মজার লেখা পড়ে শোনালেন। একটা আলোচনা আমার মনে ধরেছিল এবং সেটা ছিল এইরকম। ইউ জী কোনও সংগঠন তৈরি করবেন না। তিনি কাউকেই কোনওদিন দীক্ষা দেবেন না। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এতই অসাধারণ যে তাঁর চোখে চোখ রাখলেই দীক্ষা হয়ে যাবে। তাঁর দেহত্যাগ তাঁর নিজের হাতে। মহাভারতের পিতামহ ভীষ্মের যেমনটি ছিল। যাকে বলে 'ইচ্ছামৃত্যু' যোগ। আমার মাথায় ইউ জী-র আর কোনও কথা ঠিকমতো জায়গা করতে পারছে না। মাথার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে। এবার বমি বমি ভাব আসছে। আমি উঠে গিয়ে বাথরুমে বমি করলাম। ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে আবার দু'টো মাথাধরার বড়ি টায়লানল গলাধঃকরণ করলাম। মিনিট পাঁচেক বাথরুমে অপেক্ষা করলাম—দেখি চোখ দু'টো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। চোখে আবার ঠাণ্ডা জল দিলাম। ফিরে এসে দেখি ইউ জী তাঁর রুমে ফিরে গেছেন। আমি সোফায় গা-টা এলিয়ে দিলাম। জুলী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কফি খাবো কি না। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। কফি এবং ট্যাবলেট মাথার যন্ত্রণাকে একটু চাপা দিয়ে রাখল।

বিকেল প্রায় চারটা। জুলী বললেন, অনেক বন্ধুবান্ধব ফোন করেছিলেন, তাঁরা হয়তো এখন এক এক করে আসবেন। প্রথমে এলেন লুনা টার্লো বলে এক ভদ্রমহিলা। বয়েসে জুলীর থেকেও অনেক বড়। নিজেকে লেখিকা বলে পরিচয় দিলেন। কথায় কথায় জানলাম, এই ভদ্রমহিলা ভারতে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক অন্বেষণে, ছেলের সঙ্গে। ছেলের নাম অ্যান্ড্রু কোহেন। তিনি এখন আমেরিকান গুরু। জুলীও এই অ্যান্ড্রু কোহেনের শিষ্যা হয়ে বেশ কিছুদিন সাধনা করেছেন। আমি অবশ্য অ্যান্ড্রু কোহেনের নাম ইন্টারনেটে দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর লেখা কোনও বই পড়িনি। এই অ্যান্ড্রু তাঁর নিজের মাকে শিষ্যা বানিয়েছিলেন এবং তাঁকে লুনা বলে ডাকতেন। যাই হোক ইউ জী-র খোঁজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে জুলী, লুনাসহ অনেক শিষ্য অ্যান্ড্রুকে ছেড়ে ইউ জী-র শিবিরে যোগদান করেন। এই ভদ্রমহিলা অর্থাৎ লুনা টার্লো একটা বই লিখেছেন। বইটার নাম 'মাদার অফ গড।' কিছুক্ষণ পরে এলেন অ্যালেন ক্রিস্টাল নামে আরেক ভদ্রমহিলা। জুলীর থেকে বয়সে ছোট। তিনিও এক আমেরিকান গুরুর শিষ্যা ছিলেন। তাঁর গুরুর নাম ডা-ফ্রি-জন। মজার ব্যাপার হল, এই সমস্ত আমেরিকান গুরুরা এক সময় কোনও না কোনও ভারতীয় গুরুর শিষ্য ছিলেন। যেমন অ্যান্ড্রুর গুরু ছিলেন পূজ্ঞাজী বলে এক

ভদ্রলোক এবং পূজ্ঞাজী নাকি রমণ মহর্ষির আধ্যাত্মিক পরম্পরা। যেহেতু রমণ মহর্ষি বলে যাননি কে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হবেন—সেহেতু এইসব গুরুরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন কে তাঁদের গুরু ছিলেন। ডা-ফ্রি-জন ছিলেন মুক্তানন্দের শিষ্য। কিন্তু তিনি বলেন যে প্রকৃতপক্ষে মুক্তানন্দের গুরু নিত্যানন্দের কাছ থেকে তিনি অনেক আধ্যাত্মিক ফল গ্রহণ করেছেন। যদিও ডা-ফ্রি-জন যখন মুক্তানন্দের কাছে দীক্ষা নেন তখন নিত্যানন্দ পরলোকগত। ডা-ফ্রি-জনের শিষ্যা অ্যালেন ক্রিস্টাল আধ্যাত্মিক সংঘ ছেড়ে দিয়ে এক ল-ফার্মে উকিলের সহকারী হিসেবে কাজকর্ম করেন। আর যখনই সময় পান ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটান। তিনিও একটা বই সম্পাদনা করেছেন। 'কারেজ টু স্ট্যান্ড অ্যালোন'। ইউ জী-র কিছু কিছু কথোপকথন হল্যান্ডের হেঙ্ক সনওয়েল বলে এক ভদ্রলোক একত্র করে একটা অডিও টেপ বের করেছিলেন 'Give up Series' নাম দিয়ে। সেই টেপের কথোপকথন টাইপ করে পুস্তাকাকারে রূপ দিচ্ছেন অ্যালেন ক্রিস্টাল। সেদিন আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন স্বনামধন্য লেখিকা—তাঁর নাম লিলি টাক্। জুলীর সহপাঠী। ভদ্রমহিলা ঘরে এসে ইউ জী-র সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন, আমার নাম লিলি টাক্ এবং আমি আমার নামের শেষভাগটা একদম পছন্দ করি না। কারণ এটা ইংরেজি একটা অকথ্য শব্দের সঙ্গে খুব মিলে যায়। ইউ জী খুব মজা পেয়েছিলেন এবং আমরা সবাই খুব হাসাহাসি করি।

আমার মাথার যন্ত্রণা আবার ফিরে এসেছে। কোনও কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছি না। আমার কাছে তখন আমার অস্তিত্ব শুধু আমার মাথার দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শুধু ভাবছি কীভাবে বাড়ি ফিরব। উপস্থিত লোকজন যখন জুলীর কাছ থেকে শুনলেন যে আমি পদার্থবিদ্যার ওপর গবেষণা করি, তখন অনেকেই উ-আ, দারুণ-দারুণ করলেন। কয়েকজন খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন গবেষণার বিষয়বস্তু। আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দিকটা ইউ জী-মুখো করে দিলাম। আর বসে থাকতে পারলাম না। অনেক দূরে যেতে হবে বলে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে সভা ছেড়ে চলে এলাম। রাস্তায় বেরোবার আগে আর একবার বমি করলাম। বাসে বসে মনে পড়ল জুলীর বিদায়বার্তা। যেভাবে আজ আপনার সঙ্গে ইউ জী-র সাক্ষাৎ হল এইরকম আমি আগে কখনও দেখিনি। তার ওপর প্রথম সাক্ষাৎ! ভেতরের 'আমি'কে পিঠ চাপড়াবার কেউ নেই,

কারণ তখন শুধু আমার মধ্যে একটাই জিনিস ছিল—যন্ত্রণা। টলতে টলতে কোনওরকমে বাড়ি ফিরলাম।

ইউ জী-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিতে প্রস্তরলিপি হয়ে গেল...।

১৫.

বারমুদা লজের হিসাব-নিকাশ রাতেই শেষ হয়েছিল। সকালে ভালো করে দেখে নিলাম সব ড্রয়ার, আলমারি, বাথরুমের ক্যাবিনেটগুলো। দরজা বন্ধ করে বেরোবার আগে বিছানার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম গত চোদ্দ দিনে কী যে হয়ে গেল কে জানে! এক অসাধারণ জীবনীশক্তি ভিতর থেকে যেন নতুন কিছু করার চেষ্টা করছে। বুকে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। মাঝে মাঝে বুকের ঠিক মাঝখানে চামড়ার নিচে কী যেন একটা তিরতির করে কেঁপে ওঠে, আবার থেমে যায়। আয়নার সামনে এসে বুকের দিকে তাকালাম। বুকের পাঁজর দু'দিক থেকে এসে মাঝখানে যেখানে ভিতরে চলে গেছে সেখানটা লাল হয়ে আছে। একটু শিরশির করছে। হয়তো রাত্রে অজান্তে চুলকেছিলাম। আমি আর এইসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব না—ঠিক করলাম মনে মনে। স্যুটকেস হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। ঘরের চাবি কাউন্টারে জমা দিয়ে লজের বাইরে চলে এলাম। বাইরে তখনও আলো ফোটেনি। জনমানবশূন্য এক টুকরো মরুভূমি। যেখান থেকে এই দুই সপ্তাহ রোজ হেঁটে যেতাম। আজকে শেষবারের মতো হাঁটব। ভালো করে আকাশের দিকে, পাহাড়ের দিকে, লজের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইউ জী-র দরজার বাইরে এসে হাজির হলাম। ইউ জী-র ঘরের দরজা ভেতর থেকে খোলা। আমি স্যুটকেস বাইরে রেখে জুতো খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম। ইউ জী একটা সোফায় বসে আছেন। সোফার সামনে অবস্থিত একটা ছোট টেবিলের ওপর পা দু'টো রাখা। আমি টেবিলের উলটোদিকে ইউ জী-র মুখোমুখি মেঝের কার্পেটে বসে পড়লাম। উনি বললেন, 'আমি তৈরি'। দেখলাম তাঁর লাগেজ প্রস্তুত। শুধু জুতো পারলেই আমরা গাড়িতে উঠতে পারি। আমরা দু'জনেই চুপচাপ। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছি। আমিই প্রথম মুখ খুললাম।

—গত দু' সপ্তাহ এমনভাবে কেটে গেল, যেন ক'টা মুহূর্ত। একটা গভীর আকর্ষণ ক্রমাগত অনুভব করে এসেছি। অদ্ভুত একটা ভালো লাগা। অপরিচিত

মাদকতা, তার ওপর দুশ্চিন্তার কোনও লেশমাত্র ছিল না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ এমন একটা ইচ্ছা হচ্ছে!

—কি ইচ্ছা হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে বাদবাকি জীবনটা আপনার সঙ্গেই কাটিয়ে দিই।

—আরে, আপনি দেখছি ভারি সেন্টিমেন্টাল। তেলুগুদের মতো বাঙালিরাও দেখছি ভারি ইমোশনাল।

আমার মনে হল, আমার ইমোশন হাসি থেকে ধীরে ধীরে কান্নার দিকে চলে যাচ্ছে। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে একটা গভীর বেদনার জন্ম নিচ্ছে। গলা ধরে আসছে। মুখের ওপর আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদলে হয়তো বুকের ব্যথাটার উপশম হতো। ভারাক্রান্ত মনটা একটু হালকা হতো। এদিকে গলা জড়িয়ে আসছে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তবুও জোর করে কয়েকবার গভীর নিঃশ্বাস নিলাম এবং নিজেকে কিছুটা সংযত করে অনেক কষ্টে বললাম, আপনাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চাই। যেই আমার মুখের কথা তাঁর কানে গেল সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিত বস্তুর মতো তাঁর পা দু'টো টেবিলের ওপর থেকে নিচে নেমে গেল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম, ধীরে ধীরে তাঁর পাশে যেতেই তিনিও সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পা দু'টো আমার নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শীঘ্রই আমরা দু'জনে অদ্ভুতভাবে ঘরের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। এ এক অভিনব দৃশ্য! লেখার সময় কেমন হাসি পাচ্ছে—অথচ সেই সময় আমার ইমোশন এমন তুঙ্গে ছিল যে চোখ থেকে সমানে জল পড়ছিল।

—আমার সঙ্গে থেকে আপনি কী করবেন? আমি ভবঘুরে মানুষ। আমার না আছে কোনও ঠিকানা, না আছে সেরকম পয়সাকড়ি। আপনি সংসারী মানুষ, বাড়িতে বউ মেয়ে, তার ওপর আপনার মূল্যবান পেশা।

—এই রকম আড্ডা মারব, এক চিলতে মেঝে হলেই রাতের ঘুম হয়ে যাবে। আর যখন সময় পাব একটু লেখাপড়ার কাজ করব। আমারও মনে হয় আমি কোনও এক জন্মে বাউল ছিলাম। আমি ছোটবেলা থেকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম—যেখানে-সেখানে রাত কাটাতাম। তাছাড়াও, অর্ধাহারে, অনাহারে আমার জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আমি স্বেচ্ছায় কষ্টে জীবনযাপন করেছি।

ইউ জী তাঁর পকেট থেকে একটা নোট বার করলেন। তারপর সেটা হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে বললেন, এই দেখুন আমার আর আমার উপবাসের মধ্যে পড়ে আছে মাত্র কুড়িটা ডলার, এতে এই মার্কিন মুলুকে একজনেরও একদিনের বেশি পেট চলবে না। আপনি বাড়ি চলে যান—তাতেই আপনার মঙ্গল। ইতিমধ্যেই মহেশ ভাট এসে পড়লেন এবং ইউ জী-র এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটালেন। মনে মনে ভাবলাম ইউ জী হয়তো লজ্জা পেয়েছেন এবং এইসব কথা নিয়ে কোনও আলোচনা করবেন না। আমার কোনও সমস্যা নেই, আমি এইসব ব্যাপারে একেবারেই নির্লজ্জ। আমার তখন এমনই মনের অবস্থা যে আমি একঘরভর্তি লোকের উপস্থিতিতে ইউ জী-র পায়ে চুমু খেতে পারি। আমার তখন বদ্ধমূল ধারণা—আমার আধ্যাত্মিক অন্বেষণের একটা সার্থকতা দেখেছি এই ইউ জী-র মধ্যে। যেমন মরুভূমিতে তৃষিত যাত্রী বারবার মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে হতাশ হয়ে পড়ে, আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল। আর ইউ জী হলেন হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া একটা Oasis—একটা সুজলা মরুদ্যান। চিৎকার করে সমস্ত পৃথিবীকে বলতে পারি, যদি কারও আধ্যাত্মিকতার ওপর কোনওরকম আগ্রহ থাকে, তাহলে একবার পরখ করে দেখ এই অফুরন্ত আধারটিকে। আমি এইসব করতে পারি না। কারণ ইউ জী তাতে ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন। অবশ্য আমাকে অবাক করে দিয়ে ইউ জী মহেশ ভাটকে বললেন, এই বাঙালি ভদ্রলোক যদিও পেশায় বৈজ্ঞানিক কিন্তু অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল—বলেন কিনা এখন থেকে আমার সঙ্গেই থাকবেন! মহেশবাবু ইউ জী-র চোখের দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, এর জন্য কে দায়ী সেও আমি ভালো করে জানি। এইভাবেই শেষ হল পাম স্প্রীং-এর ওকোটিলো লজ থেকে আমাদের বিদায়ের শেষ পর্বটি।

আজ পাম স্প্রীং থেকে আমরা সবাই যে যাঁর নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে ফিরে যাব। সবাই তাঁদের লাগেজ নিয়ে জমায়েত হয়েছেন ওকোটিলো লজের লাউঞ্জে। জুলী সানফ্রান্সিসকোতে যাবেন তাঁর মাকে দেখতে। রুথ হাবলি থেয়ার, ওল্ড ফোক্স হোমে থাকেন, বয়স প্রায় একানব্বই। সমস্ত অতীতের ভার থেকে মুক্ত, এমনকী নতুন কোনও সংবাদও তাঁর মধ্যে তেমন কোনও আলোড়ন জাগায় না; এই ব্যাপারটাকে যদি রোগ না বলা যায়, তাহলে তাঁর শরীরে আর কোনও রোগ

নেই। চকচকে গোল মুখে সবসময় লেগে আছে এক টুকরো মিষ্টি হাসি। পৃথিবীর কোনও ভাবনাচিন্তা, ভয়ভীতি আপাতত তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। জুলী যেহেতু একমাত্র মেয়ে, তাই তাঁর মায়ের সুরক্ষার কথা মাঝে মাঝেই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ইউ জী-ভাবনার মধ্যেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মায়ের বাদবাকি দিনগুলো কেমন করে কাটবে তা নিয়েও তাঁর আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। জুলীর খুব ইচ্ছা মাকে নিজের কাছে রেখে তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু সে-বাঁধনের পাল্লায় পড়লে, ইউ জী-র সান্নিধ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু গোলমাল হতে পারে—এইসব দোটানা চিন্তাভাবনা তাঁকে মাঝে মাঝেই বেশ পীড়া দেয়। আমি এইসব খুব ভালো করে বুঝি। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু-স্মৃতিসম্পন্না মা—জুলী যাঁর একমাত্র ভরসা—স্বামী বহুকাল আগেই গত হয়েছেন, অন্যদিকে অবতারপুরুষ ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি যিনি অসীম করুণার সঙ্গে তাঁকে সহযাত্রী করেছিলেন। আমার কাছে এর কোনও সমাধান নেই—কারণ তিনজনের একসঙ্গে থাকাও সম্ভব নয়। এখন যেহেতু ইউ জী চান না জুলী তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করুক, সেহেতু মায়ের কাছে সানফ্রান্সিকোতে গিয়ে থাকাটাই তিনি মনস্থ করেছেন।

ইউ জী সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন, মহেশ ভাটও যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে। তবে দু-একদিন সেখানে থেকেই তিনি মাতৃভূমি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন এবং ইউ জী পুরো গ্রীষ্মকালটা সুইজারল্যান্ডেই থাকবেন। গাড়িতে ওঠার আগে জুলীর দিকে তাকিয়ে ইউ জী হঠাৎ বলে উঠলেন—আমার সঙ্গে থাকলে এইভাবেই সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে—এই ব্যাপারে ভালো-মন্দের কোনও প্রশ্ন নেই, তাই আগুনের সঙ্গে খেলা করার আগে পোড়ার সম্ভাবনাটা ভালো করে ভেবে রাখা দরকার। ইউ জী-র কথা ভালো করে বোধগম্য হল না। মনে হল জুলীর কাছে এইসব নতুন কোনও কথা নয়, হয়তো একই মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোনও উপমার রূপ নেয়। অথচ ইউ জী যতই ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন জুলীর আক্রমণাত্মক মনোভাব ততই দৃঢ়তর হয়। অর্থাৎ তিনি আগুনে ঝাঁপ দেবার তোড়জোড় শুরু করে দেন। অবশ্য ইউ জী জুলীকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেন সেটা যে শুধু জুলীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তেমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই, অনেক অপ্রিয় অথচ প্রয়োজনীয় কথা নতুন বন্ধুদের বলা যায় না। তাই জুলীকেই তিনি তখন মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন।

ভোরবেলা আমার ওপরেই গাড়ি চালানোর ভার পড়ল। কারণ জুলীর পাশে বসতে নাকি তাঁর অস্বস্তি লাগছে এবং ইউ জী গাড়িতে সবসময় ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটেই বসেন। তাই পেছনের সিটে আজ মহেশ ভাট এবং জুলী থেয়ার। গাড়ি হাইওয়েতে উঠে গেছে, পাশে সেই সারি সারি উইন্ডমিল দেখা যাচ্ছে। মহেশ ভাটের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস নিয়ে কথা উঠল। আমি বললাম, বর্তমানে শ্রীরামচন্দ্র মিশনের সভাপতি হলেন আমাদের গুরু, সবাই তাঁকে মাস্টার বলে অভিহিত করেন। তাঁর নাম পার্থসারথী রাজাগোপালাচারী। আমি মিশনে দীক্ষা নেবার কয়েকদিন পর থেকেই আমার অনেক রকম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয় এবং আমি ধ্যানসাধনায় ভীষণ উৎসাহী হয়ে উঠি। একটা মজার কথা হল, আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যিনি মাঝে মাঝে জড়িয়ে থাকতেন তিনি পার্থসারথী রাজাগোপালাচারী নন, তিনি হলেন বর্তমান মাস্টারের গুরুদেব শাজাহানপুরের শ্রী রামচন্দ্র। এই ভদ্রলোক অনেকদিন আগেই দেহত্যাগ করেছেন। ইউ জী বললেন, আমি এই ভদ্রলোককে পরোক্ষভাবে চিনি, ফরাসি দেশে আমার এক বন্ধু এই রামচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। আমি মিশনের লিটারেচর এবং পার্থসারথীজীর ডায়েরি এতো ভালো করে পড়েছি যে আমার প্রায় সমস্ত বিদেশী এবং দেশী জনপ্রিয় প্রিসেপ্টারদের নাম জানা ছিল। উৎসাহভরে আমি ইউ জী-র বন্ধুর নামটা জিজ্ঞাসা করলাম। ইউ জী মনে করতে পারলেন না। আমি বললাম, আন্দ্রে পোরে? ইউ জী প্রায় আঁতকে উঠলেন—কীভাবে বললেন! আমি বললাম, এই আন্দ্রে পোরে শ্রী রামচন্দ্র মারা যাবার পর মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইউ জী আরও অবাক হলেন। বললেন, আমি আপনাকে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। শুধু তাই নয়, আন্দ্রে পোরে আমার সঙ্গে অনেক লোকের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেন এবং গডফ্রিড বলে একজন জার্মান স্থপতি পরবর্তীকালে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। ইউ জী আরও বললেন বাঙ্গালোরের অনেক বন্ধুবান্ধবের কথা, যাঁরা শ্রী রামচন্দ্র মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন বন্ধু যিনি নিয়মিত ইউ জী-কে দেখতে আসেন, তাঁর নাম জি এস মণি—কর্ণাটক ঘরানার বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ; তাঁর এবং আরও কয়েকজনের এই গুরুদেবের ওপর খুব বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তাঁরা সকলেই মিশনের সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি বললাম, পার্থসারথী রাজাগোপালাচারীর ডায়েরিতেও আমি জি এস মণির সম্পর্কে অনেক লেখা পড়েছি। আসল কথা হল, তাঁদের দুজনের মধ্যে এখন কোনও বনিবনা নেই। মজার ব্যাপার হল আমার এক

ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই জি এস মণির ভাগ্নে—এবার ইউ জী সত্যিই অবাক হলেন। বললেন, জি এস মণি, তাঁর ছেলে, ছেলেবউ আমাকে একদম ছাড়তে চান না, বাঙ্গালোরে বা মাদ্রাজে গেলে তাঁরা সবসময় আশপাশে থাকেন। আমি ইউ জী-কে হাসতে হাসতে বললাম, Sir, the world is very small now. ইউ জী অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে বললেন, Yea, yea.

গাড়ি প্রায় পাম স্প্রীং থেকে লস এঞ্জেলেসের মাঝামাঝি—এই ক'দিনেই আমি এই পথে অনেকবার যাতায়াত করেছি। পিছনের সিটে মহেশ ভাট জুলীকে বললেন, এই ভদ্রলোক আমেরিকায় এসে অনেক বয়সে গাড়ি চালানো শিখেছেন, অথচ রীতিমতো ভালো হাত। ইউ জী বললেন, আমি কি এমনি এমনি বলেছি যে এবার থেকে গুহাই গাড়ি চালাবেন। মনে হল ইউ জী যখনই সুযোগ পান জুলীকে একটু রাগানোর চেষ্টা করেন। ইউ জী আবার আমার ভবিষ্যতের ওপর আলোচনা শুরু করলেন। আমি বললাম, আমার কাজকর্মের বাইরে সামাজিক জীবন বলতে যা বোঝায় সেটা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সংস্থার লোকজন এবং যাঁদের এইসব ব্যাপারে আগ্রহ আছে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি যখন এখানে আসি তখন আমার টিকিটটা পর্যন্ত একজন মিশনের লোকের জানাশোনা ট্রাভেল এজেন্টের মারফৎ কাটা হয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়ল ঠিক আসার আগের দিন রাতের এক মজার ঘটনার কথা। মিশনের এক তরুণ সভ্য, যিনি সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছেন, খুব উৎসাহী কর্মী, মাস্টারের খুব ঘনিষ্ঠ। যখনই সময় পান মাদ্রাজে মিশনের সভাপতির সঙ্গে গিয়ে থাকেন। তিনি সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। আমাকে 'সব্য আঙ্কেল' বলে ডাকেন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু একা একা কথা বলতে চান। আমি বললাম, চলুন বাইরে এখন খুব সুন্দর আবহাওয়া, ঘুরতে ঘুরতে আলোচনা করা যাবে। আমাকে তিনি খুব সম্মান করেন, আমার মতামতের ওপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আমরা দু'জনে প্রথমে হালকা কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি বেশ কিছুদিন ধরে মিশনের ক্রিয়াকলাপে এমনকী সৎসঙ্গে ধ্যান করার ব্যাপারেও একেবারে উদাসীন? আমার যদি মিশনের আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডে বা কর্মপদ্ধতিতে কোনও মতানৈক্য থাকে তাহলে আমি মিশনের সভাপতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছি না কেন? তিনি নিজে আমাকে দিয়ে মাস্টারের সঙ্গে কথা বলাতে রাজি আছেন। আরও বললেন, শুনলাম আপনি দু'সপ্তাহের জন্য

বাইরে যাচ্ছেন একা একা সময় কাটানোর জন্য। যদি ইচ্ছা করেন এখনও সময় আছে, টিকিট বদলে মাস্টারের কাছে গিয়ে থাকুন। তাঁর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে এবং খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারেন আপনার অনীহার কারণগুলো নিয়ে। হয়তো এতে শুধু আপনার নয়, আমাদেরও অনেক উপকার হতে পারে। আমাদের এখানে প্রিসেপ্টারদের মধ্যে নানা রকমের মতানৈক্য আছে, কেউ কেউ হয়তো আপনার কাছে পরস্পরের কাজকর্ম নিয়ে অনেক নিন্দা-সমালোচনাও করেছেন। হয়তো আপনার আগ্রহের মধ্যে দিয়ে সেইসব সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনার আগ্রহ গভীর এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও খুব স্বচ্ছ, মাস্টার আপনার মতো লোকেরই সন্ধান করেন।

আমি তাঁর এক নিঃশ্বাসে বলা কথাগুলি শুনে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। ইউ জী-কে বললাম, আমি সেই ভদ্রলোককে কী উত্তর দিয়েছিলাম জানেন? আমি বলেছিলাম, আপাতত আমার মিশনের কাজকর্ম নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, আমার ব্যাপারটা আসলে অনেক গোড়ার চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িত। আমি এসব নিয়ে এখনই কোনও মতামত জানাতে রাজি নই—সত্যি কথা হল, আমি একটা নতুন বিষয় পেয়েছি এবং সেইসব নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা চালাচ্ছি। আমার কাছে এর গুরুত্ব এতই অসাধারণ যে অন্য কোনও চিন্তাভাবনা আমার মাথায় জায়গা করতে পারছে না। এবার ইউ জী আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা সবাই শুনি আপনার নবতম গবেষণার বিষয়বস্তুটা কী? আমি ইউ জী-র চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে গবেষণার ফল কালে কালে প্রকাশিত হবেই।

আমরা সবাই চুপ করে বসে আছি। যদিও ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইলের উপর গাড়ি চালানো নিষেধ তবুও গাড়ির গতিনির্ধারক যন্ত্রের কাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা ঘণ্টায় অন্তত নব্বই মাইল বেগে চলেছি, অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি যেকোনও সময় আসতে পারে, আর শাস্তিটা সে-ই পায় যে গাড়িটা চালাচ্ছে, এক্ষেত্রে আমি। আমার কেমন মরিয়া, বেপরোয়া একটা ভাব অথচ একটা কৌতূহল সবসময় মাথায় ঘুরঘুর করছে—আমার জীবনযাত্রা এবার কোন পথে যাবে। একটা দারুণ উত্তেজনা কোথায় যেন চেতনার গহন গভীরে কিছু অমূল্য রতন পাওয়ার সম্ভাবনার আনন্দে মাঝে মাঝে সবকিছুকে ছাপিয়ে আমাকে আবেগের উচ্চ শিখরে এনে

হাজির করছিল, মনে হচ্ছিল, যে সামনে আছে তাকেই জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে দিই। পাম স্প্রীং-এর অসাধারণ অভিজ্ঞতা স্মরণে আসতেই এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে আমার শরীর ধীরগতিতে আন্দোলিত হতে লাগল। আধ্যাত্মিক অন্বেষণের এই পর্বটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—কেন মাঝে মাঝে এই অহেতুক আনন্দের জোয়ার আমার মধ্যে প্রগল্‌ভতার জন্ম দিচ্ছিল তাই ভাববার চেষ্টা করছি—হঠাৎ ইউ জী স্তব্ধতার অবসান ঘটালেন, আমার চিন্তার গতি পরিবর্তিত হল। আমার দিকে তাকিয়ে ইউ জী বললেন, আসল কথা কি জানেন, এবার আপনাকে ঠিক করতে হবে বাড়ি ফিরে কীভাবে জীবনযাপন করবেন। ইউ জী-র এই মন্তব্য আমার ভাবনাকে অন্যপথে নিয়ে গেল। আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল এক অদ্ভুত জীবনকাহিনি।

এক ভদ্রলোক সংসারের সচ্ছলতা আনতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ বানাবার চাপে বিয়ে-থা করার ব্যাপারে ভাববার সুযোগ পাননি। অবশেষে বাড়ির এবং আত্মীয়স্বজনের চাপে বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেলেন। পাত্রী ঠিক হল, বাড়ির সবার পছন্দ, তারিখ পাকা, কেনাকাটা চলছে। সবাই খুশি, সবকিছুই ভালোভাবে এগোচ্ছে, যদিও মনে মনে আশঙ্কা ছিল যার সঙ্গে বাদবাকি জীবন কাটাতে হবে তার ওপর তার সেরকম কোনও টান নেই। এইসবের মধ্যে হঠাৎ একদিন আরেক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই যেন কোনও পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের ষড়যন্ত্রের খেলায় প্রেমের নেশা রক্তে প্রবেশ করল। কোনওভাবেই ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে পারলেন না। এবার তিনি কী করবেন? একদিকে সামাজিক প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে প্রেম। হাসতে হাসতে আমার গাড়ি চালানো প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তাঁরা খোলা চোয়াল বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। নির্ঘাত ভাবতে লাগলেন গুহকে বোধহয় পাগলামির রোগে ধরেছে। আমি হাসতে হাসতেই বললাম, জানি এরপর কী হবে। আমি বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে মিশনের সভাপতি মাস্টারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুনয়-বিনয় করবেন। আমি তাঁদেরকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব যে আমি ধ্যান, প্রার্থনা এমনকী আধ্যাত্মিকতাতেও আর বিশ্বাস করি না। তাঁরা সেইসব মেনে নেবেন না, আমার কথায় তাঁরা রাজি হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে খুব অনুরোধ করবেন এবং সবাই মিলে একটাই কথা

বলবেন—আপনি একবার শুধু মাস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করে আসুন। মনে মনে ভাবলাম আমি একথাও জানি মাস্টার আমাকে কী বলবেন। এই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ঠিকভাবে চলতে হলে, ভালো সাধক হতে হলে কীভাবে অভ্যাস এবং গভীর বিশ্বাস নিজের মধ্যে বজায় রাখতে হবে। এইসব শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে সত্যি বলছি আমার কান পচে গেছে। এইসব রাস্তা এখন দাঁত বার করা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার কাছে সমস্ত রাস্তাগুলো চোরাগলি বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে যে কোনও লাভ নেই সেই কথা আমার পরিষ্কারভাবে জানা হয়ে গেছে। লক্ষ্য যদি অবর্ণনীয়, অজ্ঞেয়, অচিন্তনীয় হয় তবে কি তার কোনও পথ থাকা সম্ভব? কোনও রাস্তা নেই, কোনও একটা রাস্তা ধরে এগোলে কিছু ঘটার আশা আছে—এইরকম কোনও চিন্তা তাই আর আমার মাথায় জায়গা করতে পারে না। গুরুর প্রতিটি উপদেশের ফলস্বরূপ যেসব কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা আছে, তা আমি আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। অতএব আমার ভেতর থেকে এইসব কাজকর্মে আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগছে না।

ইউ জী আমায় বললেন, আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন? আমি বললাম, যেটা আমার ভদ্রতার খাতিরে করা উচিত বলে মনে হচ্ছে তা হল পার্থসারথী রাজাগোপালাচারীর কাছে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানানো। আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের একটা পর্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বিনীত প্রণাম জানিয়ে সসম্মানে বিদায়গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠিটা শেষ করতে চাই। তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমার জীবনে মিশনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে অবশ্য ইউ জী উলটোটাই বললেন। তিনি বললেন, আমি যদি আপনার জায়গায় এমন অবস্থায় থাকতাম তাহলে আমি একেবারে চুপচাপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করতাম। তার কারণ হল, ধরুন আপনি ঠিক করলেন একটা চিঠি লিখবেন এবং চিঠি লিখলেন। এবার যদি আপনি এই কথা ভাবেন যে এখানেই সব শেষ হয়ে গেল তাহলে কিন্তু খুবই ভুল করবেন। দম ফেলতে না ফেলতেই দেখবেন আপনি আপনার গুরুদেবের পত্র পেয়েছেন। আপনার হঠাৎ এই ধরনের মনোভাবের কারণ কী সেইসবের উত্তর চেয়ে পাঠানো হয়েছে, অথবা আপনাকে যথাশীঘ্রসম্ভব গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে অথবা অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা জানিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার মৃদু আদেশ

এসেছে। আপনি আবার দুশ্চিন্তায় পড়বেন, চিঠি লেখার আগে যেখানে ছিলেন আবার সেখানে এসে হাজির হবেন। অর্থাৎ আবার ভেবে দেখতে হবে এবার আপনি কী করবেন। আরেকটা চিঠি লিখে বিস্তারিতভাবে সবকিছু ভালো করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইবেন, না চুপচাপ কোনওরকম উত্তর না দিয়ে সবকিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। এই প্রেক্ষিতে আপনাকে একটা মজার কাহিনি শোনাই। মহেশ ভাট এবং তাঁর ভূতপূর্ব গুরু শ্রী রজনীশের কাহিনি।

বেশ কিছুদিন ধরে রজনীশ এবং তাঁর অত্যন্ত কাছের শিষ্যরা লক্ষ্য করলেন যে অনেক শিষ্য হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। রজনীশ খুব চিন্তিত, কিছু শিষ্যদের মধ্যে উদাসীন ভাবটাও লক্ষ্য করলেন। এইরকম একটা সময়ে আশ্রমে খবর এল যে মহেশ ভাট রজনীশের নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দেওয়া মালা শৌচালয়ের কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন—মালা চিরতরে অদৃশ্য! রজনীশ ভয়ংকররূপে ক্রুদ্ধ, তিনি জানতেন যে মুম্বইয়ের বিখ্যাত চিত্রতারকা বিনোদ খান্না মহেশের পেয়ারের দোস্ত, তাই বিনোদ খান্নাকে ডেকে বললেন, যা শুনছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে মহেশ এটা অত্যন্ত কাপুরুষের মতো কাজ করেছে, মহেশকে একদিন গভীর অনুশোচনা করতে হবে। ওর যদি এসব আর ভালো না লাগে তাহলে অন্তত আমার সঙ্গে দেখা করে নিজের হাতে মালাটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারত—তুমি ওকে গিয়ে বলো যে আমি ওর জীবনটাকে দুর্বিষহ করে ছাড়ব... ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে মুম্বইয়ের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিজয় আনন্দ, দেব আনন্দের ভাই, রজনীশের পরম ভক্ত এবং শিষ্য আমার কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেললেন, রজনীশের ছত্রতলে বসে সাধনার পর্ব সমাপ্ত, তাঁর ধ্যান করার দিন ফুরিয়ে গেছে। রজনীশের সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক শেষ করতে চান। মনে মনে ঠিক করলেন, মহেশ ভাটের মতো হঠকারিতা করবেন না কিন্তু নিজে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজের হাতে মালাটা তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন। আজ আমি যেমন আপনাকে বলছি ঠিক সেইভাবে সেদিন বিজয় আনন্দকে বলেছিলাম এইসবের কোনও অর্থ নেই, এইসব হল সামাজিক অভিমানের ফল, আপনার যে জিনিসের ওপর গভীর নিষ্ঠা সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব হল বালকসুলভ চপলতা, এইসব না করে একেবারে চুপচাপ থাকাটাই শ্রেয়। বিজয় আনন্দ আমার পরামর্শে রাজি হলেন না—তিনি ঠিক করলেন তিনি নিজের হাতে রজনীশের মালা ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন।

রজনীশপুরমে খবর চলে গেছে এবার বিজয় আনন্দ আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চান, তবে তিনি ভগবান রজনীশের সঙ্গে দেখা করে নিজের মুখে সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা করবেন। বিজয় আনন্দ আশ্রমে গেলেন এবং খবর পাঠালেন যে রজনীশের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবেন। রজনীশ থেকে শুরু করে আশ্রমের কোনও লোকই তাঁকে পাত্তা দিলেন না, এমনকী রজনীশের সঙ্গে দেখা করারও সুযোগ দিলেন না। বিজয় আনন্দ বেশ অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। পরে আমাকে বললেন, আপনার কথা শুনলে আমাকে অযথা এইরকম অপদস্থ হতে হতো না। আমি বললাম, আসল কথা কি জানেন, গুরুরা যতই নিষ্কাম প্রেমের কথা বলুক না কেন কেউ যদি আশ্রম ছেড়ে চলে যান বা গুরুর আহ্বান প্রত্যাখান করেন তাহলে ভেতরে ভেতরে তাঁরা একজন সাধারণ প্রেমীর মতোই জ্বলে-পুড়ে মরেন—অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে থাকেন। আমি রজনীশের জায়গায় থাকলে বলতাম আরেকটা লেঠা চুকল, কিছু বোঝা হালকা হল। এইসব ঘটনা শোনার পর মনে মনে ভাবলাম আমি একেবারে চুপচাপ থাকব—কোনও পদক্ষেপ নেব না। গীতায় নাকি আছে কখনও কখনও কোনও কাজে প্রবৃত্ত না হওয়াটাই নাকি সবচেয়ে মহান কর্ম (Inaction is sometimes the greatest action.)।

১৬.

আমরা প্রায় লস এঞ্জেলেসের কাছাকাছি চলে এসেছি, গাড়ি বোধহয় এখানে খুব ধীরগতিতে চলে, সামনে পিছনে গাড়ির সমুদ্র। পাশাপাশি পাঁচটা গাড়ি চলতে পারে একই দিকে, কোনও ট্রাফিক লাইট নেই, তাও এইরকম জ্যাম, ভাবছি কত গাড়ি চলে এখানে। এদেশের লোকেরা পেট্রোল ব্যবহার করে জলের মতো। এক গ্যালন দুধের দামও এক গ্যালন পেট্রোলের দামের থেকে বেশি। আমাদের দেশের লোকেদের একই প্রফেশনে আয় এই দেশের লোকেদের তুলনায় প্রায় পঁচিশগুণ কম, অথচ আমাদের দেশে পেট্রোলের দাম আমেরিকার তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি। এদেশের পেট্রোলের এই বিশাল চাহিদা বজায় রাখা এবং দাম কমিয়ে রাখার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে আরব দেশের সঙ্গে তাদের নানারকম সম্পর্ক—আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রের প্রগতি এবং অসাধারণ শক্তির নমুনা তারা এইসব দেশকে সবসময় ভালোভাবে অবগত রাখে—আরব দেশগুলোর একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়াটা বজায় থাকলে এই ব্যাপারটা আরও সুবিধাজনক হয়। টাকার জোর আর বন্দুকের জোর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের অভিমান আমাদের এইভাবে ভাবতে দিতে চায় না—আমরা একথা ভাবতেও চাই না যে আধুনিক বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলোর কাছে ভারতবর্ষের সেইরকম কোনও ভূমিকা নেই। তবে হ্যাঁ, ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত জনতা, সংখ্যাগত দিক দিয়ে এত বেশি যে ভারতবর্ষ ব্যবসায়ের একটা বিশাল বাজার, ভারতবাসীদের প্রয়োজনকে কাজে লাগাতে পারলে, বিশাল বিশাল কোম্পানির অসাধারণ লাভ হতে পারে, এই কথাটা সব দেশই মাথায় রাখে।

আমার মাথায় বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারা বয়ে চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ল ইউ জী-র জীবনে নাকি সাত সংখ্যাটার এক অভাবনীয় প্রভাব আছে। প্রভাব বললে ভুল হবে, তাৎপর্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহেশ ভাট এক জায়গায় লিখেছেন সাত সংখ্যাটার সঙ্গে আপনার জীবনের ঘটনাবলীর নাকি অদ্ভুত একটা সম্পর্ক আছে? শুধু তাই নয় সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ঠিক ঠিক উনপঞ্চাশ

বছর বয়সে আপনার জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির ঘটনাটা ঘটে। ইউ জী বললেন, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতায় সাত সংখ্যাটার একটা রহস্যজনক তাৎপর্য আছে। আমি বললাম, হিন্দু আধ্যাত্মিকতায় সাতটি চক্র আছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার। ইউ জী বললেন, আসলে শাস্ত্রে যেসব কাল্পনিক চক্রের উল্লেখ আছে, বিভিন্ন ধরনের পদ্ম এবং তাদের রংবেরঙের পাপড়ি, সেসব একেবারেই মনগড়া কাহিনি, অথচ আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু গ্ল্যান্ড আছে যেগুলোর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। তবে এই সব পরিবর্তন কী ধরনের তার কোনও সঠিক ধারণা মানুষের একেবারেই জানা নেই। ইউ জী এইসব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আর আমি ভাবছি সাত সংখ্যাটা নিয়ে।

ভাবনা ব্যাপারটাই এরকম। মানুষ প্রথমে এবং আপাতদৃষ্টিতে নিজেকেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানে এবং নিজের জীবনের ঘটনাবলী সবচেয়ে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে। নিজের জীবনে এই সাত সংখ্যাটার কোনও তাৎপর্য আছে কি না সেটা দেখার চেষ্টা করলাম। মনে হল ব্যাপারটা কাকতালীয়—হঠাৎ এমন সব মিল খুঁজে পেলাম যে আমার দেহের লোমকূপগুলো শিরশির করে জেগে উঠে আমার স্পর্শানুভূতিকে এক অভাবনীয় পর্যায়ে এনে হাজির করল। শুধু তাই নয় আমার জন্ম সাল সাত সংখ্যার গুণিতক, আমি যখন আশ্রমবাসী হই তখন আমার বয়স চোদ্দ। একুশ বছর বয়সে আমি পড়াশুনা, ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের কাজে নামি, অবশেষে বেনারসে এসে অজ্ঞাতবাসী হয়ে জীবনের তাৎপর্য বোঝার সংগ্রাম শুরু হয়। আঠাশ বছর বয়সে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা আমাকে আধ্যাত্মিক দিকে টেনে নেয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমি আমেরিকায় আসি এবং বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমার ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ইউ জী-কে বললাম, আমি এইসব কোনওদিন ভাবিনি, আপনার সঙ্গে এইসব আলোচনার আগে আমি সাত সংখ্যাটার যে বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে তাও জানতাম না। ইউ জী মুচকি হেসে বললেন, আপনার জীবনেও সাতের প্রভাব, আশ্চর্য! আমি বললাম শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের মধ্যেও সাতের খেলা। আমার যখন জন্ম হয় তখন আপনার বয়স পঁয়ত্রিশ। আপনার যখন জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি হয় তখন আমার বয়েস চোদ্দ। আমি যখন আপনার দর্শন পাই তখন আপনার বয়েস সাতাত্তর। তারপর আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি জানি আপনি বলবেন মানুষের মন খুব কৌশলে এইসব খোঁজে যাতে এইরকম কিছু সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। ইউ

জী নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। বুঝলাম না মহেশ ভাট এবং জুলীর মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হল কি না—হয়তো তাঁরা তাঁদের জীবনে সাত খুঁজে পাওয়ার চিন্তায় নিমগ্ন।

বুকের ভেতর একটা অস্বস্তিকর চাপ অনুভব করছি, ঢোক গিলতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আমি মনে করার চেষ্টা করছি কোথায় কীভাবে এসবের সূত্রপাত হল! সেই একদিন সকালবেলা ইউ জী-র হাতের রেখা বিশ্লেষণ করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছিল একটা উষ্ণ স্রোত দু'হাত বয়ে বুকের মধ্যে মিশে যাচ্ছে—এর তীব্রতা এমনই ভ্রান্তিহীন ছিল যে সেদিন আমার মনে হয়েছিল কেউ যেন আমার ধমনিতে আফিমের রস মিশিয়ে দিচ্ছে। তারপর লাস ভেগাসে এক ভোররাতে বুকের ভেতর প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে আর্তনাদ ভরা সেই কান্না—কে জানে কোথায় কীসের শুরু হয়! তবে এখন মনে হচ্ছে বুকের ভেতর একটা পিণ্ডাকার কিছু অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, এর গতিপ্রকৃতি একেবারেই অনিশ্চিত, কখনও তীব্র, কখনও মৃদু-গভীর আবার কখনও একেবারেই স্তব্ধ। যখনই এই অজ্ঞাত স্পন্দনটা বৃদ্ধি পায় তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাঘাতকারী এক অভিনব চাপের সৃষ্টি হয়। আমি হঠাৎ পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে জুলী এবং মহেশ ভাটকে বললাম, বুকের ভেতর কি যেন একটা ক্রমাগত মোচড় দিচ্ছে। মহেশ ভাট কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভায়া, এ মোচড় আর কোনওদিন বন্ধ হবে না। আমি আরও হতবাক হয়ে গেলাম—যদিও জুলী এবং ইউ জী কোনও মন্তব্য করলেন না—তাহলে এঁরা সবাই এইসব জানেন—কিন্তু কী জানেন?

আমরা সবাই সান্টামনিকা সাগর সৈকতের সেই হোটেলে আবার এসে হাজির হলাম, যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা রুম নেওয়া হল—সবাই একটু শুয়ে বসে জিরিয়ে নিতে চায়, সামনে দীর্ঘ বিমান সফর। ঘুমে আমার চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমাকে আমার ভেতরে হারিয়ে যেতে বাধ্য করছে। সবাইকে বললাম আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে, আমি বরঞ্চ একটু ঘুমিয়ে নিই। বসার ঘরেই একটা বিছানা ছিল, আমি সেখানেই সটান শুয়ে পড়লাম। কোথায় হারিয়ে গেলাম কোনও হিসেব রইল না। ঘুম থেকে উঠে আমি এটাও মনে করতে পারছিলাম না যে কোথায় আছি এবং সেখানে কী করছি। মহেশবাবুর গলার স্বরে ধীরে ধীরে সব মনে পড়তে লাগল, শুনলাম তিনি

বললেন, আপনি যে মৃতের মতো এক ঘণ্টা ঘুমোলেন সেটা কি টের পেয়েছেন? আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম মিনিট পাঁচেক শবাসন করেছি। আমি হাতমুখ ধুয়ে এসে মহেশ ভাটকে বললাম আমার কেমন অদ্ভুত লাগছে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে, সবসময় পিপাসা লাগছে, যেন কোনও প্রক্রিয়া আমার দেহের জল শোষণ করে আমাকে একটা নীরস তরুবরে রূপান্তরিত করে ফেলছে। অথচ আমি কোনও হদিস খুঁজে পাচ্ছি না, সে যাই হোক কিন্তু আপনার কাছে আমি একটা ব্যাপারে একটু পরামর্শ চাই। আপনি ইউ জী-কে বহুদিন ধরে জানেন এবং ইউ জী সম্পর্কে আপনার অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান আছে, আপনার কী মনে হয়, আমার কী ধরনের কর্মপ্রচেষ্টায় মনোযোগ দেওয়া উচিত? মহেশবাবু আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন, তারপর ইউ জী-র দিকে তাকালেন এবং অবশেষে বললেন, বাড়ি ফিরে আপনি যে কাজ করতেন সেই কাজই আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে করার চেষ্টা করুন। আমার অবশ্য এই পরামর্শ একটুও ভালো লাগল না, কারণ আমার শুধু মনে হচ্ছে কীভাবে ইউ জী-র সান্নিধ্য বাড়ানো যায়, কাজকর্মের কথা একদম মাথায় জায়গা পাচ্ছে না। অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তি আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ইউ জী-র সাথে আবার কবে এবং কোথায় দেখা হতে পারে সেই কথা সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম। ইউ জী বললেন, আমি অগাস্ট মাসের শেষ অবধি সুইজারল্যান্ড থাকব তারপর জানি না, সম্ভবত ভারতের দিকে যাব। মহেশ ভাট বললেন, গরমের ছুটিতে একবার সুইজারল্যান্ড চলে আসুন, সেখানে ইউ জী-র জন্মদিনে অনেকেই থাকবেন। বেশ মজা করা যাবে, অনেক আড্ডা মারা যাবে—ইউ জী-র জন্মদিন জুলাই মাসের ৯ তারিখে। আমার ইমিগ্রেশনের কথা ইউ জী জানেন কিন্তু মহেশবাবুর জানা নেই, বললাম গ্রিন কার্ডের প্রসেস শুরু হয়ে গেছে তাই দু-তিন মাসের মধ্যে আমেরিকার বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। গরমের ছুটিতে এ বছর আমি সুইজারল্যান্ড যেতে পারব না—জানি মনটা খুব উচাটন হয়ে থাকবে। যদি ইউ জী সেপ্টেম্বরে ভারত যান এবং ততদিনে আমার গ্রিন কার্ড হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই সময় ভারতে গিয়ে ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটাতে পারব। এইসব কথা ভাবছি আর ভেতরে ভেতরে একটা দুঃখ জমতে শুরু করছে, একটা বিদায়-বেদনা দানা বাঁধছে—কেন বুড়োর ওপর এত টান জন্মালো বুঝতে পারছি না। মহেশ ভাট আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এদেশে প্রায় আট বছর ধরে আছেন অথচ এখনও গ্রিন কার্ড হয়নি কেন? আমি বললাম সে এক লম্বা কাহিনি। ইউ জী

বললেন এই ভদ্রলোকের অদ্ভুত সব মানসিকতা— দেশপ্রেমিক, ভারতে ফিরে যাওয়ার চিন্তায় বাতিকগ্রস্ত। এদেশে পয়সা-কড়ি-সম্মান কামাচ্ছেন অথচ সবসময় মাথায় এক চিন্তা কীভাবে আবার ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া যায়। বলুন মহেশ ভাটকে আপনার গল্প।

আমেরিকায় গবেষণা করতে করতে আমার সবসময় মনে হতো, আমি এখানকার বাসিন্দা নই। এখানকার লোকজনের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কোনওদিনই গড়ে উঠবে না। আমার যাতে গভীর আগ্রহ সেইসব নিয়ে কথা বলার কোনও লোকজন নেই, যে সমস্ত কাজে আগে ভীষণ উৎসাহ ছিল, সেইসবে কোনও প্রাণ খুঁজে পাই না। আপাতত শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করা। আমাদের অস্তিত্বের রহস্য যে কোনওদিন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা সমাধান হবে তার সমস্ত রকম আশা আমার মন থেকে অনেকদিন আগেই মুছে গিয়েছিল। বিবর্তন তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে যত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তা সত্যিই অভাবনীয়। কিন্তু মানুষের মনে যে অশান্তি, যে কষ্ট, যে দ্বন্দ্ব সেই সবের মূল কারণ কি জানা সম্ভব? আর কারণ জানলেই কি সেই সমস্যার সমাধান হয়? এইসবের প্রহার থেকে নিস্তারের একটা আশা মনে মনে সযত্নে লালন করতাম আর তা হল আধ্যাত্মিকতা। ঠিক করেছিলাম সংসারের একটা খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে বাদবাকি জীবনটা আধ্যাত্মিক সাধনায় সমর্পণ করে দেব। বহুদিন ধরে আমি একটা আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত, অনেক সাধনা করেছি, এখন ইচ্ছা এর মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মাতৃভূমিতে ফিরেই সাধনায় নিমগ্ন হব। ইতিমধ্যে আমার সামনে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়, সেটা হল আমেরিকায় আমার থাকার মেয়াদ। আমার গবেষণার দলের প্রধান অধ্যাপক আমাকে তাঁদের দলের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করেছেন এবং আমাকে আরও কয়েক বছর থাকতে হলে গ্রিন কার্ড নিতে হবে একথাও তিনি অনেকবার বলেছেন। একবার গ্রিন কার্ড পেলে আমি যতদিন ইচ্ছা ততদিন আমেরিকায় থাকতে পারব। আমার ফিরে যাওয়ার ঝোঁক এত বেশি যে আমি গ্রিন কার্ড নিতে পর্যন্ত রাজি হলাম না। পাছে পরিবারের চাপে আমেরিকায় থেকে যেতে হয়। অধ্যাপকের কথা আমি গ্রাহ্য করলাম না—স্বাভাবিকভাবে যখন আমেরিকায় থাকার সময়সীমা পার হয়ে যাবে তখন দেশে ফিরে যাব—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। আমেরিকায় থাকার

মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল আর ঠিক তখন আমার জীবনের আকাশে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি নামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে।

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি আমার কথা শুনে আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনওরকম মন্তব্য করলেন না, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরক্তিভরা হতাশাজনক মন্তব্য করলেন, তাতে অবশ্য আমিও একমত। শেষে বললেন, ভারতবর্ষের এমন করুণ অবস্থা যে আপনাদের মতো লোকেদের কাজে লাগাতে পারে না। আমার কখনও অবশ্য সেই কথা মনে আসেনি, আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছি, বরঞ্চ আমিই স্বার্থপর। আমার দেশ আমায় শিক্ষিত করতে অনেক টাকাপয়সা খরচ করেছে, আমার বরঞ্চ সেই সবের প্রতিদান দেওয়া উচিত। আমেরিকায় একজনকে ডক্টরেট হতে হলে প্রচুর পয়সা খরচ করতে হয়, সেই তুলনায় ভারতের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বিনা পয়সায় পড়াশুনা হয়। যাই হোক ইউ জী-র মন্তব্য হল, কেউ যদি তাঁর নিজের দেশে এমন সুযোগ পায় যা অন্যান্য দেশের সমতুল্য তাহলে খুব কম উচ্চশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবে। অন্যান্য দেশ যদি বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয় তাহলে লোকজন চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। আমি মনে মনে ভাবলাম বিবর্তনের চাপটাই হয়তো এইরকম, সমস্ত জীবজগৎ তার জীবনধারনের জন্য কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে যেখানে বেঁচে থাকাটা তুলনামূলকভাবে সহজ।

এক মাস হল আমার ইউ জী-র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এর মধ্যেই তিনি তাঁর সুর পালটে ফেলেছেন, আমাকে অযথা অভিমান থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছেন। তাঁর লেগে থাকার ক্ষমতা এতো অসাধারণ যে এই এক মাসের মধ্যেই আমার ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার সমস্ত সিদ্ধান্ত একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। সুযোগ পেলেই ক্রমাগত আক্রমণ করেন এবং আমার স্ত্রী-কন্যাদেরও তাঁর দলে টেনে নিলেন। এমনিতেই আমার কন্যাদের ভারতবর্ষের ওপর কোনও টান নেই, তারা এখানেই জন্মেছে। আমি অবশ্য নিজের ছোটবেলার কথা ভাবি আর তাদের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করি। আমার বাবা সবসময় পূর্ববঙ্গের (তখন পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ) কথা, বরিশালের কথা বলতেন। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও অনুভূতি জাগত না, আমার বন্ধুবান্ধবরাই ছিল আমার সমস্ত আকর্ষণ। তাই

মেয়েরা ইউ জী-কে দাদুর মতো ভালোবাসতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে আমি আমার অধ্যাপককে গিয়ে বললাম, আমি গ্রিন কার্ড নিতে রাজি আছি। অধ্যাপক আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তিনি উঠেপড়ে লেগে গেলেন, হাতে খুব কম সময় আছে এবং গ্রিন কার্ডের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। দেখা যাক কী হয়। সব শোনার পর মহেশ ভাট বললেন এবার বোঝা গেল কেন আপনি এখন আমেরিকার বাইরে যাবেন না।

মহেশ ভাট ইউ জী-র দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা স্যার এই একটা জিনিস আমি সবসময় লক্ষ্য করে আসছি, আপনার আশপাশে যারা থাকে তাদের মধ্যে কেমন একটা পাগলামির লক্ষণ দেখা যায়। আপনার মধ্যে এমন কী আছে যাতে পাগলরা খুব আকর্ষণ বোধ করেন? আমি মহেশবাবুকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এই প্রশ্নটা কেন, আপনি আমার মস্তিষ্কের কোনও বিকৃতির আভাস দেখতে পেলেন নাকি! মহিশ ভাট উত্তরে বললেন, আমি কত লোক দেখেছি যাঁরা আমেরিকায় আসার জন্য পাগল এবং যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উঠেপড়ে লেগে যান কীভাবে এদেশে চিরস্থায়ী হওয়া যায়, আর আপনাকে ওরা চিরস্থায়ী করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। অথচ আপনি সেই ব্যাপারে এতদিন ধরে উদাসীন আছেন, একে আমি মস্তিষ্কবিকার ছাড়া আর কী বলতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞান?

আমাদের হাতে আর ঘণ্টাদুয়েক সময় আছে, ইউ জী মহেশ ভাট এবং জুলী থেয়ারকে বললেন, আপনাদের যদি শেষ মিনিটের কেনাকাটা বা বাজার করার কিছু থাকে তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, আমি এবং গুহ একটু সাগরপারে পায়চারি করতে যাব। আমরা দু'জনে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ সৈকতে এসে হাজির হলাম। সমুদ্রের পাড়ে আজ হাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে, ঢেউগুলো খুব ছোট ছোট, আকাশে ঝকঝকে সূর্য, বাতাসে ভেজা ভেজা গন্ধ। আমার মনে পড়ছে দীঘার সমুদ্র সৈকতের কথা, কিন্তু এখানে সবকিছু এতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে মনেই হচ্ছিল না আমরা সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জলের পর বালি, তারপর রাস্তা এবং রাস্তার পর কিছুটা খালি জায়গা, সেখানে বসার জন্য কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে সারি সারি বেঞ্চ। চোখে পড়ল মাঝে মাঝে সেই বেঞ্চে শুয়ে আছে গৃহহীন লোকজন, তাদের মাথার কাছে একটা

পুঁটলিতে হয়তো রয়েছে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। ইউ জী আমাকে এই রকম কয়েকজন শুয়ে-বসে থাকা লোকজন দেখালেন এবং অনেক রকম মন্তব্য করলেন। বেঞ্চের পর ছোট রেলিং, তারপর ফুটপাত, তারপর বিশাল রাস্তা। রাস্তার ওপারে গগনচুম্বী ইমারত, অনেক পাঁচতারা হোটেল, বিশাল বিশাল সব দোকান। সারি সারি এই দোকানে কতই না মূল্যবান সামগ্রী। এমন অনেক পোশাক এইসব দোকানে পাওয়া যায় যার মূল্য আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের বাৎসরিক আয়ের থেকে অনেক বেশি। মনে মনে ভাবলাম, প্রগতি ব্যাপারটা কী? রাস্তার এপারে ধনধৌলতের এমন আতিশয্য আর ওপারে বেঞ্চে শুয়ে আছে সহায়সম্বলহীন অনাথ অনিকেত মানুষ। যতদিন পর্যন্ত এইরকম একজন লোকও এখানে রাত কাটাবে ততদিন পর্যন্ত এই প্রগতির মূল্যায়ন চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে কীভাবে নির্ধারিত হবে!

বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশের নেতারা মানবিকতা মানবিকতা করে খুব চিৎকার করেন। ভাবতে মজা লাগে কীভাবে তাঁরা পাঁচতারা হোটেলে জীবনযাপন করেন এবং এইসব দেখেও মানবিকতার কথা বলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের ওইরকম জীবনযাত্রার কোথাও যদি একটু ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন এই সমস্ত লোকেদের আসল রূপটা দেখা যায়। মানবিকতা শব্দটা ব্যবহার করার অধিকার আমাদের আছে কি না তাতেও আমার সন্দেহ। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ, মানবজাতির ভবিষ্যৎ এই সমস্ত নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছি, আর সেই ভবিষ্যতটা যে কী হবে তা বলাই বাহুল্য। এখানকার নেতারা অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক কাঠামোর ব্যাপারে অনেক রকম সমালোচনা করেন। সেখানকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ওপর গভীর সহানুভূতি জানিয়ে অনেক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেন, অথচ তাঁদের নিজেদের নাকের নিচের জঞ্জালগুলো বোধহয় তাঁদের চোখে পড়ে না। অথবা চক্ষুলজ্জা বলে কোনও শব্দ হয়তো তাঁদের অভিধানে নেই। অবশ্য এখানকার কেউ কেউ হয়তো বলবে সমাজের লোকেদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এইসব নমুনা তাদের সামনে একটা উদাহরণ হিসেবে রাখা হয়েছে, যে আপনি যদি চেষ্টা না করেন, আপনি যদি পরিশ্রম না করেন তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিণতি হবে ওই সান্টামনিকা সমুদ্র সৈকতের সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোর মতোই। আমি ভাবি এইভাবেই যদি সমাজের লোকেদের উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের প্রগতির ওপর কেন এত গর্ব! মানুষের এতো শক্তি, এতো ক্ষমতা, এতো

প্রাচুর্য, তার ওপর আছে দয়া, ধর্ম এবং মানবিকতা। আমরা চিৎকার করে বলি হৃদয়ের অনুভূতির কথা, প্রেমের কথা, জীবনের অমূল্যতার কথা—অথচ আমরা মানুষের জন্য সামান্যতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে পারি নাই। আমাদের গভীরে যদি জীবনযাপনের ধারণার আমূল পরিবর্তন না ঘটে—তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের সামাজিক রীতিনীতি হল একটা বিফল যোজনা। বিংশ শতাব্দী, কম্পিউটারে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যুগ এসে গিয়েছে, এইসব আমার কাছে ফাঁপা আওয়াজ বলে মনে হয়। প্রগতি এই পৃথিবীর কত ভাগ লোকের জীবনকে সত্যি স্পর্শ করতে পেরেছে, কত ভাগ লোকের মধ্যে স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হয়েছে, ক'টা মানুষ তৈরি করতে পেরেছে? অথচ প্রকৃতি কিভাবে সমস্ত জীবজগতের বন্দোবস্ত করেছিল! মানুষই শুধু প্রকৃতির লেনদেনের ওপর আস্থা রাখতে পারল না। মানুষ তাঁর নতুন অস্ত্র এই চিন্তাশক্তি দিয়ে নির্ধারণ করতে শুরু করল, হিসাব করতে শুরু করল, প্রকৃতির ওপর, ধরণীর ওপর কার কতটা অধিকার। মানুষের এই স্বার্থান্বেষী চিন্তার কুৎসিত দিকটা দেখার মতো সৎসাহস কি আমাদের আছে! ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল কেন পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রয়োজন যা নিজের প্রজাতিকে একসঙ্গে লাখে লাখে ধ্বংস করতে পারে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা জামাকাপড়ের দোকানে ঢুকলাম। ইউ জী সাধারণত জামাকাপড়গুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন যেন পোশাকটাকে অনুভব করার চেষ্টা করছেন। যদি কখনও কোনও জামা বা প্যান্ট তাঁর ভালো লাগে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন লেবেলগুলো ভালো করে পড়ে তাঁকে বিস্তারিত বলার জন্য। প্রথমে তিনি জানতে চান, যে কাপড় দিয়ে জামা বা প্যান্টটা তৈরি হয়েছে তার সুতোগুলোর মূল উৎস কী অর্থাৎ সেটা সুতি, সিল্ক, রেয়ন, পলিস্টার, স্প্যানডেক্স বা অন্য কিছু কি না এবং অনেক সময় এইসবের সংমিশ্রণও থাকে, তাহলে তখন কোনটা কত ভাগ দিয়ে তৈরি। যেমন আশিভাগ ক্যাশ্মির উল এবং কুড়িভাগ সিল্ক খুব উৎকৃষ্ট কাপড়। অবশেষে দাম। ইউ জী সবসময় বলেন তাঁর পকেটে পয়সা না থাকলে কোনওদিন কোনও জিনিস কেনার কোনওরকম আগ্রহ তাঁর মধ্যে জাগে না। ভাবলাম, এই ধরনের চিন্তাভাবনা এবং সেইরকমভাবে জীবনযাত্রা খুবই ব্যবহারিক এবং উপযুক্ত। যদি পকেটে প্রচুর পয়সা থাকে তাহলে কী ধরনের বাসনা জাগবে? ইউ জী সর্বদা বলেন, কোনও জিনিস দু-তিনটের বেশি হলে, যদি

নতুন কিছু কেনেন তাহলে পুরানো একটা কাউকে দিয়ে দিন। ইউ জী অনেকক্ষণ দোকানে কাটালেন, কিন্তু কিছু কিনলেন না। ভেবেছিলাম যদি তিনি কিছু পছন্দ করেন তাহলে পয়সাটা আমি দেব এবং তাঁকে জিনিসটা উপহার দেব। যাই হোক সেই সুযোগ পেলাম না—তাঁর কিছু পছন্দ হল না। আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দোকান থেকে বেরিয়ে মনে হল রৌদ্রের তেজটা আরও প্রখর হয়েছে।

রোদে হাঁটতে হলে আমি আমার চশমার ওপরে একটা কালো প্লাস্টিকের অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে নিই। অভ্যাসবশত তাই করলাম, তারপর ভদ্রতার খাতিরে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি চোখের ওপর রোদের তেজ কমানোর জন্য কালো চশমা পরেন না? এর আগে লাস ভেগাসে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু তার উত্তরটা ঠিক ঠিক মনে ছিল না, যদিও জানতাম তিনি এইসব বিশ্বাস করেন না। যাই হোক, ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওইসব ফ্যাশন ডিজাইনাররা কালো চশমা বানানোর কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনাদের মাথায় হাত বুলিয়ে পকেট খালি করে এবং ডাক্তারদেরও সঙ্গে নিয়ে রাখে, যাতে কালো চশমার ব্যাপারটা দারুণ বিজ্ঞানসম্মত একটা প্রয়োজনীয় বস্তু বলে লোকেদের মনে হয়। আসল কথা হল আমাদের দেহটা এত বুদ্ধিমান যে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। বিবর্তন আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলো এমনভাবে বর্তমান অবস্থায় এনে উপস্থিত করেছে যে আমাদের চোখ আপনা-আপনিই সব কাজ করতে পারে। কতটা আলোতে কতটা খোলা থাকলে চোখের কোনও ক্ষতি হবে না একথা চোখ জানে, খুব ভালো করেই জানে। বরঞ্চ ওইসব কৃত্রিম রংবেরঙের কাচ বা প্লাস্টিকজাতীয় হাবিজাবি পদার্থ ক্রমাগত চোখের সামনে থাকলে চোখ তার সহজাত ক্ষমতাটা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে। আসল কথা কি জানেন আপনার চোখের কীসে মঙ্গল হয় সেকথা কেউ ভাবে না—যাঁরা ওইসব পরতে বলেন তাঁদের শুধু পয়সা কামানোর ধান্দা, লাভের ধান্দা। ভাবলাম এই আটাত্তর বছরের বুড়ো মানুষটা কি কঠিন একটা জিনিস, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর কঠোর মন্তব্য যেন আমার স্নায়ুতন্ত্রে এক অমোঘ শক্তি সঞ্চার করে চলেছে, আর সেই উত্তাপের অদ্ভুত অনুভূতিকে আমার মস্তিষ্ক নিউরনের মাধ্যমে এক অপূর্ব অভিনব আস্বাদনে রূপান্তরিত করছে—আমার ভাষা সে অনুভূতিকে রূপ দিতে অপরাগ। সত্যি সত্যি ইউ জী-র

সান্নিধ্যের এক অভিনব, প্রাণদায়ক, শক্তিদায়ক প্রভাব আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি—আমার জ্ঞান কিছুতেই একে বুঝে উঠতে পারছে না, আমি অবাক বিস্ময়ে সময় কাটাচ্ছি, কিন্তু এটা আমার পরীক্ষামূলক অনুভূতি, আমি হয়তো কোনওদিনই এর উৎস আবিষ্কার করতে পারব না কিন্তু এর অস্তিত্বের সত্যতা আমার কাছে থেকে কোনওদিন অবলুপ্ত হবে না। আমি আমার চশমার ওপর থেকে ঘন বাদামিরঙের অ্যাটাচমেন্টটা খুলে ফেললাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনওদিন কালো চশমা পরব না।

আমরা কালমার হোটেলে ফিরে এলাম, জুলী এবং মহেশ ভাট এতক্ষণ আমাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বিশেষ করে জুলী, যতই বিদায় নেওয়ার সময় এগিয়ে আসছে ততই যেন ইউ জী-র প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে আরও মূল্যবান হয়ে উঠছে। মনে পড়ছে ছোটবেলায় একটা কবিতা পড়তাম...যেও না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!/গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!... জুলী খুব আগ্রহভরে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলেন। ইউ জী দৃঢ়স্বরে বললেন গুহকে দেখালাম আপনাদের এই গর্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত দেশের এক অত্যন্ত আধুনিক শহরের কিছু বাসিন্দাকে, ধনকুবের-ঠাসা হলিউড যার শিরোমণি তারই কিছু বাসিন্দার সহায়সম্বলহীন অবস্থাটা—রাতে ঘুমোবার জন্য যাদের মাথার উপরে ছাদটুকুও নেই। যতদিন কোনও দেশে একটা লোকও এইরকম রাস্তায় শুয়ে রাত কাটাবে ততদিন আমার কাছে সেই দেশের প্রগতির কোনও মূল্য নেই। ইউ জী এইসব নিয়ে আর আলোচনা করতে চাইলেন না তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মৃদুস্বরে বললেন একটা দোকানে গিয়েছিলাম, কিছুই পছন্দ হল না; হয়তো গুহ আমার জন্য কিছু কিনবেন বলে ভেবেছিলেন। আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম! ইউ জী-র মেজাজটা খুব হালকা হয়ে গেল বলে মনে হল, বললেন এই সান্টামনিকা সমুদ্রসৈকতে কয়েক বছর আগে জুলীর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল—তারপর জুলীকে বলতে বললেন তাঁর কাহিনিটা।

জুলী ইউ জী-কে একটা চেক দিয়েছিলেন এবং ইউ জী যথারীতি সে চেক তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা করেছিলেন। কয়েকদিন পরে ইউ জী ব্যাংক থেকে খবর পেলেন যে জুলীর সেই চেকটা ফেরত এসেছে এবং ইউ জী-কে সেজন্য জরিমানা দিতে হয়েছে। জরিমানা দেবার জন্য যে টাকা লোকসান হল ইউ জী তার পরোয়া করেন

না, কিন্তু ব্যাংকে যে তাঁর একটা সুনাম আছে তার ওপর একটা কালো দাগ পড়েছে—এখানেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ইউ জী ভয়ানক রেগে আছেন, লোকজনের এইরকম গা-ছাড়া ভাব তাঁর পছন্দ নয়। জুলী অনেক সাহস সঞ্চয় করে ইউ জী-কে আবার চেক দিতে এলেন। ইউ জী জুলীর কাছ থেকে আর কখনও চেক নেবেন না বলে ঠিক করেছেন, জুলী বাধ্য হয়ে নগদ টাকা দিতে রাজি হলেন। ইউ জী এবং জুলী দু'জনে মিলে ব্যাংকে গেলেন সেই টাকাটা ইউ জী-র অ্যাকাউন্টে জমা দেবার জন্য। জুলী ব্যাংকের টেলারে টাকা জমা দিয়েছেন, সেখানে দেখা গেল একটা জাল নোট, কাউন্টারের ভদ্রলোক একেবারে ম্যানেজারকে ডেকে আনলেন। জুলী বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এই টাকা তিনি এটিএম (অটোমেটিক টেলার মেসিন) থেকে তুলেছেন। সাধারণত ব্যাংকের এই টাকাটা বাজেয়াপ্ত করার কথা, পুলিশে জানানোর কথা এবং তদন্ত হবার কথা এর উৎস কোথায় জানার জন্য। ম্যানেজার সেরকম কিছুই করলেন না, উলটে পরামর্শ দিলেন বাজারে চালিয়ে দেওয়ার জন্য।

জুলী এবং ইউ জী অবাক হয়ে হোটেলে ফিরে এসেছেন। ইউ জী কিছুক্ষণ একা থাকতে চান—তাই জুলী ঠিক করলেন সমুদ্রের পাড়ে হাঁটতে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে যদি কোনও ছন্নছাড়া লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে টাকাটা তাকেই দিয়ে দেবেন। ব্যাংকের ম্যানেজার নিজে যখন বাজারে চালাতে উপদেশ দিয়েছেন তাহলে এতে কোনও দোষ হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক গৃহহীন বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, জুলী তাকে টাকাটা দিতে গেলে বৃদ্ধা টাকাটা না নিয়ে জুলীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তারপর প্রায় আদেশের সুরে বললেন, আরও একশো ফুট এগিয়ে গেলে আপনার মেয়ের বয়সী এক তরুণীকে দেখতে পাবেন, তাকে আপনি এই টাকাটা দিয়ে দেবেন। কারণ আমার চেয়ে তার এই টাকাটা অনেক বেশি প্রয়োজন। জুলী প্রায় সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলেন এবং বৃদ্ধার কথামতো একজন তরুণীর দেখা মিলল। কিন্তু তাকে মোটেই সহায়-সম্বলহীন বলে মনে হল না। জুলী অনেক পরোক্ষভাবে—যাতে ভদ্রমহিলার কোনও সম্মানহানি না হয় সেইসব মাথায় রেখে—টাকাটা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তরুণী ভদ্রমহিলা নিঃসঙ্কোচে টাকাটা গ্রহণ করলেন। ঘটনাটা জুলীর খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল—ভালো লোকের সত্যিকারের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়তো ইউ জী-র মতো মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অগোচরে পদচারণা করেন।

জুলী মোটামুটি এক দৌড়ে কালমার হোটেলে ফিরে এলেন ইউ জী-কে এই কাহিনি শোনাবার জন্য। ইউ জী সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কিন্তু কাহিনি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কাজ করছিলেন আবার তাতে মনোনিবেশ করলেন—যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব, ইউ জী-র যা সহজাত অভিব্যক্তি।

ইউ জী, মহেশ ভাট, জুলী এবং আমি হোটেলের রুম থেকে আমাদের মালপত্র নিয়ে নিচে নেমে এলাম। যদিও হোটেলের লোকজন থাকে মালপত্র ঘর থেকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য কিন্তু সবারই লাগেজ এতো কম যে সেইসবের কোনও প্রয়োজন হল না। জুলী গেলেন হোটেলের ভাড়া মেটাতে আর আমি গেলাম গ্যারেজে গাড়ি আনতে। গাড়িটা এনে পার্ক করালাম যেখানে মালপত্র রাখা হয়েছে সেখানে। আবার আমাকেই গাড়ি চালাতে হবে, যদিও আমি লস এঞ্জেলেসের রাস্তাঘাট একেবারেই চিনি না—তবুও ইউ জী-র নির্দেশ। আমরা এয়ারপোর্টের দিকে গাড়ি চালালাম। জুলীর এই সমস্ত রাস্তা নখদর্পণে। তিনিই পেছনের সিটে বসে পথনির্দেশকের কাজ করতে লাগলেন।

মহেশ ভাট চিন্তাশীল লোক। যখনই কোনও বিষয় নিয়ে ইউ জী-র সঙ্গে আলোচনা করার কথা মাথায় আসে তৎক্ষণাৎ তিনি সামনের দু'টো সিটের মধ্যে দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে প্রায় তারস্বরে একবার ইউ জী বলে ডেকে ওঠেন। তারপরে শুরু হয় তাঁদের প্রায় ঝগড়া করবার সুরে কথোপকথন। আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন যে তাঁর এইরকম ব্যবহার আমার গাড়ি চালানোর মনোযোগে কোনওরকম ব্যাঘাত ঘটায় কিনা। আমার পরিবার এবং দু'মেয়েকে নিয়ে গাড়ি চালানোর অভ্যাস। মেয়েরা উচ্চস্বরে গান গায়, রেডিও চালায় আবার মায়ের বকুনি খায়, ঝগড়া করে—অতএব সহযাত্রীদের হই-হুল্লোড়ে আমার গাড়ি চালানোর কোনও ব্যাঘাত ঘটে না, এমনকী অস্বস্তিও হয় না।

মহেশ ভাটের আলোচনার বিষয়বস্তু হল এবার গরমের ছুটিতে সুইজারল্যান্ডে তিনি কবে আসবেন, এসে ক'দিন থাকবেন এবং থাকাকালীন কী ধরনের কাজ করবেন। মহেশ ভাট অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ মানুষ। একদিন কাজকর্ম কম থাকলে দারুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আর যাঁর সঙ্গে থাকবেন—এক্ষেত্রে ইউ জী—তাঁর কোনও কিছুতেই কোনও তাড়া নেই, আবার তিনি লাগামছাড়াও নন। ইউ জী-কে তিনি

সূর্যের আলোর সঙ্গে তুলনা করেন। যদি সেটা কেউ কাজে লাগাতে পারে তো সেটা যে কাজে লাগাবে তারই কৃতিত্ব। আর যদি কেউ সেটা কাজে লাগাতে না পারে তাতে সূর্যের কিছু যায় আসে না, আলোর তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। মহেশ ভাট সবসময় সমস্ত বিষয়ে ইউ জী-র মন্তব্য শোনার আগ্রহ দেখান। এমনকী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী সে বিষয়েও ইউ জী-র মন্তব্য শুনতে চান। যদি তাঁর মন্তব্য আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রমী হয় অথবা মহেশ ভাটের মনে ধরে যায় তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে একটি ডায়েরিতে টুকে নেন। তাঁদের কথোপকথনে মনে হল ইউ জী-র বহুদিনের বন্ধু বাঙ্গালোরের চন্দ্রশেখরবাবু তেলুগু ভাষায় ইউ জী সম্পর্কে একটা বই লিখেছেন এবং চন্দ্রশেখরবাবুর ইচ্ছা তিনি সে বইটা অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তি, যাঁর মাতৃভাষা তেলুগু, তাঁর সহযোগিতায় ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন। নারায়ণ মূর্তির পায়ে ক্যানসার ধরা পড়েছে। অপারেশন হয়ে গেছে। যদি গরমের ছুটির মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে খুব ভালো কথা। তিনি এবং চন্দ্রশেখর গরমের ছুটিতে অনুবাদের কাজটা করতে পারবেন; ল্যারি মরিস এবং নারায়ণ মূর্তি মহেশ ভাটকে তাঁর খবরের কাগজের নিবন্ধ লেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। গরমের ছুটিতে কাজের নেশার গুলি যে ঠিকমতো মজুদ থাকবে এবং প্রয়োজনে সরবরাহ বাড়ানো যাবে সেকথা শুনে মহেশ ভাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমরা লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে এসে হাজির হলাম।

১৭.

জুলী থেয়ারকে তাঁর গাড়ির চাবি দিয়ে দিলাম। তিনি এ গাড়ি এই এয়ারপোর্ট থেকেই দু'সপ্তাহের জন্য ভাড়া করেছিলেন। আমি তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বললাম, আপনার সেই-যে দৈবক্রমে মহানিদ্রার আগমন ঘটেছিল তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, যদিও তার পরিণতি আমাকে এই অসাধারণ দায়িত্বপূর্ণ কর্মচক্রে জড়িয়ে ফেলে। আমার এই পরম সৌভাগ্য হয়তো পূর্বনির্ধারিত ছিল—দয়া করে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। জুলী আমাকে হালকাভাবে মাথায় চাঁটি মেরে বললেন, আপনার জন্য আমি খুব খুশি, আপনার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ইউ জী-র কঠোর মনোভাবের ওপর আনে এক বিরল কোমলতা। আপনার সঙ্গে এই কয়দিনে ইউ জী-র মতন এমন একজন অসামান্য দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্বের এরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা আগে কখনও ভাবতেও পারিনি, কারণ ইউ জী সবসময় বলেন তাঁর সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। এসব দেখে আমার কী মনে হয় জানেন? হিন্দুদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক বা বন্ধন বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে তা হয়তো সম্ভব। পূর্বজন্মের ধারণা হয়তো সত্যি!

জুলীর স্নেহের এই এক অভিনব উষ্ণতা, যাঁরাই ইউ জী-র কাছে আসেন তাঁদের মঙ্গলের জন্য তাঁর হৃদয় থেকে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা। আমার ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা এক নতুন উচ্চতা লাভ করেছে। আমি অবাক হয়ে যাই তাঁর অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে, মাঝে মাঝে পরিবেশ আমাকে এসব ভাবতে বাধ্য করে—এই মার্কিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক কীভাবে এবং কেন গড়ে উঠল। ইউ জী-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এই জুলীর বাড়িতে। এবং সেদিন প্রায় সারাদিন তিনজনে একসঙ্গে সময় কাটাই। এর মধ্যে জুলী অনেকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। শুধু তাই নয়, জুলীর ধারণা, আমাদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে।

অনেকদিন পর জুলী আবার ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলেন এবং গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলেন হার্জ রেন্টাল কোম্পানির চত্বরে ভাড়া গাড়ি ফেরত দেবার জন্য। আমি ইউ জী এবং মহেশ ভাটের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইউ জী-র লাগেজ বলতে ছোট একটা স্যুটকেস। তাঁর হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে তাঁর বোঝাটা হালকা করার চেষ্টা করেছিলাম। শত হলেও আটাত্তর বছর বয়সের প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক। কিন্তু মহেশ ভাট আমার হাত থেকে ইউ জী-র স্যুটকেসটি প্রায় জোরজবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিলেন। ইউ জী আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন, মহেশ ভাট আমার সঙ্গে থাকলে আমার লাগেজ কাউকে স্পর্শ করতে দেয় না। আমি যখন দেশে ফিরি সাধারণত বোম্বেতে আসি। আর যখনই বিমানবন্দরে নামি মহেশ আগের থেকে ইমিগ্রেশন অফিসারকে বলে রাখেন যাতে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে না হয়। আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই আর-সবার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আমাদের দেশের কাউন্টারের লোকেরা অন্যান্য দেশের একই পেশার কর্মচারীদের তুলনায় কী ধরনের পারদর্শী। আমি জানি আপনি আবেগপ্রবণ দেশপ্রেমী, তাই আমার মতামত আপনার একদম পছন্দ হবে না। যাই হোক যেই ইমিগ্রেশন, কাস্টমস সেরে বাইরে বেরিয়ে আসি, অমনি মহেশ ভাট আমার লাগেজ মাথায় নিয়ে নাচানাচি শুরু করে দেয়। এসবে তাঁর কোনও লজ্জাশরম নেই, খুব সৎসাহসী লোক, আমার কেমন ভারি অস্বস্তি লাগে।

জুলী গাড়ি ফেরত দিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর চোখ দুটি অতীব রক্তিম। বোঝা যাচ্ছে তিনি কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে এসেছেন। ইউ জী-র দৃষ্টি জুলীর দিকে পড়তেই তাঁর মেজাজ, ভাবসাব কেমন যেন পালটে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগলেন, মানুষের মান-অভিমান আমাকে কোনওদিন স্পর্শ করতে পারে না। আমার কাছে চোখের জলের কোনও মূল্য নেই। আপনাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কোনওদিন দেখা হবে কি হবে না সে ব্যাপারে আমার কোনওরকম মাথাব্যথা নেই। ভাবলাম জুলীর কান্নায় যদি ইউ জী সিদ্ধান্ত বদলান, তাহলে কারওরই কিছু বলার নেই, কিন্তু ইউ জী অবিচল এবং সেই দৃঢ়স্বরেই বলে চললেন, আমার আশপাশে যাঁরা থাকবেন তাঁরা যদি আমি কী চাই সেটা না বুঝতে পারেন তাহলে তাঁদের এখানে কোনও স্থান নেই। ভাবলাম জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাস দেখলে এরকমই একটা কিছু ধারণা করা যেতে পারে। প্রতিটি জীবের

একটা বিশেষ শৃঙ্খলাময় জীবনধারায় নিজেকে মানিয়ে চলতে হয়, সেখানে ভুলের কোনও ক্ষমা নেই, ঠিকভাবে চললে জীবন, ভুল করলে বিপর্যয় এবং মৃত্যু। মনে হল যেন এক ভয়ঙ্কর দৈববাণী শুনলাম। মৃত্যুদেবতার সাবধানবাণী হাড়মজ্জায় শীতল স্পর্শের অনুভূতি জাগাল। এক অসাধারণ স্তব্ধতা নিউরনের বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি বন্ধ করে দিল—ভয়ের অপর প্রান্তে যে প্রগাঢ় শান্তি হাতছানি দেয় সেটা আমার চিদাকাশে বিদ্যুতের মতো একটা ঝলক দিয়ে গেল।

আমাদের নিও কর্টেক্সের ফ্রন্টাল লোবে এক ধরনের নিউরন আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলো নাকি অসাধারণ বিবর্তিত সব কোষপুঞ্জ, যা চেতনার রাস্তা এড়িয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সোজাসুজি মাথায় কাজ করা শুরু করে দেয়। হয়তো ইউ জী-র অসাধারণ শক্তিময় ক্ষেত্র সেইগুলোতে স্পন্দন জাগায় আর আমরা অনুভব করি তার পরবর্তী প্রত্যাঘাত—এক অমোঘ উদ্দীপনা এবং দুর্দম আকর্ষণ। তাঁর নির্ভীক দ্বিধাহীন বাচনভঙ্গি হয়তো প্রকৃতির লিখন অনুযায়ী আমাদের গহন গভীরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুরণন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দের উন্নত শিরের তেজোময় প্রতিকৃতি আমাদের মধ্যে জাগাত অনির্বাণ প্রেরণা। হয়তো প্রতিটি জীবের অভ্যন্তরে সুপ্ত আছে মুমুক্ষা—আর মুক্তমানবের জীবন্ত সত্তা সেই সুপ্ত মুক্তির ইচ্ছায় জাগায় টংকার ধ্বনি—আনে নতুন আশার আলো—শরীরে সঞ্চারিত হয় নতুন প্রাণের জোয়ার। মুশকিল হল আমাদের সমাজব্যবস্থা। আমরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হই, সেখানে সর্বদা পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলো আমাদের প্রভাবিত করে এবং আমাদের জীবনের শুরু থেকেই একটা শক্তি-অপচয়কারী অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমরা কী ধরনের মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাদের জীবনধারার আদর্শ রূপ কী এবং আমাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তার আদর্শ চরিত্র কী ধরনের হবে সে ব্যাপার নিয়ে এমন তালগোল পাকানো হয়েছে যে আমাদের মধ্যে সে সমস্ত সম্ভাবনাগুলি কুঁড়ি অবস্থাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ওপর আছে প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিময় সহাবস্থানের অসাধারণ জৈবিক প্রবৃত্তিজাত চাহিদা। এই চাহিদা আদি এবং অকৃত্রিম, যদিও বিবর্তন এর ওপরে অনেক চটকদার চাহিদা আরোপ করেছে কিন্তু গভীর মূলস্রোত সেই শান্তিই চায়। সেখানে না আছে কোনও সুখ না আছে কোনও জ্ঞান না আছে কোনও উপাধি। আমাদের সামাজিক চাহিদার প্রবল ভরবেগের সামনে আমাদের অন্তর্নিহিত মঙ্গলময় চাহিদাগুলি মাথা তোলার কোনও সুযোগ পায় না এবং ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো তার ভয়ানক প্রভাব প্রতিফলিত হয়

গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং হতাশার মধ্য দিয়ে। সামাজিক চাহিদা শুধু বেঁচে থাকার সামগ্রী এবং উপাদান সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; সমাজের অধিকাংশ লোক যা পাওয়ার জন্য আমরণ চেষ্টা করে চলেছে সেটা যাদের আছে অর্থাৎ ধনদৌলত এবং মানসম্মান, তারাও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গভীর হতাশার হাত থেকে রেহাই পায় না। হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিময়, শৃঙ্খলাময় সহাবস্থানের অভাবে আমাদের দেহ বিদ্রোহ করতে চায়, যেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না এবং এর ফলে যা আমরা অনুভব করি তা হল গভীর একটা অজানা দুঃখ এবং হতাশা।

আমার মধ্যে এসব চিন্তাধারা কেন আসে এবং কোথা থেকে আসে! আসলে আমাদের মাথাটা চিন্তা সৃষ্টি করার কোনও কারখানা নয়। আমাদের ইন্দ্রিয় ক্রমাগত এসব বাইরে থেকে ধরে এনে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তারপর আমাদের মস্তিষ্কে এসব বহুবার ঘুরপাক খাইয়ে আবার বাইরে নিয়ে আসে। আমাদের কথাবার্তা এবং লেখাপড়ার মধ্যে এসব পরিষ্কার দেখা যায়। তবে দুঃখ এবং হতাশার কবল থেকে ধনী-মানীরাও মুক্ত নন, আমার এ চিন্তা মাথায় আসার কারণ হয়তো অনেক বিখ্যাত লোকের জীবন অনুধাবন। দেখেছি কত অসামান্য সাহিত্য, কত কালজয়ী শিল্পকলা সৃষ্টি হয়েছে দুর্বিষহ হতাশা এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে। জীবের ভারসাম্য বজায় রাখার চাহিদাটা হল একটা অমোঘ শক্তি—তাহলে কি মানুষের সভ্যতা এবং অন্য সমস্ত জীবজগতের ওপর তার অসাধারণ প্রভুত্বের সুপ্তহেতু এই মানবদেহের ভারসাম্যহীনতা—অর্থাৎ জীবের সঙ্গে জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা উচিত ছিল তাহলে কি তার কোনওরকম ঘাটতি হয়েছে এবং চিন্তা কি এরকমই একটা মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়া যার অবাধ প্রয়োগের ফলাফলে এ ভারসাম্য আসতেই পারে না—শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি যখন প্রকৃতির ওপর নিদারুণ অত্যাচারের রূপ নেয় তখন দেখা যায় অসাধারণ সব বিস্ফোরণ। মানুষ সৃষ্টি করে পারমাণবিক অস্ত্র। মানুষ সৃষ্টির এমন এক ব্যতিক্রমী জীব যা নিজের প্রজাতিকে লাখে লাখে ধ্বংস করতে পারে। আমরা হয়তো জীবের অতীতের দিকে তাকিয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারব, কিন্তু সেই তথ্য প্রয়োগ করে জীবের ভবিষ্যৎ জানার স্বপ্ন যে কতটা সফল হবে তা বিবর্তনের এ অবস্থায় বলাই বাহুল্য। জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই সীমিত যে আমরা সেই জ্ঞানের প্রয়োগে কোনওদিন ভবিষ্যৎ জানতে পারব না। মানুষের ভয় ব্যাপারটাই এইসব জড়িয়ে। আমরা ভবিষ্যৎ জানতে চাই। কারণ আমরা কাল্পনিক

ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারি। আমাদের অজানা ভবিষ্যৎ যে ভয়ের সৃষ্টি করে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমরা এক অসাধারণ চাহিদার সৃষ্টি করেছি। এই চাহিদা থেকেই ধর্মযাজক, রাজনৈতিক নেতা, জ্যোতিষী, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং ভগবানের সৃষ্টি। মানুষের জ্ঞান কোনওদিন এ সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পারবে না। হঠাৎ জুলীর দিকে নজর পড়তেই আমার এই নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারা বন্ধ হয়ে গেল, দেখি তাঁর চোখে জল। চিন্তাধারা কি বন্ধ হয়? তখন সেটা বয়ে চলল অন্য পথ ধরে।

আমার জীবনে এই পক্ষকাল সময়টা হয়তো আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। যদিও আমি জানি জীবনের ঘটনাপ্রবাহ স্রোতস্বিনীর জলের মতো, একবার এক জায়গা থেকে বয়ে চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তবুও জীবনে কিছু কিছু সময় এমন ঘটনাবহুল হয় যে তার গুণগত মূল্য বাদবাকি জীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে পাম স্প্রীং-এ এমন একটা পরিবর্তনের বীজ বোপিত হল যার প্রভাব আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। আমি জানি না এর ফলাফল কী হবে আর না হবে, তবে এই ক'টা দিনে যা হয়ে গেল তা হয়তো আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। এখানে আসার আগে যে মনোভাব নিয়ে আমার জীবন কাটত তা এখন অনেকটাই বদলে গেছে। জানি পাম স্প্রীং-এর পরিবেশ অসাধারণ। প্রথম কথা আমি এখানে একা একা আছি, এখানে সংসারের কোনও টানাপোড়েন নেই। জুলী এবং ইউ জী ছাড়া আমি আর কাউকেই চিনি না, ফলে দলের ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে যে মানসিক টানাহেঁচড়া থাকে আমি সেসব থেকে মুক্ত। ইউ জী-র সংস্পর্শের অভিনবত্ব এর আগেই টের পেয়েছিলাম এবং জুলী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এখানে আসার দু-এক দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার মতো এ পরিবেশ অত্যন্ত দুর্লভ। এর ওপর ইউ জী-র সঙ্গ এবং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি, গতানুগতিক চিন্তাধারার ওপর তাঁর নির্মম আঘাত যদিও চেতন মনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু আমার কেন যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর উপস্থিতি, জীবনসত্তা এবং আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত গভীর যোগাযোগ আমার অবচেতন অস্তিত্বে আরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রভাব জিনিসটা এইরকম। সাধারণ হালকা প্রভাব সে যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন তা আমাদের মধ্যে কোনও গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু জোরালো প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। আমি অবশ্য কোনও আধ্যাত্মিক স্তরের কথা বলছি না—আপাতত আমি শরীরের সেইসব ক্রিয়াকর্মের কথা ভাবছি যাকে চেতনা স্পর্শ করতে পারে না। যেগুলোকে জ্ঞান বা মনের ক্রিয়াকলাপ কোনওভাবে প্রভাবিত করতে পারে না এবং যেগুলোর পরিবর্তন কোনওভাবেই জ্ঞানের জগতে বা অনুভূতির জগতে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না, অর্থাৎ এ সমস্ত শারীরিক পরিবর্তনের ফলাফল আমাদের চেতনার জগতে কোনও বিশেষ রূপ পায় না। সোজা কথায় সেইসব পরিবর্তনের কোনও প্রত্যক্ষ অনুবাদ সম্ভবপর নয়।

এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্য পরোক্ষভাবে মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এর বাহ্যিক প্রকাশ বিভিন্ন লোকের জীবনে বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটাই বোঝাতে চাইছে যে ইউ জী-সংলগ্ন পরিবেশের প্রভাব আমাদের অন্তঃস্থলে বিশেষ পরিবর্তন আনতে সক্ষম এবং এই পরিবর্তন হয়তো আমাদের প্রতিটি জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিময় সহাবস্থান করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অনাল গ্রন্থিপুঞ্জ (ductless gland) পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ বজায় রাখে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক ঠিক নিউরনপুঞ্জে সঠিক মাত্রায় বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ জারি রাখে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক হবে তা গভীরভাবে এসব নিঃসরণের ওপরেই নির্ভর করে, তাই এসব রাসায়নিক ভারসাম্যের ওপর সরাসরি নির্ভর করে আমাদের মনের অবস্থা অর্থাৎ মানসিক ভারসাম্য। আজ যদি আমাদের মধ্যে কোনও কারণে কোনও একটা বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটারের সরবরাহ কম বা বেশি হয় তাহলে আমাদের মনের ভাবগতি বা মেজাজ পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমার এটাই দৃঢ় বিশ্বাস যে এমন একটা পরিবেশ থাকা সম্ভব যার প্রভাব আমাদের মধ্যে জীববিজ্ঞানভিত্তিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করার অনুকূল, এমন একটা প্রকৃতিনির্ধারিত ক্ষেত্র, প্রবল শক্তিশালী ক্ষেত্র, যার দৃঢ় অভ্যন্তরীণ আন্দোলন অন্যান্য জীবের ওপর মঙ্গলময় প্রভাব আনতে পারে। এটা সম্ভবপর হয়

প্রাথমিকভাবে আমাদের শরীরের অনাল গ্রন্থিগুলিকে যথাযথভাবে কাজ করতে দেবার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার ক্ষেত্রে যে চালিকাশক্তি আমাদের সাহায্য করে, তার উৎস হল দেহের বিভিন্ন হরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটারের ঠিক ঠিক পরিমাণের উপস্থিতি এবং নিঃসরণ, এটাই হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বিজ্ঞান সে সহাবস্থানের পরিমাণগত রাসায়নিক দ্রব্যের বিন্যাস খুঁজে বার করতে পারুক আর না-ই পারুক দেহের মধ্যে এ জ্ঞান অদ্ভুতভাবে সুপ্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ দেহ এই সহাবস্থানের দিকে সবসময় যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের পরমশান্তির প্রবণতাও হয়তো দেহের এই সুপ্ত ইচ্ছারই একটা প্রতিফলন। কিন্তু মনের গতিবিধি আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে সবসময় দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করে, মনস্কামনা এমনই এক জিনিস। এমনকী সুখেশান্তিতে থাকার মানসিক চাহিদাও এই ভারসাম্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে, অথচ দেহ তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে মনের অজ্ঞাতেই সামগ্রিকভাবে এই অবস্থায় যাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

প্রকৃতি-পরিকল্পিত সামঞ্জস্য যদি দৈবক্রমে কোনও ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থিপুঞ্জ ঠিক যেভাবে যে বয়সে ক্রিয়াশীল হবার কথা সেভাবেই কর্মক্ষম হয়ে ওঠে তাহলে সেই দেহে এক সামগ্রিক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে মনে হবে সেই ব্যক্তির জীবনে যেন কোনও অভিনব সত্তা অবতরণ করেছে, যার প্রত্যক্ষ ফল হল সেই ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ শক্তিশালী ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটা। ইউ জী-র সংস্পর্শে আসার পর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সেইসব অভিজ্ঞতার অর্থ বোঝবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমার এই নতুন দৃষ্টিকোণ। তাঁর সঙ্গে যতই সময় কাটাচ্ছি, ততই এই দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। বারবার মনে হয় ইউ জী এরকমই একজন সৌভাগ্যবান ক্ষণজন্মা পুরুষ যাঁর মধ্যে সেই সত্তার অবতরণ ঘটেছে যার সুবাদে তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে এক তেজোময় শক্তিশালী ক্ষেত্রের। ইউ জী-র সান্নিধ্যে আমার শরীরে যে সমস্ত আলোড়ন জাগে সে সমস্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সারমর্ম করে আমি দৃঢ়ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা করছি—

ইউ জী-র অভ্যন্তরে এমন একটা প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যা খানিকটা তেজস্ক্রিয়তার মতো এবং এই প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল হল তাঁর নির্ভীক স্বয়ং প্রামাণ্যতা। স্বদেহ যে স্বয়ং প্রকাশমান সেই বিশ্বাসও তাঁর গগনচুম্বী। পরোক্ষ ফল যা আমি আমার

স্নায়ুতন্ত্রে তীব্র অনুরণনের মাধ্যমে অনুভব করি তা হল তাঁর ভেতর থেকে একটা অদৃশ্য শক্তি এবং প্রখর তেজের ক্রমাগত নিঃসরণ। সৌরকলার মতো এর ক্রিয়াকলাপ কখনও তীব্র আবার কখনও মৃদু। এই শক্তিশালী ক্ষেত্র এবং প্রখর তেজ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে এক অজানা আকর্ষণ। আকর্ষণের হেতুর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এই সত্য—প্রতিটি মানবদেহ প্রকৃতি-পরিকল্পিত সামঞ্জস্য লাভের জন্য উন্মুখ, কিন্তু মানুষের মনে এর সরাসরি কোনও অনুবাদ নেই।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় যখন এ ধরনের ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের প্রকাশ দেখতে পায় বা তার সন্ধান খুঁজে পায় তখন আমাদের অভ্যন্তরে সংবেদন জেগে ওঠে। মুশকিল হল এই সংবেদন চেতন মনে কী ধরনের প্রক্রিয়া জাগাবে সে ব্যাপারে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। আমাদের চেতনা আমাদের দেহের এক অতি সীমিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়, তাই আমাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটা সম্ভব চেতন মন যার কোনও হদিস খুঁজে পায় না। অবশ্য এসব সংবেদনের পরবর্তী আঘাত এবং প্রত্যাঘাত চেতনার স্তরে উঠে আসলেও আসতে পারে। যদি আমাদের মধ্যেকার অবস্থাটা কোনও তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে একটা সুন্দর উপমা উপস্থাপন করা যাবে। যখন কোনও বস্তুর মধ্যে খুব জোরালো চৌম্বকশক্তির আবির্ভাব ঘটে তখন আমরা জানি যে তার অভ্যন্তরের অবস্থাটা সুশৃঙ্খল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি সেই বস্তুর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহলে চৌম্বকশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। আবার যদি শৃঙ্খলা আনা যায় তাহলে আবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। মজার ব্যাপার হল, যখন এই শক্তিটা প্রবল থাকে তখন আশপাশের অন্যান্য বস্তুতেও এই শক্তির আরোপ ঘটে এবং অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও ওই একই ধরনের শক্তির সঞ্চার দেখা দেয়। অর্থাৎ এই শক্তির আরোপে বস্তুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় ইউ জী-র উপস্থিতি আমাদের মধ্যে যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায়, সেটা গভীরভাবে আমাদের দেহ অনুভব করতে পারে। যেহেতু আমাদের দেহ সবসময়ই এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান চায় সেহেতু এই ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে একটা অজানা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একটা অমোঘ ভালো-লাগা। যদি এ ধরনের আকর্ষণবোধ চেতনার স্তরে উঠে নাও আসে তার মানে এই নয় যে আমাদের মধ্যে কোনও সংবেদন জাগেনি। আমরা জানি যে দেহের বিভিন্ন অংশের কাজকর্মের ফলাফল বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। এই অনুভূতি যখন সে অতীত জ্ঞানের মাধ্যমে চেতনার জগতে অনুবাদ করার চেষ্টা

করে, তখন স্মৃতি যে-প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল এবং যে-সমস্ত উপকরণ এবং বাহ্যিক সংঘাতের ফলে সেই স্মৃতিসম্ভার গঠিত হয়েছিল তার ওপরেই নির্ভর করে অনুবাদের রূপটি কী হবে। যেহেতু প্রতিটি জীবনের স্মৃতিসম্ভার এবং বাহ্যিক সংঘাতের রাস্তা অত্যন্ত ভিন্ন সেহেতু ব্যক্তিভেদে একই ধরনের সংবেদনের অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও আমার একথাই বারবার মনে হয় যে, বহিঃপ্রকাশ যাই হোক না কেন, এক উন্নত স্তরের সাংগঠনিক অস্তিত্বের প্রভাব—প্রকৃতির গভীর পরিকল্পনাজাত সংঘটনের আরোপে যে তেজ ও বীর্যের সৃষ্টি হয় তা অন্য সমস্ত জীবের ওপর সার্বভৌম মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করার জন্যই জন্ম নেয়। যদিও আমার পক্ষে এগুলো কার্যকারণ-সম্পর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করাটা খুবই দুরূহ কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং শরীর ও মনের ওপর তার সরাসরি প্রভাবের ক্রমাগত পরীক্ষামূলক প্রমাণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি।

আমার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে আপাতত শুধু একটাই চাহিদা এবং এই চাহিদার দুরন্ত জীবনীশক্তি অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত চেতনার বিভিন্ন গতিমুখকে প্রবল পরাক্রমে দাবিয়ে রেখেছে। এই সর্বগ্রাসী চিন্তাটি হল—আমি নিজেকে এই পরিবেশের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত রাখতে চাই। আমার কাছে এ এক অভূতপূর্ব পরীক্ষামূলক যোজনা। এর নেশায় আমি বদ্ধ পাগল। এ অবস্থা জীবনে দু'বার আসে না। এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করতে চাই। কোনওরকম অতীত মানসিক প্রভাবের আওতায় না এসে অর্থাৎ কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে জোরদার করার জন্য ঘটনাবলী অনুধাবন করার যে সংস্কারজাত গভীর প্রবণতা আমাদের মধ্যে থাকে সে প্রবণতাকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করে এক লাগামবিহীন অবস্থার মধ্যে থেকে সদাজাগ্রত ইন্দ্রিয়গুলির সহযোগে এক তীব্র চেতনার আলো জ্বালিয়ে রেখে দেখতে চাই স্বচ্ছভাবে, আমাদের কোন গভীরে এই তপস্যাজাত তেজস্ক্রিয়তার সান্নিধ্য কী ধরনের আলোড়ন জাগাতে পারে। সে আলোড়নের প্রভাব কোথায় এবং কেমনভাবে জীবনের গতিবিধির মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

প্রাথমিক দর্শনমূলক তথ্য-নিরীক্ষণের পালা শেষ। আমার কাছে এসবের অনেক প্রমাণ আছে। এ শক্তি আমাকে অনেকবার ছুঁয়ে গেছে। এর অস্তিত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মতো—স্বয়ং প্রকাশমান। এখন যেটা আমার সবচেয়ে কাম্য সেটা

হল এই পরিবেশে থাকার সময়সীমা আমাকে অনেক বাড়াতে হবে। এর জন্য যে পশ্চাৎপট, ভূমিকা এবং ভরবেগের প্রয়োজন সেটাও আপাতত অনুকূল অবস্থার মধ্যে। অর্থাৎ ইউ জী-র ওপর আমার গভীর আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর প্রতি এই পরম ভালোবাসা আমাকে এহেন পরীক্ষামূলক যোজনার পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাবার সমস্ত পথ প্রশস্ত করে দেবে। এখন শুধু চাই ভাগ্যবিধাতার পরম করুণা, পরিপূর্ণ স্বীকৃতি।

এবার সত্যিকারের বিদায়ের পালা। বুকের মোচড়ে চোখ দু'টো ছলছল করছে। ইউ জী-র ডানহাতটা দু'হাতে চেপে ধরলাম। তিনি করমর্দন করতে করতে বললেন, আশা করি শীঘ্রই কোথাও না কোথাও ঠিক দেখা হয়ে যাবে। আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ততদিন যদি অপেক্ষা করতে না পারি তাহলে কী করব? ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, টেলিফোনে কাজ চালিয়ে নেবেন। তারপর জুলীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই ভদ্রমহিলাকে যদি টেলিফোনে কথা বলার অনুমতি দেই তাহলে সারাদিন ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, আর আমি যদি বেশিক্ষণ কথা বলতে রাজি না হই, তাহলে দিনে অন্তত কুড়িবার ফোন করবেন সে আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন। বুঝলাম না তিনি আমায় কোনও অদৃশ্য ইঙ্গিত করলেন কি না—আমার আগ্রহ হয়তো আরও বেশি হওয়া দরকার! যাই হোক আমরা সবাই হাসতে লাগলাম। ইউ জী-র এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা, ইমোশন যখন অনেক উঁচু মাত্রায় উঠে যায় তখন তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সবাইকে খুব শীঘ্র সমতলভূমিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন। ইউ জী এবং মহেশ ভাট গেটের ওপারে চলে গেলেন। প্লেনের টিকিট না থাকলে এর বেশি এগোনো যায় না। আমি এবং জুলী যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মহেশ ভাট দু-একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু ইউ জী একবারও ফিরে তাকালেন না। তাঁরা অদৃশ্য হতেই জুলী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, জানি না এখন আমি কী করব, কোথায় যাব। প্রত্যেকবার যাবার আগে ইউ জী আমায় এরকম একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে যান, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

জুলী এবং ইউ জী-র মধ্যে যে কী সম্পর্ক তা কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। জুলীর পয়সা আছে, সময় আছে এবং ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটানোর গভীর ইচ্ছা আছে। ইউ জী বলেন, তাঁর বাতাবরণের অলিখিত নিবাসে না আছে কোনও দ্বার,

না আছে কোনও প্রহরী। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ইউ জী-র কথা হল তিনি যদি কাউকে তাঁর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য বিশেষভাবে পছন্দ করেন অর্থাৎ কোনও এক বিশেষ ব্যক্তির উপস্থিতি কামনা করেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ ব্যক্তিরও যদি ইউ জী-র সঙ্গ ভালো লাগে এবং ইউ জী-কে প্রয়োজন হয়—তাহলে পরস্পরের মধ্যে একটা লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, তা সে শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক, যাই হোক না কেন। কার কাকে বেশি প্রয়োজন সেসব নিয়ে সৃষ্টি হতে পারে অনেক রকমের লীলাখেলা, পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের দেনা-পাওয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে—কিন্তু ইউ জী-র জীবনযাত্রায় এসব একেবারে অসম্ভব। মুশকিলটা হল ইউ জী-র এই সহজ সরল উক্তি—তাঁর জীবনে কোনও বিশেষ লোকের কোনওরকম প্রয়োজনীয়তা নেই। অতএব তাঁর সঙ্গে কোনওরকমের লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব। একথা জুলী খুব ভালোভাবে বোঝেন। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কী প্রয়োজন? জুলী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি যদি কোনওদিন কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকতেন তাহলে এমন প্রশ্ন করতেন না। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত দেহে একটু অন্য ধরনের শক্তি আনার জন্য বললাম, ইউ জী বলেন, ভালোবাসা শুধু চার অক্ষরের একটা শব্দ, এর মধ্যে আর কিছুই নেই, তালগোল পাকানো একটা বাজে ধারণা। শুধু তাই নয়, আপনি নিজের জীবনের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন ভালোবাসা কত তাড়াতাড়ি পালটে যায়। ভালোবাসা যদি একটা অসাধারণ কিছু হতো তাহলে আজ যাকে ভালোবাসেন কোনও কারণে যদি তার সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ হয় তাহলে হঠাৎ সেই ভালোবাসা কীভাবে ঘৃণায় পরিণত হতে পারে! কি করে এটা সম্ভব! জুলী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন যেন আমি একেবারে নাবালক। "যদি কোনওদিন আমি ইউ জী-কে ঘৃণা করতে পারি তবেই আমি তাঁর দর্শন মেনে নেব, যতদিন পর্যন্ত সেটা না হচ্ছে ততদিন সারা বিশ্ব তাঁর কথা মানলেও আমি সেসব একদম বিশ্বাস করি না," নির্দ্বিধায় জুলী আমাকে তাঁর মন্তব্য জানিয়ে দিলেন।

ইউ জী প্রায়শই অনেক প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে চান না—এমন অনেক কিছু বলেন যেটা হ্যাঁ বা না দু'টোই হতে পারে। জুলীর সমস্যা ভালোবাসা বা প্রেমজাতীয় কিছু নয়। তাঁর প্রেমে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা সন্দিগ্ধতার কোনও স্থান নেই, তাঁর শুধু একটাই প্রশ্ন, "ইউ জী আপনি যেখানে যাচ্ছেন, আমি সেখানে আপনার সঙ্গে

আসতে পারি?" এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর জুলী কখনই পান না। শুধু তাই নয় জুলী এই প্রশ্নের উত্তর যেভাবে শুনতে চান, উত্তর যদি ঠিক সেরকম না হয় তাহলেই তাঁর নিউরনরাজ্যে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে তখন সাধারণ লোকেরা জুলীর কার্যকলাপ কোনও কার্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে কি না তাও বুঝে উঠতে পারে না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে এরকম ব্যবহার খুবই হতাশাজনক। মনে পড়ছে শুরুতেই লিখেছিলাম, প্রেমের এক উন্নত পর্যায়—উন্মাদনা।

জুলীর এরকম অবস্থা দেখে সবারই মনে হয় যেন তাঁকে সাহায্য করা দরকার। আমারও সবসময় মনে হয় কীভাবে তাঁকে সাহায্য করব। জুলীকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার আগে আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি অন্যরা তাঁকে কী পরামর্শ দেন। এই ব্যাপারটিও বেশ অদ্ভুত। প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁকে পরামর্শ দেন এবং এর মধ্যেও অনেক তারতম্য আছে। কেউ কেউ বলেন, আপনার ইউ জী-কে এতসব জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি যখন যেখানে যান আপনি তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেই হল। জুলীর মাথায় যে এ ধরনের সমাধান আসেনি তা নয়। কিন্তু এসব কাজে লাগানোর ব্যাপারে অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা আছে। জুলীর উদ্দেশ্য হল ইউ জী-কে খুশি করা, তাঁর ওপর জোর করে নিজেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। তিনি মনে মনে শুধু এটুকুই প্রার্থনা করেন যেন ইউ জী একবার বলেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আসেন তাহলে খুব ভালো হয়—ব্যাস। পৃথিবীতে আর কিছুই জুলী চান না—কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই সামান্য আহ্বানটুকুও তিনি কোনওদিন ইউ জী-র কাছ থেকে পাননি। সে যখন হলই না তখন জুলী ভেবেছিলেন ইউ জী না ডাকলেও তিনি যাবেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ইউ জী-র পরামর্শ ছাড়া তাঁর সঙ্গে গেলে ইউ জী মোটেই খুশি হন না। ইউ জী-কে অখুশি দেখার চেয়ে নিজেকে বিরহবেদনায় জ্বলেপুড়ে মরে যেতে দেওয়াটাও অনেক শ্রেয় বলে জুলী মনে করেন।

ইউ জী-র আশপাশে যাঁরা অনেক সময় কাটান তাঁদের মধ্যে অনেকেই জুলীর এই অবস্থা দেখে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করেন। এঁদের মতামত হল ইউ জী যদি নিজের মুখে পরিষ্কারভাবে জুলীকে নিমন্ত্রণ না করেন তাহলে জুলীর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কিছুদিন একেবারে চুপচাপ থাকাটাই সবচেয়ে শ্রেয়; যদিও এ কাজটা

জুলীর পক্ষে খুবই কঠিন। এভাবে কিছুদিন থাকলে ইউ জী নিজেই খবর নেবেন এবং জুলীর কী করা উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন। জুলীর বক্তব্য হল, প্রথম দু'বছর তিনি এ সমস্ত সম্ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। ইউ জী-কে ফোন না করলে তিনি কোনওদিন আপনাকে ফোন করবেন কি না সে ভরসায় থাকলে জীবনের প্রয়োজনীয় বসন্তকালগুলি হয়তো বৃথাই চলে যাবে। মহামিলনের যে সম্ভাবনা দৈবক্রমে এসেছিল তা হয়তো ভুল পদক্ষেপের কারণে কোনওদিন বাস্তবে রূপায়িত হল না। শুধু তাই নয়, এরকমও হতে পারে যে জুলী কিছুদিন ফোন করলেন না। এরপর যখন আর একাকীত্ব সহ্য করতে না পেরে ফোন করলেন, দেখা গেল ইউ জী কোনওরকম খবর না দিয়েই যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অজানা কোনও জায়গায় চলে গেছেন। শুরু হল জুলীর অবর্ণনীয় মানসিক দুর্দশা। অনেক কষ্ট করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউ জী-র বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে খবরাখবর করে যখন ইউ জী-র নতুন জায়গার হদিস পাওয়া গেল তখন বারবার ফোন করে দেখা গেল ইউ জী ফোন তুলছেন না। অতএব এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই। ইউ জী-কে ভুলে গিয়ে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থেকে জীবন কাটানোর চেয়ে জুলীর কাছে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। তার কথায়, সূর্যের কোনও পরিপূরক নেই, আপাতত বিজ্ঞান এতদূর এগোয়নি। তাই এ সমস্যা আমি সমাধান করার কোনও চেষ্টা করি না। পুরো ব্যাপারটা আমি ইউ জী-র ওপর ছেড়ে দিয়েছি। সবকিছু নির্ভর করছে ইউ জী কখন কী চান তার ওপর। জুলী অবশ্য এর একটা সুরাহা করার জন্য আমরণ-আজীবন সংগ্রাম জারী রাখার ব্রত নিয়েছেন।

নিউ জার্সিতে ফেরার ফ্লাইট ধরতে এগিয়ে গেলাম। আমাকে বিদায় জানিয়ে জুলী সানফ্রান্সিসকোতে ফিরে যাবেন। জুলী তাঁর ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আমার প্লেনের টিকিট কেটে দিলেন। আমি তাঁর নামে একটা চেক লেখার জন্য টাকার পরিমাণটা ঠিক ঠিক জানতে চাইলাম। জুলী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, এটা আমার তরফ থেকে প্রিয় ভাইকে উপহার দিলাম। আমি রাজি হলাম না। এখন গভীর দুঃখ আর বিরহবেদনায় তাঁর হৃদয়টা উন্মুক্ত, উদার। পরে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন ধারণার বিভেদে যদি মনোমালিন্য হয় তাহলে এই ব্যাপারটা একটা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে। পাঁচ-দশ ডলার হলে আমি ভাবতাম না। কিন্তু এতগুলি টাকা আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। আমি প্রায় যুদ্ধ করে চেকটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলাম এবং বললাম যদি চেকটা দু-একদিনের মধ্যে জমা না

দেন তাহলে আমি আর কোনওদিন আপনার সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখব না। জুলী মাথা নিচু করে সম্মতি জানালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর আগামী এক মাসের পরিকল্পনা কি? সানফ্রান্সিসকোতে কয়েকদিন মায়ের সঙ্গে থেকে নিউইয়র্কে নিজের বাড়িতে ফিরে আসবেন। এখন মার্কিন মুলুকের পশ্চিমপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে থাকার তাঁর আর কোনও আগ্রহ নেই। বরঞ্চ আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে থাকাটাই ভালো—সেটা ইউরোপের অনেক কাছে। আমি বিদায় নেবার আগে জুলীকে বললাম, আমাদের বাড়ির দরজা আপনার জন্য চিরকাল খোলা থাকবে—যখন ইচ্ছা চলে আসবেন। ফোন করারও প্রয়োজন হবে না।

১৮.

প্লেন এখন বহু উঁচুতে উঠে গেছে। আমি চোখ বন্ধ করে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। ভাবনা সবসময় অতীতকে ঘিরে। যদি কখনও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার চেষ্টা করি সে ভাবনা অতীতের জানা দৃশ্যকে নিয়ে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ইউ জী-র সঙ্গে এই প্রথম বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন সময় কাটালাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর কী হয়েছিল সেকথা মনে করার চেষ্টা করলাম।

প্রথম দিন ইউ জী-কে দেখে এসে যে কঠিন অবস্থা হয়েছিল মনে পড়ছে পরের দিন ভোরবেলা তার কোনও চিহ্নই ছিল না। একটা গভীর প্রশান্তির মধ্যে ভোরে ঘুম ভেঙেছিল। আমার অস্বস্তির কথা লক্ষ্মীকে বলিনি। বরঞ্চ সকালে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথায় কথায় বলেছিলাম ইউ জী তেলুগু ব্রাহ্মণ এবং ইডলি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। লক্ষ্মীর খুব আনন্দ হয়েছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি ইউ জী-কে নিমন্ত্রণ করোনি আমাদের বাড়িতে আসতে? আমার অবশ্য সেকথা একদম মাথায় আসেনি। ইউ জী-র সঙ্গে আলোচনার সময়ে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খুঁজে পাবার আগ্রহে এমন নিমগ্ন থাকি যে অন্য সমস্ত বাহ্যিক আচার-বিচার একেবারেই মনে আসে না।

ফোন করলাম জুলীকে। অনেক ধন্যবাদ জানালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে ইউ জী-কে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার কথা জানাতে পারি। ইউ জী জুলীর আশপাশেই ছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে জুলী ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলেন, গুহ আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন—কী বলব? ইউ জী জানালেন, এ যাত্রায় হাতে একদম সময় নেই। পরের বার যখন নিউইয়র্কে আসব তখন আসার চেষ্টা করব। ইউ জী ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন। জুলীও তাঁর সঙ্গে গেলেন। জুলী আমার সঙ্গে নিয়মিত ইলেকট্রনিক মেইল মারফৎ যোগাযোগ রাখলেন। ইউ জী কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, সেসব খবর আমি নিয়মিত পেতে থাকলাম।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তিন সপ্তাহ পরে জুলীর ফোন পেলাম। আগামী সপ্তাহে ইউ জী আবার নিউইয়র্কে আসছেন। জুলী খুব অবাক হয়েই বললেন এত তাড়াতাড়ি ইউ জী নাকি কোনওদিন নিউইয়র্কে ফিরে আসেননি। জুলী আরও বিস্ময়বোধ করছেন একথা ভেবে যে ইউ জী এবার জুলীর বাড়িতে থাকবেন না। ইউ জী এবার থাকবেন ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন নামের এক বিখ্যাত ইনডোর স্টেডিয়ামের উলটোদিকে সেভেন্থ এভিনিউ এবং থার্টি ফার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে সাউথ গেট টাওয়ার (বর্তমানে অ্যাফিনি) নামের এক বিলাসবহুল হোটেলে। জুলীকে দু'দিন আগে ফিরতে হবে। হোটেল অবশ্য বুক করা হয়ে গেছে। দুশো পঁচিশ ডলার প্রতিদিনের ভাড়া। আমি শুধু ভাবছি কেন তিনি জুলীর বাড়িতে থাকবেন না, যেখানে জুলী ছাড়া আর কেউ থাকেন না।

এক মাসের মধ্যেই নিউইয়র্কে আবার ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির আবির্ভাব ঘটল। আমি সন্ধ্যাবেলা ফোন করলাম। ইউ জী প্রথমেই বললেন, জানি না কেন আবার হঠাৎ করে নিউইয়র্কে ফিরে এলাম! তারপর বললেন, এই সাউথ গেট টাওয়ারে আমি বহু বছর ধরে আসছি। আমি, ভ্যালেনটাইন এবং পারভীন ববি এখানে অনেক সময় কাটিয়েছি। আমি এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, কখন আসব দেখা করতে? ইউ জী বললেন, বিকেল চারটের পর আমি হোটেলেই থাকব। আমার ঘরটা একুশ তলায় এবং নম্বরটা হল জি। বললাম, আগামীকাল আসছি। পরদিন চারটে নাগাদ সাউথ গেট টাওয়ারের একুশ জি দরজায় টোকা মারলাম। জুলী দরজা খুলে দিলেন এবং ইউ জী-কে জানালেন নিউ জার্সি থেকে গুহা এসেছেন। আমি ইউ জী-র সোফার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল তিনি দারুণ খুশি। একটু দুষ্টু হাসি দিয়ে বললেন, আরে গবেষণা ছেড়ে এখানে এলে গবেষণার কী হবে শুনি। আমি উচ্চস্বরে হাসতে লাগলাম।

ইউ জী-র জন্য তাঁর নাতি কিট্টু ইডলি এনেছেন। ইউ জী বললেন, এমন সময় গেছে যখন আমি তিনবেলা দু'টো করে ইডলি খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি। সেদিন সেখানে ঘন্টাতিনেক থেকে বাড়ি ফিরলাম এবং লক্ষ্মীকে বললাম, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো ইউ জী-র জন্য ইডলি বানাতে পার, আমি কাল বিকেলবেলা নিয়ে যেতে পারি। পরেরদিন ইডলি নিয়ে হাজির হলাম। ইউ জী অবাক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জুলীকে বললেন, আমার জন্য গুহর আনা ইডলি দিন। আমার খিদে

পেয়েছে। ইউ জী খুব আনন্দের সঙ্গে ইডলি খেলেন এবং রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। জুলীকে খেতে বললেন এবং তিনিও খুব প্রশংসা করলেন। লক্ষ্মী অনেক ইডলি বানিয়েছিল। পরিমাণ দেখে ইউ জী বললেন, এ দিয়ে তো একদল সৈন্যকে পেট ভরে খাওয়ানো যাবে, যাই হোক কাল যদি আসেন তো ইডলি আনার দরকার নেই। এতেই অনেক দিন চলে যাবে।

পরেরদিন যথারীতি সন্ধ্যাবেলায় এসে হাজির হলাম। কাজ করার সময় ল্যাবরেটরিতে লক্ষ্য করছিলাম বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছিল জুলীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করি ইউ জী কোথায় আছেন এবং কী করছেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। ইউ জী আমাকে দেখে জুলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ব্যাপার গুহর নেশা লেগে গেল নাকি, রোজই দেখি সন্ধ্যাবেলায় এসে হাজির। জুলী মুচকি হেসে বললেন, কে জানে আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে নিউইয়র্কে ফিরে এসেছেন গুহর সঙ্গে দেখা করার জন্যই হয়তো। ইউ জী এবার নকল ধমকের সুরে জুলীকে বললেন, আপনার ওই বড় মুখটি একটু বন্ধ রাখার চেষ্টা করলে সবার স্বস্তি হয়। প্রায় ঘন্টাখানেক আড্ডা মারার পর ইউ জী হঠাৎ বললেন, তাড়াতাড়ি ডিনার করে একটু গাড়ি করে বেড়াতে যাব। জুলী লক্ষ্মীর বানানো ইডলি ইউ জী-কে গরম করে দিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা সাউথ গেট টাওয়ার হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কমল গ্রোভার নামে এয়ার ইন্ডিয়ার একজন পাইলট আমাদের সঙ্গে ছিলেন। জুলীর গাড়িতে সামনে বসলেন ইউ জী, পেছনের সিটে কিট্টু—ইউ জী-র নাতি, কমল এবং আমি বসলাম। আর যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই যে যাঁর গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। আমরা গাড়িতে করে রাতের নিউইয়র্ক শহরের ঝলমলে নিয়নের বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। টাইম স্কোয়ারের আলো সবচেয়ে জাঁকালো। সেই জায়গা পার হয়ে যখন আমরা লিংকন টানেলের দিকে যাচ্ছি, ইউ জী জিজ্ঞাসা করলেন, গুহ আপনাদের বাড়ি কতদূর? আমি বললাম, রাস্তায় গাড়ির ভিড় এবং জ্যাম না থাকলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ইউ জী-র এই প্রশ্নে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। লক্ষ্মী কিছুই জানে না। হঠাৎ করে এরকম একটা দঙ্গল নিয়ে বাড়ির দরজায় টোকা দিলে—বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। আমি প্রায় হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কয়েক সেকেন্ড পরে ইউ জী

বললেন, একটা শর্তে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে রাজি আছি। শর্তটা কী জিজ্ঞাসা করলাম। ইউ জী বললেন, যদি আপনি বাড়িতে যেতে অনুরোধ না করেন এবং আপনার স্ত্রীকে না জানান যে আমরা বাড়ির বাইরে আছি। তাহলে আমরা আপনাকে আপনার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসব। আমি নিরুপায়, আমার স্ত্রী লক্ষ্মী বারবার বলে দিয়েছেন ইউ জী-কে নিমন্ত্রণ করতে, অথচ ইউ জী বাড়ি অবধি এসে ঘরে তো ঢুকবেনই না, এমনকী লক্ষ্মীকে ডাকা পর্যন্ত যাবে না। আমি নিঃশব্দে রাজি হলাম। ভাবলাম হয়তো বাড়ি পৌঁছে তিনি মত পালটাতেও পারেন। কিন্তু ইউ জী যে শর্তে রাজি হয়েছিলেন ঠিক সেরকমটাই করলেন। আমাকে বাড়ির বাইরে নামিয়ে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। লক্ষ্মী এসব ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করার মধ্যে দিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠে।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে হঠাৎ মনে হল আমার খুব শীত করছে। শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল—জ্বর আসছে। দেখতে দেখতে জ্বর এবং কাঁপুনি দুই-ই খুব বেড়ে গেল। ভাবলাম ম্যালেরিয়াতে ধরল বুঝি। আমেরিকায় আমরা যেখানে থাকি, সেখানে মশা, মাছি একটাও দেখা যায় না—কি জানি কী হল। কাঁপুনির ধাক্কায় হাড়-মজ্জা আলাদা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। অনেক লেপ-কম্বল চাপিয়েও অস্বস্তিকর এই কাঁপুনির উপশম হল না। লক্ষ্মী রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। আমি বললাম, আপাতত কাউকে ডাকাডাকি করার কোনও দরকার নেই। যদি কাল সকালের মধ্যে জ্বর না কমে যায় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেব। আপাতত কোনওরকমে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করা যাক। লক্ষ্মী আমার কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। আমি শীঘ্রই গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম।

সকালবেলা রাতের যন্ত্রণাভোগের কোনও চিহ্ন বা রেশটুকুও শরীর বা মনের কোথাও খুঁজে পেলাম না। মনে হল গতকাল রাতে স্বপ্নে আমার জ্বর হয়েছিল। সারাদিন একটা অদ্ভুত ভারমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভাবের মধ্যে দিয়ে সময় কাটল। ভেবেছিলাম সন্ধ্যায় হয়তো আবার জ্বর আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। সকালবেলা ইউ জী-কে ফোন করলাম এবং কথায় কথায় বললাম আমার অদ্ভুত ভীষণ জ্বরের কথা, আর হাড়-মজ্জা কাঁপানো শীতের কথা। আমাকে অবাক করে দিয়ে ইউ জী বললেন, 'আমার থেকে দূরে থাকাটাই মঙ্গল। দেখলেন তো কেমন বিপত্তিকর অবস্থা হয় আপনার।' ইউ জী যেন আমাকে এক বিশেষ ভাবে এসব ঘটনা

চিন্তাভাবনা করার আভাস দিচ্ছেন—কই আমি তো জিজ্ঞাসা করিনি আমার জ্বরের সঙ্গে ইউ জী-র সান্নিধ্যের কোনও সম্পর্ক আছে কি না! জিজ্ঞাসা করলেও, জানি তিনি অস্বীকার করে উড়িয়ে দেবেন। আমার আগ্রহ যেন আরও বাড়তে লাগল। নিজেকেই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। শুরু হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়—মানুষের দেহ নিয়ে পড়াশুনা। আমার প্রশ্নটা এরকম—একটা মানুষের রোগ অন্য মানুষকে অসুস্থ করতে পারে, কিন্তু এর বাইরে একজন মানুষের মধ্যে আর কী থাকতে পারে যার প্রভাব অন্য মানুষের দেহে প্রতিফলিত হতে পারে।

আমাদের জ্ঞান এবং মানসিক অবস্থার যুগপৎ প্রভাব আমাদের দেহে প্রতিক্রিয়া জাগায় একথা আমরা জানি। যেমন, দুশ্চিন্তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে অম্লরস নিঃসরণের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং দেহে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শরীরে নানারকম বিপর্যয় ঘটতে পারে। হজমশক্তি কমে যেতে পারে, অন্ত্রের দেওয়ালে নানারকম ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া দুশ্চিন্তা রক্তচাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এনে লোককে মৃত্যুমুখে পতিত করতে পারে। আবার আমরা এটাও অবগত যে যাদের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়, ডাক্তার তাদের সবকিছু হালকাভাবে নিতে উপদেশ দেন। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জায় গিয়ে লোকজনের কখনও কখনও ভালো ফল পাবার কারণ হল এ ধরনের বিশ্বাসজনিত ভাবনাচিন্তা দেহের মধ্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে এবং দেহ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে রোগ-সৃষ্টিকারী বা ব্যাঘাত-সৃষ্টিকারী অবস্থার মূল হেতুর সঙ্গে লড়াই করে কখনও কখনও ওষুধ ছাড়াই, এমনকী দুরারোগ্য ব্যাধি হলেও, বিজয় লাভ করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে একজন লোক তাঁর রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন এবং কোনও একজনের ভুলে সে পরীক্ষার ফল এল অন্য আর একজনের রক্তের। এই ফল অনুযায়ী জানা গেল যে সেই ব্যক্তির এই ধরণীতে থাকার সময়সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। এ খবরের ফলেই হয়তো সেই সুস্থ ব্যক্তি জীবন পথের লম্বা রাস্তা এক লাফে পার হয়ে জীবন-মৃত্যুর কাছাকাছি এসে হাজির হতে পারেন। এখন আমার প্রশ্ন হল এই ভাবনা-চিন্তার বাইরে যেভাবে রোগজীবাণু কাজ করে চলেছে সেরকম কি কোনও প্রভাব আছে যার প্রতিক্রিয়া একজনের উপস্থিতিতে অন্যের মধ্যে দেখা দিতে পারে? কী এমন আছে ইউ জী-র মধ্যে যা আমি জানি না অথচ আমার মধ্যে

অদ্ভুত রকমের প্রতিক্রিয়া জাগায়? এসব কি কোনও দিন বিজ্ঞানের আওতায় আনা যাবে? কে জানে! ইউ জী কোনও দিনও কোনও শারীরবিদকে তাঁর দেহ পরীক্ষা করা তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেবেন না—অতএব সত্যিই তাঁর দেহে বিচিত্র কিছু আছে কি না সেটা চিরকাল অজানাই থেকে যাবে—তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেসবও বিলীন হয়ে যাবে। যেমন মানুষের প্রতিভা বা নির্ভীকতার মতো জীবন্ত গুণাবলী কোনও দিন কোনও মৃতদেহে খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঠিক সেইরকম।

এয়ার হোস্টেজ খাওয়ার জন্য ডাক দেওয়ায় আমার ভাবনার পাখনা গুটিয়ে নিতে হল। শুনলাম, 'আপনি কি নিরামিষের জন্য অনুরোধ করেছিলেন?' আমি ঘোরের মধ্যেই বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভদ্রমহিলা আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি তখনও ভাবছি কীভাবে আমার জীবনযাত্রা এগোবে, আমার কী করা দরকার, কী ধরনের কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করব। গবেষণার কাজকর্ম এত বেশি মনোযোগ দাবি করে যে সেখানে অন্য কিছুর কোনও স্থান নেই। এই ধরনের কাজে শরীরের ভারসাম্যে ব্যাঘাত হয়। ফলে শরীর ও মন চাঙ্গা রাখার জন্য অনেক কায়দাকানুন নিয়মিত আবিষ্কার হচ্ছে। এমনকী যৌগিক ব্যায়ামেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। আজকাল কর্পোরেট আমলাদেরও যোগাসন, ধ্যান এবং গভীর ঘুমের সময় দেওয়া হয় এবং বিশেষজ্ঞদের ডেকে পরামর্শ নেওয়া হয় কীভাবে এসব কর্মচারীদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায় যাতে করে তাঁদের দিয়ে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ কাজকর্ম করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমার মধ্যেকার মূলগত জীবনধারা অন্য কোনও নতুন দিকে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করছে—গবেষণার কাজটা যেন শুধু সংসার চালানোর মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য কোনও কাজ করে সংসার চালানো তো দূরের কথা, নিজের পেটটাই হয়তো চালাতে পারব না। পয়সাকড়ি রোজগার করার আর কোনও ক্ষমতাই আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া পয়সাকড়ি জমিয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তাভাবনা করাটাও আমার মাথায় স্থান পায় না। আমাদের কর্মস্থলে মাঝে মাঝে মিটিং হয় কীভাবে রোজগারের কিছু কিছু অংশ কোথায় কোথায় সঞ্চয় করলে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে ভালো হবে। আমার সেসব এক অক্ষরও মাথায় ঢোকে না। কেমন একটা অসাধারণ প্রতিবন্ধকতা! অথচ এটা আমি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে পয়সা রোজগার করার জন্য চাকরি করছি, আমার কাছে মনের আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। আর সত্য জানাটা

একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—বই পড়ে আর জ্ঞানার্জন করে যদি সত্য জানা যেত তাহলে সত্যদর্শী লোকের সংখ্যা এতই বেশি হতো যে পৃথিবী বহুদিন আগেই স্বর্গভূমিতে পরিণত হতো। আমি আপাতত মানুষের তৈরি সমাজের কথা বলছি—পৃথিবী প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গভূমি। মানুষের লোভ এবং মনের পিপাসা মেটাবার প্রেরণা একে নরকে পরিণত করেছে। কেন আমরা এত জানতে চাই? আমাদের জানার উদ্দেশ্য কোথা থেকে প্রস্ফুটিত হয়? ভাবছি পাগল হয়ে যাব না তো!

পাম স্প্রীং-এ যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল এর তাৎপর্য কী? আমি কি করে জানব কোন অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে সত্যি সত্যি আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম আর কোন অভিজ্ঞতা শুধুই 'আমি'র কারসাজি এবং ছলনা। এমন কোনও অভিজ্ঞতা কি আছে যা সংস্কারমুক্ত? অভিজ্ঞতা জিনিসটা কী? আমাদের সঙ্গে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের লেনদেন হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ আলোড়নের একটা বিক্ষিপ্ত অংশ, চেতনার স্তরে অনুবাদ না করা পর্যন্ত 'আমি'র কাছে এই আলোড়নের কোনও গুরুত্ব নেই। যখন আলোড়নের এই বিক্ষিপ্ত অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করা শুরু করে, যাকে বলে চিন্তা, প্রতিফলন, বিচার, তখন 'আমি'র প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। আমরা বোঝার চেষ্টা করি, এবং আমাদের পশ্চাৎপট অনুযায়ী এই আলোড়নের অনুবাদ ভালো, মন্দ, বা গুরুত্বহীন কোনও না কোনও একটি রূপ পেয়ে যায়। যদি তা 'আমি'র গভীর অভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুকূল হয় তাহলে পরমানন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন পাম স্প্রীং-এ আমার হয়েছিল। যখন ভেবেছিলাম আমি যা খুঁজছিলাম তার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তার খুব কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছি তখন যে উত্তেজনা হয়েছিল তা সত্যিই তুলনাহীন—এই আনন্দের কোনও সীমা নেই। নদীতে বিশাল বান আছড়ে পরার পর যেমন নদীর দু'কূল ছাপিয়ে আশপাশের সমস্ত সমতলভূমিকে উর্বর করে দেয়, মনে হয়েছিল সেরকমই কিছু হচ্ছে। অথচ এই আনন্দের উৎস প্রকৃতপক্ষে ভাবনার সঙ্গে অভিজ্ঞতার অনুবাদের মিলন—আনন্দবোধ ছাড়া এর কোনও প্রত্যক্ষ ফলাফল থাকা সম্ভবপর কি না সে চিন্তাই আপাতত আমার কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমি জ্ঞানের মাধ্যমে মনে মনে অনেক কিছু জমা করে রেখেছি এবং বহু চাহিদার সৃষ্টি করেছি। এরপর সেসব খুঁজতে শুরু করেছি—যখন মনে হচ্ছে সেসবের সন্ধান

পাচ্ছি তখন গভীর উত্তেজনা। আবার যখন মনে হচ্ছে এ সবই ভ্রম, মায়া, তখন দারুণ হতাশা। এই আপেক্ষিক চেনা-বোঝার ঊর্ধ্বেও কোনও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে কি না সেটাই আপাতত উপলব্ধির আগ্রহ। কিন্তু এসব কীভাবে জানা যাবে! গভীরভাবে দর্শন করার চেষ্টা করলে, সবার মাঝে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলে, ব্যবহারিক জগতে সেটা খোঁজার চেষ্টা করলে—অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন তখন ভারি বিচিত্র—তখন সব আনন্দ শেষ; অভিজ্ঞতা কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। আমার মানসপটে ঈশ্বরীয় দর্শন ঘটলেও বা সেরকম শ্রুতি ঘটলেও ঈশ্বর যে আছে সেটা ব্যবহারিক জগতে প্রমাণ করা অসম্ভব—অভিজ্ঞতা ব্যাপারটাই এরকম। নিজের অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে কতটা কাজ করে সেটা জানাই দুরূহ আর অপরের জীবনে যে এর প্রয়োগ কী হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সঠিকভাবে জানতে পারি না তাই আমাদের ভবিষ্যৎ কোন অভিজ্ঞতার কারণে পরিবর্তিত হল, এই ভাবনাটা একেবারেই অর্থহীন।

আমাদের প্রতিটি অভিজ্ঞতা খুবই ক্ষণজীবী কুহেলিকার মতো। কোনও একটা বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো, অনুপ্রাণিত সেই মনোভাব রামধনুর মতো অল্পকালের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। কিছুকাল পরেই আবার যথা পূর্বং তথা পরম্। ধ্যানে আমার কতই না অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কত বিচিত্র তথাকথিত আধ্যাত্মিক স্বপ্নের অভিজ্ঞতা, তারপরে জাগ্রত-দর্শন, শ্রবণ-অভিজ্ঞতা—যাকে বলে শ্রুতি, যদিও আমার কাছে এগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই, এবং মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের অভাবে এগুলোকে মায়া বা অর্থহীন বলে পরিত্যাগ করা গেছে। অথচ পাম স্প্রীং-এ এমন কিছু ঘটেছে যা শরীরের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন তুলছে। এখন মুশকিল হল এসব কি করে অস্বীকার করি। আমাদের অভিজ্ঞতালাভের গভীর ইচ্ছা অনেক সময় আমাদের মধ্যে মায়াময় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। কিন্তু আমার দেহে যেসব আলোড়ন দেখা দিচ্ছে তা আমার ধারণার এতটাই বহির্ভূত যে মনের জোরে এসব হচ্ছে সেকথা আমি মানতে পারছি না। এসব যে সম্ভব সেটাই আমি জানতাম না, তাই ভাবনার জোরে এই শারীরিক অভিজ্ঞতার আরোপ হয়েছে সেকথা এক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা যায়। এছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মনের জোরে বা মনের সাহায্যে শরীরে এসবের আবির্ভাব ঘটানো সম্ভবপর নয়। যেমন কোনও মহিলা শুধু চিন্তাভাবনা এবং মনের জোরে গর্ভবতী হতে পারে না—অনেকটা সেরকম।

১৯.

চোদ্দ দিন পাম স্প্রিং-এ কাটিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। সন্ধ্যায় দুই মেয়ে এবং স্ত্রী লক্ষ্মী আমাকে দেখে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমি শুধু লক্ষ্মীকে বললাম, ইউ জী সম্পর্কে আমি যা ভেবেছিলাম তিনি তার থেকেও অনেক গভীর রহস্যময় মানুষ। আর কার কাছে এই রহস্যের কতটা উন্মোচন হবে—সেটা জানা শুধু দুষ্কর নয়, প্রায় অসম্ভব, এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ হল এসব ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য পাওয়া যায় না। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীরামচন্দ্র মিশনের কোনও লোকজন আমার খোঁজে বাড়িতে টেলিফোন করেছে কি না। লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কোথায় গেছ, কেন গেছ, কবে ফিরবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মিশনের সভাপতি শ্রী পার্থসারথী রাজাগোপালাচারীর কানেও পৌঁছে গেছে তোমার ধ্যানসাধনার ওপর অনীহার কথা। তিনি নাকি কিছুদিনের মধ্যেই নিউইয়র্কে আসছেন—তখন নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ডাকাডাকি করবেন। এরমধ্যে তোমার আরেক বন্ধুর কাছে শুনলাম—নিউইয়র্কের যে প্রিসেপ্টারের কাছে তুমি প্রতি বুধবার ধ্যান করতে যেতে, তিনি মিশনের সভাপতির কাছে তোমার মিশনে না যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, তুমি নাকি প্রিসেপ্টারদের নিচু মানের ঘরোয়া রাজনীতির ওপর বিতৃষ্ণাহেতু মিশনে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছ। সভাপতি নাকি প্রিসেপ্টারদের একথাও বলেছেন যে তোমরা যত ইচ্ছা ঝগড়াঝাঁটি করো তাতে আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার একটাই বক্তব্য, সব্যসাচীকে আবার মিশনে ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে মনে ভাবলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনার পথগুলি কত ভিন্ন হওয়া সম্ভব। আমার মাথাব্যথার কারণ প্রিসেপ্টারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহ-বিবাদ, অথচ আমার আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহ কমে আসাটা-যে কোনও মৌলিক মতভেদের কারণেও হতে পারে এমন দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব হয়তো তাদের ভাবনাচিন্তার অন্তর্ভূক্ত নয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিজাত চিন্তাধারা হয়তো মিশনের নিষ্ঠাবান কর্মচারীদের বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারে—তাই এসব নিয়ে আলোচনায় তাদের কোনও ইচ্ছা থাকা সম্ভবপর নয়।

আমি জানি না কে কী চায়; এবং আমার আধ্যাত্মিক সহকর্মীরা অর্থাৎ এই মিশনের বন্ধুবান্ধবরা যা চায় সেটা তারা কোথায় পেতে পারে এবং তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হলে তাদের কী করতে হবে সেটাও আমার অজানা। হয়তো সে ব্যবস্থা তারা করছে বা করেছে বলে ভাবছে—তবে আমার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করছে বা এসব ব্যাপারে আলোচনা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। তবে আমি যা চেয়েছিলাম তা মিশনে পাওয়া যাবে না বলেই আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস। লক্ষ্মীকেও বলে দিয়েছি কারও সঙ্গেই আমি টেলিফোনে এসব ব্যাপারে আলোচনা করতে আর রাজী নই। তবে হ্যাঁ যদি কেউ বাড়ি আসতে চায়, সামনা-সামনি বসে আলোচনা করতে চায়, তাহলে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। মিশনের সভাপতি যখন নিউইয়র্কে আসবেন তখন দেখা যাবে কী হয় না হয়, আপাতত এসব নিয়ে আমি আর চিন্তাভাবনা করছি না। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা। যদি কারও কোনও কথায় আমার কোনও অস্বস্তিকর অবস্থা হয় তবে সেকথা সে লোককে বলার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। তবে বর্তমান অবস্থা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। আমার বন্ধুরা তাদের ভাবধারা যখন আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের অপ্রিয় চিন্তাভাবনাগুলো আমাকে উপস্থাপন করতেই হবে। আর এ ব্যাপারটা যখন কোনও এক পক্ষ জোরের সঙ্গে হাজির করতে চায়, যাকে সাদা বাংলায় বলে ঝগড়া, সেসব করতে আমি ভয়ানক অনিচ্ছুক। অথচ আমার মধ্যে এখন এক অসাধারণ উদ্দীপনা। যারা আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহী তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কিছু সত্যিকারের ভালো সংবাদ দেবার একটা মিশনারি প্রেরণা অনুভব করছি—জানি না কেন এমন মনে হচ্ছে। লক্ষ্মী আমার আপাতত একমাত্র শ্রোতা। রাতে তাকে অনেক কিছু বোঝালাম।

রাত তখন প্রায় দু'টো—বুকের মোচড় এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পৌঁছলো যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবছি এসব কী হচ্ছে, হৃদ্‌যন্ত্রের কোনও গন্ডগোল হল না তো—কি করেই বা বুঝব—লক্ষ্মীকে ডাকব ডাকব করেও ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে মনে বুঝতে পারলাম একটা ব্যথা বুকের মাঝামাঝি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং একটা বিশেষ জায়গায় তার তীক্ষ্মতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাবলাম হয়তো বুকের কোনও পেশীতে অজান্তে কোনও টান লেগেছিল, যার ব্যথা এখন এই

গভীর রাতের অবসন্ন দেহে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এভাবেই কয়েকটা মিনিট কেটে গেল আর ইতিমধ্যে কত যে ভাবনা মনে আসছে আর ক্রমাগত সেগুলো নাকচ করে দিচ্ছি তা লিপিবদ্ধ করাও অসম্ভব। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম ব্যথার তীব্রতা আমায় অচেতন হতে বাধ্য করছে। মনে হল অত্যন্ত তীক্ষ্ম একটা বস্তু আমার পিঠ দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করল—আর পরমুহূর্তে সেই অসহ্য বেদনা হৃদয় থেকে সমস্ত শরীরে ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি অবসন্ন হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিলাম। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল—হাত-পায়ের সব জোর হারিয়ে গেল। একটু শব্দ করার মতো শক্তিটুকুও হারিয়ে গেল। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না—যখন শরীরে একটু বল ফিরল দেখি বিছানার চাদর পর্যন্ত ঘর্মসিক্ত। নড়াচড়া করতেও ভয় লাগছিল। পিঠের দিকে বুকের কোনও পাঁজর ভেঙ্গে গেল না তো! একটু একটু করে কাৎ হবার চেষ্টা করলাম। কোনও অসুবিধা হল না। বুকের ব্যথা অদৃশ্য, এমনকী বুকের মোচড় দেওয়া স্পন্দনটাও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। কোনওরকম অস্বস্তিকর অনুভূতিই আর নেই। পিঠে হাত দিলাম। ব্যথার কোনও চিহ্ন নেই। এবার উঠে বসলাম। আমি কোনও স্বপ্ন দেখিনি তো! না, পরিষ্কার মনে পড়ল ঘড়ি দেখেছিলাম প্রায় দু'টো বেজেছিল। এমন অবাক লাগছে! এসব অন্য কাউকে বোঝানো তো দূরের কথা, নিজেই কোনওদিন বুঝতে পারব কিনা জানি না। উত্তেজনায় ঘুমও আসছে না। শরীরে এখনও ঘাম লেগে আছে, অবসাদভাবের রেশটুকু যায়নি এখনও। ভাবলাম এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে হয়তো কোনও সুরাহা পাব না। তাই সবকিছু ভাগ্যদেবীর ওপর ছেড়ে দিলাম—ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল রাতের যন্ত্রণাভোগের কথা। কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন একটা স্থিতি যেন সেখানে দুশ্চিন্তার কোনও অবকাশ নেই। ভয়-ভাবনা তো দূরের কথা, ভেতরে ভেতরে এক অভিনব অজানা শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে বলে অনুভূত হল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতাও যেন এক নতুন রূপ ধারণ করছে বলে বোধ হল। মুখে একটা উষ্ণ লালাস্রোত, তার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অজানা শক্তিপ্রদানকারী সুপ্ত শিহরণ। কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথাটা খুব হালকা লাগছে। ঘোর কিছুতেই কাটছে না, শরীরের কোথাও যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ সমস্ত চিন্তাভাবনা আমার বুকের সেই যন্ত্রণার তীব্র অনুভূতির স্মৃতিকে ঘিরে নানা দিকে বয়ে চলেছে। সমস্ত চিন্তাধারার একটাই জিজ্ঞাসা 'কী

হয়েছিল গতকাল রাত্রে'? ব্যাপারটা স্বপন বা জাগরণের কোনও দর্শন বা শ্রবণজনিত অভিজ্ঞতা নয়। এটা একটা শারীরিক ঘটনা, শরীরের অভ্যন্তরে কিছু একটা ঘটে গেছে। সঠিকভাবে, নৈশ্চিত্যের সঙ্গে, শরীরের ভেতরে কিছু ঘটলে, সেটা বলা বা জানা খুবই দুরূহ ব্যাপার, আমাদের চেতনা সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে এসব কোনওদিন টের পায় না। জ্ঞানের প্রয়োগে কিছু একটা ভাবা যেতে পারে, সেইভাবে দেখলে মনে হয় হৃদয়ের আশপাশের কোনও গ্রন্থির যেন বাঁধন খুলে গেছে (যদি কোনও পেশী বা অস্থিতে আঘাত লেগে থাকত তাহলে তার ব্যথা এখনও থাকত) অথবা কোনও গ্ল্যান্ডে হয়তো কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। হৃদয়ের খুব কাছে থাইমাস গ্ল্যান্ড, বাল্যকালে এর আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড়সড়, যৌবন আসতে আসতে এই গ্ল্যান্ড একটা শুষ্ক গ্রন্থিতে পরিণত হতে থাকে, হয়তো এই গ্ল্যান্ডে কোনও নতুন আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কে জানে, সবটাই হয়তো আমার speculation, আর কীভাবেই বা জানব আসলে কী হয়েছে? সে যা-ই ঘটুক না কেন সারাটা দিন যেন একটা অসাধারণ ভারমুক্ত অবস্থার মধ্যেই কেটে গেল।

দুশ্চিন্তামুক্ত মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে একটা আগ্রহ মনের মধ্যে বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে; বুকের আশেপাশে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী কী কী ধরনের অর্গান আছে এবং তাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জানার ও বোঝার উপায় কী? যদিও ভারমুক্ত অবস্থা উপভোগ করতে খুব ভালো লাগছে এবং সেখানে জ্ঞানবৃদ্ধির কোনওরকম তাগিদ বা তাড়াহুড়ো নেই কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরে কিছু একটা হচ্ছে যেটা জানার এবং বোঝার কৌতূহল আমার ভেতর থেকে যাচ্ছে না। একটা বিস্ময়বোধ এবং বালকসুলভ কৌতূহল। কৌতূহলের প্রধান কারণ হল, যদি আমার মধ্যে কোনওরকম আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে তার সরাসরি প্রভাব শরীরের মধ্যে দেখা যেতে পারে এরকম একটা অসাধারণ সম্ভাবনার কথা ভেবে। জানি, এখানেও আছে সেই 'আমি'রই খেলা। তবুও এই কৌতূহলটা নিরীহ বলেই মনে হচ্ছে। অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখলাম, না, সেরকম আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। হয়তো শরীরের পরিবর্তনটা কোনওভাবে দেহবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে, আমি আমার অনুভূতি সম্পর্কেও একটা বিবরণ দিতে পারি, কিন্তু কথা হল আমার বিবরণের সঙ্গে আমার শরীরের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সম্পর্ক কীভাবে স্থাপন করব। অনুভূতি ব্যাপারটা ব্যক্তিগত ব্যাপার অর্থাৎ

subjective, তাই অনুভূতির বিবরণগুলি সাহিত্যরচনার মতো প্রতিভাবান লোকের গভীর অনুভূতির প্রকাশে "মেঘদূত" "গীতাঞ্জলী" কাব্য হয়ে যায়। আবার নিরানব্বই ভাগ লোকের পেট থেকে একটা অক্ষরও বেরোয় না। অতএব অনুভূতির মাধ্যমে গুণগত মূল্যায়ন অসম্ভব। একেই দেহ-মনের সম্পর্ক ব্যাপারটা রহস্যময়, তার ওপর আবার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক স্থাপন করা, ভাবতেই অস্বস্তি লাগছে। মনে হল আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি সব কল্পকাহিনির মতো। আমাদের দেহে আত্মার কোনও জীববিজ্ঞানভিত্তিক অবস্থান আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না। অতএব এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা এই মুহূর্তে অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। ভাবলাম আধ্যাত্মিকতার দেহ-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো যেন বিকারগ্রস্থ রোগীর কাছ থেকে সত্যদর্শন জানার মতো অবাস্তব একটা প্রয়াস। মনে হল আমার দেহ 'চিন্তক'কে আর শক্তি সরবরাহ করতে চাইছে না। ঠিক করলাম এসব নিয়ে আপাতত আর ভাবনার কিছু নেই। মাথার মধ্যে যদি বসন্তের মধুর হাওয়া বইতে থাকে তা বয়ে চলুক, আমি শুধু চোখ বুজে তার শিহরণ প্রতিটি রোমকূপে অনুভব করতে থাকি। আপাতত শুধু আমটাই খাই গভীর আনন্দের সঙ্গে, পরে না হয় ভাবা যেতে পারে—স্বাদ কাকে বলে এবং সেই আলোকে সুস্বাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে আমের রসের সম্পর্কটা কোথায়।

সন্ধ্যার দিকে বুকের মধ্যে আবার সেই আলোড়ন অনুভব করলাম। কিন্তু ততটা অস্বস্তিকর বলে মনে হল না। চাপটা আগের থেকে কম আর মুখে লালাস্রোতের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ জল, চা বা কফির মতো করে খেতে ভালো লাগল। এদিকে বুকের চাপের জন্য আমি খাওয়াদাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছি। পাম স্প্রীং-এ থাকাকালীন আমি টের পেয়েছিলাম স্বাভাবিক খাওয়ার পরিমাণ আমি বজায় রাখতে পারছি না। লক্ষ্মী আমার খাবার পরিমাণ দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেল। আমাকে বলতে লাগল এভাবে খাওয়াদাওয়া করলে তোমার স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙে পড়বে। আমি অবশ্য প্রায় ভাষণের স্বরে বললাম, তুমি দেখনি ইউ জী-র খাওয়াদাওয়ার পরিমাণ? তিনি প্রায় কিছুই পেটে রাখেন না। আর যা-ও একটু পাখির মতো খান তার সত্তরভাগ সঙ্গে সঙ্গে বমি করে ফেলে দেন। অথচ তাঁর সাতাত্তর বছর বয়সের এই দেহে কি অসাধারণ তেজ, কর্মশক্তি আমাদের সবাইকে অবাক করে দেয়। লক্ষ্মী অবশ্য এত সহজে সব কিছু মেনে নেবার পাত্রী নয়, সরাসরি বলল, ইউ জী-র সঙ্গে কারও কোনওরকম তুলনা হয় না। ইউ জী-কে

দেখে যদি কেউ তার বাহ্যিক চালচলন নকল করে জীবনধারণ করার চেষ্টা করে তবে সে লোকের পদে পদে বিপত্তি ঘটবে, শুধু তাই নয়, মৃত্যুমুখে পতিত হবার সম্ভাবনাও দেখা দেবে। যদিও আমি চুপ করে গেলাম কিন্তু সত্যি কথা হল একটা অভ্যন্তরীণ চাপ আমাকে পেট ভরে খেতে দিচ্ছে না।

শরীরের মধ্যে এক অভিনব শক্তির সঞ্চারণ অনুভব করছি আর তার সঙ্গে সঙ্গে আছে কৌতূহলজনক উত্তেজনা। কীভাবে এই উদ্দীপনাকে সঠিক দিকে চালিত করব তা ভেবে উঠতে পারছি না। ভাবছি ধ্যান করলে হয়তো সেসব জানা যাবে। অথচ চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থাকলে এমন একটা স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে যেন ঘড়িতে প্রচুর দম দেওয়া হয়ে গেছে, আরও দম দিলে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে—ভেতরে যেন এক যুবক সিংহশাবক গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে কারওর সঙ্গে লীলায় মত্ত হতে চায়... আমার চিরকালের এক লীলাসঙ্গিনী তাকেই জড়িয়ে ধরে আমার মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে বাসনা জাগে... আরও অনেক কিছু মাথায় আসে...।

আমি জানি না আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে কিছু আছে কিনা। আমাদের অনুভূতির জগতে যে অভিজ্ঞতা হয় তার মধ্যে কোনটা আধ্যাত্মিকতার জগতে তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোনটার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্পর্ক নেই সেটা কি জানা সম্ভব? আমার একটা ভাবধারা আধ্যাত্মিকতাকে কল্পকাহিনি বলে মনে করতে চায় অথচ আমি আমার ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে রাখতে পারছি না। সবসময় মনে হয় ইউ জী-র সান্নিধ্যে আমার অঙ্গে অঙ্গে যে স্পন্দনের জাগরণ হয় সেটা স্পিরিচুয়ালি সিগনিফিকান্ট অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভাবনা ছাড়া আমার মাথায় আর-সবকিছুই অধিকক্ষণ অবস্থানে অক্ষম।

ইউ জী-র সংস্পর্শে আসার প্রথম দিন থেকে আমার মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে; এবং এই পরিবর্তিত দেহ-মনের প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে অভিনব বিচিত্র সব অনুভূতির। আমার মন আপনা-আপনি এসব নিরীক্ষণ করে চলেছে যেন এক অভ্যন্তরীণ সাক্ষীগোপাল। এই ঘটনাবলী যখনই আমার চেতনায় সামগ্রিকভাবে উদ্ভাসিত হয় তখনই আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা অন্য সমস্ত ভাবধারাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে নগণ্য করে দেয়। একটা গভীর কৌতূহল অসাধারণ উত্তেজনার

সৃষ্টি করে। আমাদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিবর্তন বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার একটা সহজ সরল দৈহিক বিবরণের রূপদান যে সম্ভব সেকথা ভাবতেই আমি উত্তেজিত। এ ব্যাপারটার যে কী অসাধারণ তাৎপর্য আছে সেটা ভাবলেই আমার সারা অঙ্গে শিহরণ জাগে।

দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে যদি মানসিক সত্তার পরিবর্তন ঘটে তাহলে মনকে চিরতরে পরিবর্তিত করার একমাত্র পথ হল দেহের মধ্যে স্থায়ী আমূল পরিবর্তন ঘটানো এবং এই রূপান্তর হয়তো মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণে মানুষের মন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে উন্মুখ হয় এবং দেহের পরিবর্তনে মনের যখন সেই ভাব হয় তখন দেহ-মন ক্রমাগত এমন স্তরে আসতে চায় যেন দেহে আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত ভারসাম্য বজায় রাখার যে-প্রয়োজনে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, মানুষ সেই প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রকৃতির অদৃশ্য আদেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পারে।

২০.

পাম স্প্রীং থেকে ফিরে আসার পর প্রথম রাতে বুকের ব্যথা ও প্রায় জ্ঞান হারাবার মতন যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা হয় তা নিয়ে যতই ভাবছি ততই আমার শরীর সম্পর্কে গভীর কৌতূহল বেড়ে চলেছে। জীববিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে সরাসরি কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ বলে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা হয়তো সম্পূর্ণ শারীরিক একটা ব্যাপার। অভ্যন্তরীণ কোনও গভীর পরিবর্তনের ফলে আমাদের চেতনার জগতে যে ধরনের বোধ জাগে তার একটা বিবরণের প্রচেষ্টায় এ ধরনের উপমা প্রয়োগ করা হতো। চক্র, বিভিন্ন রঙের পদ্ম, রঙিন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা ষড়ভুজ, এসব হল মানসিক কল্পনার রূপ। শরীরের মধ্যে কোথায় কী হচ্ছে তার পরিষ্কার জ্ঞানের অভাবে এসব কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এর কোনও আভাস বায়োলজি বইতে পাওয়া যাবে সেরকম সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের কোনও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে মনের মধ্যে পরিষ্কার কোনও উত্তর উদ্ভাসিত হবে তাও ভাবতে পারছি না। মনের গতিবিধির কী পরিবর্তন হচ্ছে সে তথ্য এখনও জানিনা, তবে শরীরে যে-শক্তি সঞ্চার হচ্ছে সেটাই যে মনকে এসব চিন্তায় মগ্ন করতে বাধ্য করছে সেটা ক্রমশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি। চিন্তা অবশ্য যা কিছু খুঁজে পাবে তাও জ্ঞানভাণ্ডারেরই সঞ্চিত সামগ্রী, সমাজ এবং সংস্কৃতিলব্ধ। মনে পড়ছে পাম স্প্রীং থেকে ফেরার দিনদুয়েক আগে একদিন সকালবেলা ইউ জী যখন ওটমিল সেদ্ধ করছিলেন আমি তাঁকে বলেছিলাম আমার ধ্যানে অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। ইউ জী আমাকে অবাক করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনারা কীভাবে ধ্যান করতেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে যদি সম্ভব হয় স্নান করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এমনভাবে বসে ধ্যান শুরু করতে হবে যেন বসায় কোনওরকম অস্বস্তি না হয়। চোখ বন্ধ করে মনে মনে কল্পনা করতে হবে হৃদয়ের মধ্যে একটা দিব্যজ্যোতি আছে। যেহেতু দিব্যজ্যোতি দেখতে কেমন সেটা জানা নেই সেহেতু এটা একটা অজানা ধারণা, হৃদয়ের ওপর শুধু মানসিকভাবে নজর রাখা, ব্যাস।

ধ্যান করতে বসার কিছুক্ষণ পরেই টের পাওয়া যাবে যে, যে কাজটা করতে বসা হয়েছিল তার বদলে অন্য কিছু করছি, অর্থাৎ কিছু একটা ভাবছি। যখন সেটা টের পাওয়া গেল তখন কোনওরকম আত্মসমালোচনা বা আত্মভর্ৎসনা না করে সহজভাবে হৃদয়ের ওপর নজরটা ফিরিয়ে আনতে হবে। কমপক্ষে আধ ঘণ্টা কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি নয়। ধ্যানের পর মিনিটকয়েক মনে করার চেষ্টা করতে হবে, ধ্যানে কোনও অভিজ্ঞতা হল কি না। যদি কিছু দর্শন বা শ্রবণ হয় তাহলে সেটা ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে। এটা হল ভোরের নিত্যকর্ম পদ্ধতি। ধ্যান শুরু করার ঠিক তিনদিনের মাথায় হঠাৎ মনে হল তেল-লাগানো সাদা কাগজের পেছনে অন্ধকারে মোমবাতির শিখা যেরকম দেখা যায় সেরকম একটা আলো ধীরে ধীরে আবির্ভূত হল, কিন্তু সচেতন হতেই আবার মিলিয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই ধ্যানে আলো দেখা এবং গভীর অনুরণনের ধ্বনি শোনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হতো। ইউ জী এসব নিয়ে আর আলোচনা বাড়াতে দিলেন না। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাতে কিছু করার নির্দেশ ছিল?

দিনের শেষে কাজকর্মের অবসান হলে হাতমুখ ধুয়ে সেই নির্দিষ্ট আসনে বসে অন্তরাত্মার ওপর থেকে মলিনতার স্তরগুলো ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিজে যতটা সম্ভব করা আর বাদবাকিটা গুরুদেবের কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। গুরুদেবের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারেও পরিষ্কার নির্দেশনা আছে। ইউ জী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী ধরনের নির্দেশনা? রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে আমাদেরকে একটা প্রার্থনা করতে হতো— Oh Master! Thou Art The Real Goal of Human Life. We Are Yet But Slaves Of Our Wishes Putting Bar To Our Advancement. Thou Art The Only God And Power To Bring Us Upto That Stage.

ইউ জী গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তারপর আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে বলেছিলেন, এটা আপনাদের মিশনের সভাপতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মতো প্রার্থনা নয়।

রাতে শুয়ে শুয়ে পাম স্প্রীং-এর কথা ভাবছি, আর বারবার ইউ জী-র মুখটা ভেসে উঠছে। চোদ্দ দিন পরে ল্যাবরেটরিতে গেলাম। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবতে আর

একদম ভালো লাগছে না। মনে মনে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশনার সঙ্গে কোথায় আমার পাম স্প্রীং-এর অভিজ্ঞতার মিল আছে সেসব নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে। আমি যে আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম সেই মিশনের মূল ভাবধারাটি ছিল এরকম—সাধনার সবচেয়ে প্রধান অঙ্গ হল গুরুর প্রতি ভালোবাসা আনা। এর অনেক রকম কায়দাকানুন আছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে কার্যকরী তা হল constant remembrance অর্থাৎ 'নিয়ত স্মরণ'। সবসময় তাঁর কথা স্মরণ করলে, তাঁর ছবি সঙ্গে রাখলে, তাঁর ওপর ভালোবাসা এবং ভরসা দু'টোই জন্মাবে। অথচ আমার মনের বর্তমান অবস্থা এমনই যে বারবার মনে হচ্ছে এই জিনিসটা ভেতর থেকে হলেই হওয়া সম্ভব। ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি বলে এই ভবঘুরে অদ্ভুত মানুষটা কোথা থেকে উড়ে এসে চেতন মনের এমন একটা জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছেন যে চেষ্টা করেও তাঁর কথা ভোলা যাচ্ছে না। এমন ঘটনা কীভাবে যেন ঘটে যায়, অভ্যাস করে ঘটানো যায় না। জুলীর কথা বারবার মনে পড়ছে আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরও জোরালো হচ্ছে।

বুকের যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকালাম, সেই রাত দু'টো। অজানা আশঙ্কায় শ্রবণানুভূতি এক অসাধারণ সংবেদনশীল পর্যায়ে উপনীত হল। নিজের হৃৎপিণ্ড চলার শব্দটা মনে হল যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার মতো করে বাজছে। গতরাতের যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি বিদ্যুৎঝলকের মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠে আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই ব্যথাটা পুনরায় তীব্র হতে লাগল, মনে হল যেন বুকের মধ্যে তীক্ষ্ম ধারালো কিছু একটা হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে একটা অসাধারণ চাপ এবং ব্যথার অনুভূতি হল, কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত কেটে যাবার পর মনে হল ঝলকে ঝলকে সেই ব্যথার স্রোত হৃদয় থেকে সারা শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে সমস্ত দেহের অস্তিত্বের অনুভূতি হারিয়ে যেতে লাগল। চেতনার প্রান্তসীমায় এবং অচেতনের প্রবেশদুয়ারে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম শুধু বুকের অভ্যন্তরে একটা যন্ত্রণা। আমি বলতে শুধু সেই বেদনার অস্তিত্ব। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। আমার শরীর বলতে কোনও বোধ ছিল না—শরীরের ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বিছানার বোধ আনে—আমার না ছিল কোনও শরীর, না ছিল কোনও বিছানা, না ছিল কোনও পৃথিবীর টান। যা ছিল সে শুধু এক মৃদু মৃদু স্পন্দন, বেদনার স্পন্দন, বুকের মাঝখানে ওইটুকু স্পন্দন আমার সঙ্গে অবচেতন মনের যোগাযোগ বজায় রাখল, আর সব উধাও। আমি

তখন ভাবলেশহীন, কর্মশক্তিরহিত একদলা মাংসপিণ্ড, দেহটা বিছানার ওপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। জানি না এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটল, যখন আবার দেহটা ফিরে এল তখন ব্যথার কোনও চিহ্ন ছিল না। একটা অদ্ভুত আশঙ্কার জন্ম হল, যদিও তলায় তলায় একটা গভীর প্রশান্তি, তবুও একটা ভাবনা বারবার চেতনায় উদ্ভাসিত হতে লাগল—যদি এসব শারীরিক-মানসিক বিপত্তি এভাবেই আসে আর যায় তাহলে তো পঙ্গু হয়ে যাব। দিনেরবেলায় যদি এসব কাণ্ডকারখানা শুরু হয় তাহলে তো কর্মজীবনের ইতি—আত্মীয়স্বজনরা নির্ঘাত আমাকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করে দেবে। ভাবলাম যদি আবার কখনও এসব হয় তখন কী করব; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম সে যা-ই হোক, যখন হবে তখন দেখা যাবে—এখন পরম শান্তির ছোঁয়ায় একটু ঘুমিয়ে নিই। দেখতে দেখতে গভীর নিদ্রা আমাকে সুষুপ্তির কোলে তুলে দিল। চোখের জলে ঘুম ভাঙল। বাইরে সবে আলো ফুটছে, পক্ষীকুলের ব্যস্ত জীবন ভালোভাবেই শুরু হয়ে গেছে। কাকলির প্রতিটি শব্দ এমন পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছি যেন প্রকৃতি আমার সামনে থেকে তাঁর অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়েছে। মনটা আরও কেন্দ্রীভূত হতে বুঝতে পারলাম ভোররাতের এক অদ্ভুত স্বপ্নের রেশটুকু অশ্রুবিন্দুর জন্ম দিয়ে—ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকার যেমন উধাও হয়ে যায়—সেভাবেই কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানুষের চেতনা এক গভীর রহস্যময় বস্তু, সেটাকে বস্তু বলাও মুশকিল, সেখানে রাতের অন্ধকারে যা ধরা পড়ে, তার কিছু কিছু পরিষ্কার আলোয় দেখা ঘটনার মতো মন ধরে রাখে, যাকে বলি স্বপ্ন। পরিষ্কারভাবে মনে পড়ল স্বপ্নটা—হিন্দমোটরে আমাদের সেই বাড়ি, যেখানে আমার সাত বছর বয়স থেকে জীবনযাত্রা শুরু, এবং এখনও পর্যন্ত সেই বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।

হিন্দমোটরের বাড়িতে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল হয়েছে, এ সময়টায় বাড়ি খুব নিস্তব্ধ। বাড়িতে ভাইবোন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, যে দু-একজন রান্নার বা কাজের লোকজন বাড়িতে থাকার কথা তারাও বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল। আমি আমার ঘরে একা একা বসে আছি—হঠাৎ দেখলাম আমার বাবা দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। খুব ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত, জীর্ণ বসন, যেন বহুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, তোকে দেখে আজ একটা গভীর প্রশান্তি অনুভব করছি। উপযুক্ত লোকের সঙ্গলাভে মানুষের মতো মানুষ হয়েছিস। আমি সারাজীবন বহু মানুষকে দেখেছি;

কতবার ভেবেছিলাম একজন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতন মানুষের সন্ধান পেলে একটু ব্রহ্মজ্ঞানের স্বাদগ্রহণ করতাম, কিন্তু সেরকম কোনও মানুষের সন্ধান কোনওদিন মেলেনি। তোকে দেখে আজ আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তুই বুঝতে পারছিস না, এটা কোনও সহজ কথা নয়, এমন মানুষকে দেখলেই লোকের মনে গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি জেগে উঠবে। আমি তো অবাক, আমার বাবা কোনওদিন সামনা-সামনি আমাকে প্রশংসা করেননি। খুব বেশি খুশি হলে মাকে বলতেন, মাস্টাররা বলেন ওর মাথাটা নাকি খুব পরিষ্কার। ব্যাস, আর কিছু নয়—আর আজ তাঁর কী হল! আমার এমন লজ্জা এবং অস্বস্তি লাগছে, মনে হচ্ছে ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাই। তারপর যা দেখলাম তা লিখতেই দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে—বাবা হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। এরপর আর বসে থাকতে পারলাম না, আমি তাঁর কোনও কথা না শোনার ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে মাকে ডাক দিলাম এবং বললাম, 'মা, বাবু এসেছে...' ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে টের পেলাম আমার কপোল অশ্রুসিক্ত। চোখ মুছতে মুছতে ঘুম থেকে উঠলাম।

শুয়ে শুয়ে বাবার কথা মনে পড়ছে আর চোখের জল মুছছি। গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম স্বপ্ন ব্যাপারটা কী। যেসব ধারণা জীবনে কোনওদিন মনের অজান্তেও চেতনায় স্থান পায়নি, সেসব কেমন করে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়, যেন গতকালের ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। এসব হয়তো কোনওদিন বোঝা যাবে না। বস্তুজগতের নিয়ম বৈজ্ঞানিকেরা কার্যকারণ-সম্পর্কের মাধ্যমে সূত্রাকারে ব্যক্ত করতে পারবেন কিন্তু মনের ঘটনা হয়তো কোনওদিনই কার্যকারণে বাঁধা যাবে না। মনস্তত্ত্ববিদরা বা স্বপ্নবিশারদরা যতই তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য তত্ত্ব লিখুক না কেন, সত্যি কথা বলতে কি, অজানার পাল্লাটা এতই ভারি যে একথা বলাই যায়—তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তেমন কিছুই জানেন না—শুধু শুধু লোকের কাছে একটা আজগুবি নৈশ্চিত্যের ভণিতা করেন—আমাদের পুরোহিতদের মতো, যেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—সবজান্তা। আসলে আমাদের মনের জগতে যেমন বস্তুজগতের গুণাবলী ধরা পড়ে, তেমনভাবে যদি মনের গুণাবলী বস্তুজগতের মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যেত, তাহলে হয়তো স্বপ্নের জগতকে কার্যকারণ-সম্পর্কে বাঁধা যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্রে এর কী তাৎপর্য আছে সেটা আরও একটু ভালো করে জানা যেত। রামায়ণ-মহাভারত-বাইবেলের গল্প যেমন অনেক

লোকের কাছে সত্যি বলে মনে হয় অনেকটা সেরকম মনস্তত্ত্ববিদদের কল্পনার প্রাঞ্জল গালভরা তত্ত্বও বহুলোকের কাছে সত্যি বলে মনে হয়।

বাবা মারা গেছেন উনিশশো চুরাশি সালে। আজ এতো বছর বাদে তাঁকে স্বপ্নে দেখে মাথার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে বা মাথার ভেতরে গভীর কোনও পরিবর্তনের কারণে থিতিয়ে-পড়া অতীত সমুদ্রমন্থনের মতো কালগর্ভ থেকে উঠে আসছে আর সামনে এসে হাজির হচ্ছে কত শত কাহিনি। এসবের হেতু হয়তো কোনওদিন জানতে পারব না, তবে যেটা সত্যি সেটা হল আজ কত কথাই না মনে পড়ছে! কত রকম পরস্পরসম্পর্কহীন কাহিনির মধ্যে হঠাৎ নতুন করে সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি। বাবার মৃত্যুর সময় এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে যা এখন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই অবাক লাগছে, মানুষের মনের এই অদ্ভুত একটা ক্ষমতার কথা ভেবে—যোগাযোগ সৃষ্টি করা এবং তার পেছনের চালিকাশক্তিকে অনুধাবন করা। যখন এসব ঘটনা ঘটে তখন এ নিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি, আর আজ মনে হচ্ছে আমাদের জীবন একটা অমোঘ কালস্রোত, প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা প্রক্রিয়ারই পরিণতি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। আমার অজান্তেই আমার মধ্যে একটা অপরিসীম শক্তি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছে। শুধু আমি নই, প্রতিটি মানুষের জীবনই এই বিশাল শক্তির লীলাভূমি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার কবলে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকি যে এই পরম গতিময়তা কখনও আমাদের অনুভূতিতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে না। আসলে একটা জীবের বেঁচে থাকতে গেলে যে অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন সেটা তার মৃত্যুমুখে পতিত হবার অনন্ত সম্ভাবনার দিকে নজর দিলেই হয়তো বোঝা যায়। শুধু এক জীবনের নয়, আমার এই দেহটা কোটি কোটি বছরের জীবের এই বেঁচে থাকার সংগ্রামের বিজয়বার্তা বহন করে চলেছে এবং এই সত্য প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে আমি তখন গবেষণা করি। জানি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শুধু একটু লেগে-পড়ে থাকতে হবে। চারিদিকে সবসময় উৎসাহব্যঞ্জক কাহিনি। আজ হয়তো কারও একটি গবেষণা-প্রবন্ধ বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছে, কাল হয়তো আমাদের কোনও সিনিয়র সহকর্মী আমেরিকার এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ পেয়ে পরবর্তী গবেষণার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। পরশু আরেকজন তরুণ বৈজ্ঞানিক

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে ভারতের প্রেসিডেন্টের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে। এদিকে আমাদের কাজকর্মের গবেষণামূলক রচনাও নামকরা সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হবে। আমি ইতিমধ্যে দু'বার ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছি। মহীশূরে বক্তৃতার পর অনেকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এসে আমাদের কাজের প্রশংসা করেছেন। এরমধ্যে কলকাতারও কিছু কিছু পদার্থবিদ ছিলেন। এত সম্ভাবনাময় অবস্থার মধ্যেও আমার মনের গভীরে কোথায় যেন একটা বিরল বিষাদ, একটা অস্বাভাবিক দুঃখ প্রায়শই আমাকে হতাশায় নিমজ্জিত হতে বাধ্য করত। আমি নিজেকে একলা রাখার জন্য মাঝে মাঝে একটা সাইকেল নিয়ে শহরের বাইরে চলে যেতাম।

ভারতবর্ষের গ্রাম, আমার গভীর গহন অভ্যন্তরে, তার সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক—মনে হয় যেন আত্মা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আমি বলতে পারি আমার আত্মা সেখানেই পড়ে থাকে। ছোটবেলা থেকে প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে পিসির বাড়ির ধানখেত, আমবাগানে কালবৈশাখী ঝড় আর রাতের ঝিল্লিমুখর ঘন কালো গাঢ় অন্ধকার আমাকে সম্মোহিত করে রাখত। পরবর্তীকালে পড়াশুনা মুলতবি রেখে, ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের সামাজিক উন্নতির জন্য, তাদের শোষণমুক্তির স্বপ্ন সফল করার জন্য, আবার গ্রামে যাই, আজ থেকে দশ বছর আগে। মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা। কী যে তখন আমায়—যে-সমস্ত কাজে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা হয়—সে-সমস্ত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত তা এখন কোনও লজিক দিয়ে বোঝা অসম্ভব। বেপরোয়া, বিপদসঙ্কুল এমন একটি জীবন যেখানে মৃত্যু এবং কারাগার ছায়ার মতো অনুসরণ করে ফিরতো। আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধুরা কেউ কেউ ধরা পড়ে তখন কারাগারে ছিল। কয়েকজন কারাগার থেকে আইনের দরবারে যাওয়ার পথে বেআইনীভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আবার কয়েকজন অসীম অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যে জীবনযাপন করেছিল। এরকম অনেকবার হয়েছে, পাঁচ মিনিট আগে বা পরে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে আমার অবস্থাও উপরোক্ত বন্ধুদের কোনও একজনের মতোই হতো। একবার এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হয়েছিলাম যেখানে আগের রাত্রে স্টেশন থেকে পুলিশের রাইফেল ছিনতাই হয়েছিল। আশপাশের অন্য সমস্ত থানার পুলিশবাহিনী পাগলা কুকুরের মতো আততায়ীদের ধরার জন্য হামলে বেড়াচ্ছিল, আমার কপালেও ওই দলের ছাপ, যদিও আমি সে

ঘটনা সম্পর্কে তখনও কিছুই জানতে পারিনি। সকাল দশটায় রাস্তাঘাট মহামারী-আক্রান্ত নগরীর মতন খাঁখাঁ করছিল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিলাম আমার ইন্দ্রিয়সকল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এক বিধবা ভদ্রমহিলা আমাকে ইশারায় তাঁর বাড়ির দিকে আসতে বলছেন। যখন তাঁর দরজায় এসে হাজির হলাম, তিনি বিনা ভূমিকাতেই বললেন, অনেক লোককে গ্রেপ্তার করেছে, এখানকার অবস্থা আপনার মতো মানুষের পক্ষে ঘোরতর বিপজ্জনক, যথাশীঘ্রসম্ভব এই এলাকা থেকে যত দূর সম্ভব পালিয়ে যান। তারপর আমাকে হতভম্ব করে নিজেই একটা বিপদমুক্ত রাস্তা ধরে আমাকে বাসস্টপে পৌঁছে দিলেন। কিছু পরেই খবরাখবর আসায় টের পেয়েছিলাম মৃত্যু কত কাছ থেকে হাতছানি দিয়েছিল। আজ অবাক লাগছে ভাবতে যে, ভাগ্যের এমন লীলা, প্রকৃতির করুণা এমন প্রকট যে, আমার গায়ে কোনওদিন একটা আঁচড়ও লাগেনি।

উনিশশো চুয়াত্তর সাল আমার জীবনের এক অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময়। আমাদের আন্দোলন ভারতবর্ষের আশিভাগ লোকের ওপর যে অকথ্য শোষণ এবং অত্যাচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেসব চিরতরে মিটিয়ে ফেলার আন্দোলন। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার মহান আন্দোলন। অথচ এখন সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যৌথ, তীব্র এবং মরিয়া আঘাতে তা প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ। আমার শারীরিক বিপর্যয়কে নিজে নিজে সামলানোর জন্য আমি দলছাড়া, এক কথায় আমি তখন পলাতক। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশুদিন কোথায় থাকব তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অবশেষে বাল্যকালের স্মৃতিবিজড়িত পিসির গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলাম। কয়েকদিন পরেই টের পেয়েছিলাম আত্মীয়-স্বজনরাও আমাকে তাদের বাড়িতে থাকতে দিতে ভরসা পাচ্ছে না। তাদের অবশ্য কোনও দোষ নেই এবং তাদের আশঙ্কা ভিত্তিহীনও নয়, জানাজানি হয়ে গেলে আমার মতো রাষ্ট্রদ্রোহীকে আশ্রয় দেওয়ার পরিণামে, পুলিশের কাছে তাদের অপদস্থ হতে হবে, নানাভাবে হয়রান হতে হবে। আমাদের সমাজে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং গরিব লোকেদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ...' তাই পুলিশের খাতায় নাম-ওঠার থেকে বাঁচতে, আইনের রহস্যময় প্যাঁচের হাত থেকে দূরে থাকতে, সাধারণ শান্তিপ্রিয় লোকজন পুলিশের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। আমি তাদের অবস্থাটা একান্তে অনুভব করতে পারতাম, যদিও একটা অভিমান হতো। এই

কিছুদিন আগেও যে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কাছে আমি ছিলাম নীল চোখের ছেলে এবং জানতাম এর কারণ আমার বাবার সামাজিক উপযোগিতা, প্রতিষ্ঠা, এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা। সেইসব নিকটাত্মীয়ের আনন্দ অভিবাদনের পেছনে এখন আমার জন্য একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা; ঠিক করলাম আর এখানে থাকা নয়, একেবারে রাজ্যের বাইরে গিয়ে থাকব।

চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের গুরুদেবের আশ্রমাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে জীবনের একটা অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। জোর করে শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্লোক মুখস্থ করতে হতো, রোজ সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ধুতি পরে প্রার্থনা করতে হতো—'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে, গুরুদেব কৃপা করো জ্ঞানহীনে...' তারপর কুশাসনে বসে ধ্যান করতে হতো। আজ একুশ বছর বয়সে সেই গুরুদেবেরই রাজ্যের বাইরের এক আশ্রমে, হিন্দুদের ধর্মীয় পীঠস্থান বারাণসীতে, পলাতক দেশদ্রোহী হয়ে অজ্ঞাতবাস করতে হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে মায়ের খুব প্রভাব এবং উদ্যোগ, তাঁর জানাশোনা লোকের অভাব নেই, তিনিই সব বন্দোবস্ত করলেন। পরমহংস দুর্গাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীর বারাণসী আশ্রমে অনির্দিষ্টকাল থাকার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে গেল। যাওয়ার সব ঠিকঠাক হচ্ছে। যদিও আমি একেক দিন একেক জায়গায় থাকছি, তবুও এই সময়টায় বাড়ির সব খবরাখবর আমার কাছে নিয়মিত আসত এবং এরকমভাবেই একদিন আসা একটা সংবাদে মনে হয়েছিল সমস্ত কিছু তোলপাড় হয়ে যাবে।

বাবার শরীর খারাপ। গলায় টিউমারের মতো একটা মাংসপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটেছে। ডাক্তাররা খারাপ কিছুর আশঙ্কা করছেন। যথাশীঘ্র বায়োপ্সি করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার মানসিক বিপর্যয় স্থিরভাবে কাজকর্ম করার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে গেল। জীবনে অনেককিছু চিন্তা করেছি। বিজ্ঞান, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, মনোরঞ্জন—কিন্তু বাড়ির কথা, পরিবারের ভবিষ্যতের কথা কোনওদিন চিন্তা করিনি। আমি যদিও বাড়ির বড় ছেলে, কিন্তু বাবার বিশাল ব্যক্তিত্ব আমাকে সেসবদিকে মাথা গলাবার কোনও সুযোগ দেয়নি। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের চোখে আমরা অত্যন্ত সচ্ছল। বাবা এলাকার স্বনামধন্য চিকিৎসক, তার ওপর সমাজসেবক। বাড়িটা সবসময় লোকজনে ভর্তি। আমরা আট ভাইবোন এবং কয়েকজন নিকটাত্মীয়ও সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন। তার ওপর কাজের

লোক, রান্নার লোক এবং সম্বৎসর আত্মীয়-পরিজন আসছে আর যাচ্ছে। বাবার একার উপার্জনে এই জাহাজের মত সংসার চলছে—আয়ের থেকে ব্যয়ের বোঝা অনেক ভারি— টাকাপয়সা সঞ্চয়ের কোনওরকম প্রশ্নই ছিল না। তিনটে বোন, কারও বিয়ে-থা হয়নি। যতই ভাবছিলাম ততই আমার পায়ের নিচের জমিটা যেন চোরাবালিতে পরিণত হতে লাগল, দুশ্চিন্তার তীব্রতা একটা অপরিসীম ভীতিকর প্রশ্নের রূপ নিল—যদি বাবার গলায় ক্যানসার ধরা পড়ে তাহলে কী হবে? আমার ঠাকুরমা গলার ক্যানসারে মারা যান—একটা দুর্বিষহ মানসিক চিত্র আমাকে বিবশ করে ফেলল। আমি আমার অত্যন্ত দরিদ্র বন্ধুদের ঘরের অবস্থা দেখেছি, উদ্বাস্তু আত্মীয়স্বজনদের দুর্দশা সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানি—মা, বোন, ছোট ছোট ভাইদের এইরকম জায়গায় আসার সম্ভাবনার কথা চিন্তাজগতে আসতেই আমার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম—সত্যিই যদি এ অবস্থা আসে তাহলে কোনও উপায় নেই। দুঃখে হতাশায় মনে হচ্ছিল বুক ভেঙে যাবে। হঠাৎ কোথা থেকে জানি না আমার মধ্যে এক অসীম শক্তি জেগে উঠল, সমস্ত মানসিক অবসাদকে মেনে নিতে অস্বীকার করলাম। আমার অস্তিত্বের পরম অন্তঃস্থল থেকে একটা দৃঢ় সংকল্প উৎসারিত হল—এটা এখন কিছুতেই হতে পারে না—আরও অন্তত দশটা বছর চাই। কয়েকদিন পরে পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল, বাবা একদম সুস্থ।

উনিশশো চুরাশি সাল। পদার্থবিদ্যার জ্ঞানপিপাসা এবং বৈজ্ঞানিক হওয়ার তীব্র বাসনার মধ্যে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা যেন প্রাণ-শীতলকারী এক দমকা হাওয়া—আমার উচাটন মনের নতুন সঙ্গী। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা কয়েকটি বই নিয়ে সাইকেল চড়ে মাঝে মাঝেই কোথাও না কোথাও সারাদিনের মতো উধাও হয়ে যেতাম। এভাবেই একদিন বাঙ্গালোরের শহরতলী ছাড়িয়ে একটা নির্জন আমবাগানে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পর *কমেন্টারিস অফ লিভিং* অর্থাৎ *জীবনযাত্রার ধারাবিবরণী* বলে আমার একটা প্রিয় বই পড়তে শুরু করলাম। কৃষ্ণমূর্তির লেখার সারমর্ম আমার কাছে যে পদ্ধতির বলে মনে হতো তা হল পরোক্ষভাবে নিজের মনের সমস্ত স্তরের গতিবিধিগুলিকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করা—এই দেখা শুধু দেখারই জন্য; কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে দেখলে বা দেখার সময় কোনওরকম প্রতিক্রিয়া হলে দেখাটা আংশিক হয়ে যায় অথবা কলুষিত হয়ে যায়, নিজেকে পুরোপুরি জানা যায় না, চেনা যায় না। বইটি বন্ধ

করে বোঝার চেষ্টা করলাম, কেন আমি বিষাদগ্রস্ত। আমি কী চাই? আমাদের সমাজে, আমি যেখানে বড় হয়েছি, সেখানে আমার বর্তমান অবস্থানে অবস্থিত লোকেদের কত গর্ব, কত আনন্দ, অথচ কোথা থেকে আসে আমার এই গভীর দুঃখ, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। এর মূলে হয়তো আমার দর্শনের আলো কোনওদিন গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। ভাবলাম তাহলে অন্যভাবে চিন্তা করি; এখন আমি কী করলে এই মানসিক কষ্টের একটু উপশম হতে পারে। এই ভাবনাটা মনের মধ্যে রেখে গাছের পাতায় পাতায় রোদের আর হাওয়ার খেলা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম—সে জগৎ তার আপন খেলায় মত্ত, সেখানে আমার মনের কোনও প্রভাব নেই। বিকেলে ইনস্টিটিউটে ফিরতে ফিরতে মোটামুটি ঠিক করে ফেললাম কলকাতায় ফিরে কিছুদিন মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটালে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আমাদের গবেষণার দলটা বেশ বড়সড়। আমি দলে যোগদান করার বছর কয়েক আগে আমাদের উপদেষ্টা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভূষিত হন। ফলে নতুন গবেষকেরা তাঁর ছত্রছায়ায় আসতে চান। তাই এখানে এত ভিড়। আমাদের দলনেতা তাঁর প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর প্রতিপত্তি সবসময় অদ্ভুতভাবে আমাদের গোচরে আনার প্রচেষ্টা করেন। তাঁর ব্যবহার খুব নম্র এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ী। কিন্তু তাঁর বিনয়ের পেছনে একটি দুর্বোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আত্মগরিমা। দলের সহকর্মীদের মধ্যে সবসময় গবেষণাবহির্ভূত ব্যক্তিগত একটা টানাপোড়েন বজায় রাখার কুশীলব যে তিনি নিজে এটা সবসময় আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম, তাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ওপর আমার একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। আমি এসব থেকে দূরে থাকতে চাই, কিন্তু আমার গৃহসঙ্গী পড়াশোনার থেকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে থাকতেই বেশি ভালোবাসে, তাই আমার এমন একটা পরিস্থিতি যে পরোক্ষভাবে আমিও তাঁর সস্তা চালের মোহর হিসাবে চিহ্নিত। কোনওকিছু সহজ সরলভাবে করা এখানে অসম্ভব। কে কখন গবেষণাগারে উপস্থিত থাকবে তাতেও একটা জটিলতা। তাই কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়াটা যতটা সহজ বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ ব্যাপার নয়। আমি সরাসরি আমাদের উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কক্ষে এসে বিনা ভূমিকায় আবেদন করলাম আমাকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় যেতে হবে। আমি জানি তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কী বলবেন—আমার কাজটা যতটা তাড়াতাড়ি এগোবে বলে ভেবেছিলেন ততটা এগোয়নি, শুধু তাই নয়

এটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যেরা যদি এসব কাজ করে ফেলে তাহলে আমার গবেষণার প্রবন্ধকে মৌলিক কাজ বলে দাবি করা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সেসব আলোচনায় যেতে রাজি নই—একটা অদ্ভুত জেদ অনুভব করলাম—মুখ থেকে বেরিয়ে এল—বাবা অসুস্থ যেতেই হবে। উপদেষ্টার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এমন খারাপ লাগল, ভাবলাম—এর কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

গত সাত বছর ধরে আমি পশ্চিবঙ্গের বাইরে থাকি, এর মধ্যে হয়তো তিন-চারবার কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আসা হয়েছিল। বিড়লা গ্রুপের হিন্দুস্থান মোটর্স কোম্পানি, যার প্রধান পণ্যদ্রব্য অ্যামব্যাসেডর মোটর গাড়ির দৌলতে এই এলাকার রেলস্টেশনের নাম হিন্দমোটর। স্টেশনে পা রাখতেই কেমন গা ছমছম করে উঠল। হিন্দমোটর স্টেশনের ওপর আমার জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনি জড়িয়ে আছে। সেই ছোটবেলায় যখন ভূপেন্দ্র স্মৃতি স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়তাম, তখন স্কুল পালিয়ে, বিনা টিকিটে ট্রেনে করে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া থেকে শুরু করে কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে রাত কাটানো এবং পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক সংগ্রামের বহু ঘটনার সাক্ষী এই হিন্দমোটর স্টেশন। ট্রেন থেকে নেমে রিকশা স্ট্যান্ডে যেতে যেতেই কয়েকটা চেনা মুখ চোখে পড়ল। দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়ে যখন আঠারো-উনিশ বছরের যুবক-যুবতীতে পরিণত হয়, তখন তাদের যে বিশাল পরিবর্তিত রূপ, কাছে থাকলে সেসব হয়তো তেমন টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সাত-আট বছর চোখের আড়ালে থাকলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। আমার বাবা হিন্দমোটরের বহু পরিচিত চিকিৎসক। ট্রেন থেকে নেমে কোনও রিকশাচালককে বাবার নাম বললেই বাড়ি পৌঁছে দেবে। রিকশা স্ট্যান্ডে আসতেই একজন আমাকে বললেন, আরে বহুদিন পরে আসা হল বুঝি? আমিও আপনাদের বাড়ির দিকে যাব, উঠুন আমার রিকশায়। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি তাদের চিনি। তাদের জগৎ বলতে আশপাশের ক'টা ট্রেন স্টেশন, ব্যাস। এর পরিধি এতই ছোট যে তিনি ভাবতেই পারলেন না আমি কত দূরে থাকি। আর যেখানে আমি থাকি সেখানকার ভাষার একটা অক্ষরও বোঝা যাবে না। সেখানে এতদিন ধরে আমি কীভাবে থাকি, আমি কি অনেক পয়সা রোজগার করি! আমি বললাম, না, না, পড়াশুনা করি। তখন তিনি আরও অবাক!

রিকশা থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকালাম, গত তিন বছরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের এই বাড়িটা দু'টো ঘর দিয়ে শুরু হয়েছিল। একটা ঘরে আমরা সবাই থাকতাম, অন্য ঘরে বাবার চিকিৎসালয়। তখন আমার বয়স ছ-সাত বছর হবে। এরপর একটার পর একটা ঘর বেড়েছে। এখন পুরো জমিটার ওপর বাড়ি। কয়েকটা ভাগের ওপর দোতলা হচ্ছে...। মোটামুটি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখছি আমাদের বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। সবসময় একটা ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব। আমার বাবার নাম অজিত রঞ্জন গুহ এবং ডাক নাম মনু। পিসি সবসময় বলত মনুর বাড়িতে ঘরেরও অভাব নেই, শোওয়ারও জায়গা নেই। অথচ আজ মনে হচ্ছে বাড়িটা যেন পোড়োবাড়ি, খাঁখাঁ করছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেট খুলে বাবার প্রিয় লতাফুলের গাছ পার হয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কিছুক্ষণ পরে বহুদিনের রান্নার লোক পাঁচুর মা দরজা খুললেন। আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিন বছরে কি অনেক পালটে গেছি নাকি? আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বললেন, বাড়িতে কেউ নেই, সব দিদির বাড়ি গড়িয়াহাটায় গেছে। আপনার বাবা হাসপাতালে, বড়দির বাড়ি গেলেই সব জানতে পারবেন। আমি নিঃশব্দে সেই পোশাকেই দু'দিনের ট্রেনে-চলা ক্লান্ত ঘুমন্ত শরীরটাকে কোনওরকমে কলকাতার ভিড় ঠেলে গড়িয়াহাটায় দিদির বাড়িতে এনে হাজির করলাম। দিদি আমাকে দেখেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, প্লেনে এলি নাকি? আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, কেন একথা জিজ্ঞাসা করছিস? দিদি ধীরে ধীরে বলতে লাগল, বাবুকে পি জি-তে ভর্তি করেছি, হার্ট এ্যাটাক। কি জানি কী হয় তাই গতকাল তোকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। আমি জুতোমোজা খুলতে খুলতেই খুব মৃদুস্বরে বললাম, আমি কিছুই জানি না, ট্রেনে করেই এসেছি। বাড়িতে পৌঁছে পাঁচুর মার কাছে শুনলাম সবাই এখানে, আমার বাবু হাসপাতালে। সবাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মায়ের মুখে কোনও কথা নেই, চোখ দু'টো ছলছল করছিল। আপাতত দিদিই সহায়সম্বল, বিশাল পরিবারের ভার মা দিদি-জামাইবাবুর কাঁধে এনে ছেড়ে দিয়েছে। মা আমার খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করে আবার জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সত্যিই তুই টেলিগ্রাম পাসনি? আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, মা, তোমরা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ গতকাল, বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ট্রেনে করে আসতে অন্তত দু'দিন লাগে, আর আমি গত সপ্তাহেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলাম।

মা আরও দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, এই এতদিন পরে বাড়ি এলি এমন অদ্ভুতভাবে, কি জানি ভগবানের কী ইচ্ছা!

সকালবেলা সবাই মিলে পিজি হাসপাতালে এসে হাজির হলাম। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, যাকে বলে আইসিইউ, বাবা সেখানে আছেন। ডাক্তারদের বিশেষ অনুরোধ করায় ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলল—শুধু আমি একা। বাবার চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। তাঁকে প্রায় সুদর্শন পুরুষ বলা যেতে পারত। আর এখন তিনি বর্ণনার অতীত, আমার অগোচরে হয়তো গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর শরীরের অবনতি ঘটেছিল। তাঁর অত্যন্ত মিষ্টি গানের গলা। অথচ আমার নাম ধরে যখন ডাকলেন আমার কাছে সে আওয়াজ যেন অত্যন্ত অপরিচিত স্বর বলে মনে হল। আমার ভেতরটা ভীষণ দুঃখে ভরে গেল। ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই মায়ের শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কারণ তিনি প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বাবার কথা কোনওদিন ভাবিনি, অথচ আজ মনে হচ্ছে হয়তো তাঁর যাওয়ার সময়ের আর বেশি দেরি নেই। এই অবস্থায় তিনি আমায় তাঁর শরীরে যত যন্ত্রপাতি লাগানো ছিল সেসবের সংক্ষিপ্ত কর্মপদ্ধতির বিবরণ দিলেন। অবশেষে বললেন, আমাদের দেশে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার চিকিৎসা এখনও পশ্চিম থেকে এখানে এসে পৌঁছায়নি। আমার দুঃখ আরও গভীর হল, খুব অসহায় বোধ করলাম। এরপর যা দেখলাম তা কখনও ভাবতেই পারিনি। একজন লোয়ার স্টাফ ঘরে ঢুকলেন এবং বাবাকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তারবাবু কেমন আছেন, খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করেছেন তো! এরপর আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, গত দু-তিনদিন ধরে আমার এই ঘরেই ডিউটি পড়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ করি আমি। সত্যি বলছি এরকম অমায়িক মানুষ, আর এই শারীরিক অবস্থাতেও আমার কীসে ভালো হবে সেসব নিয়ে চিন্তা করা, এমনটা কোনওদিন দেখিনি। এই দু'দিনে আমাকে আপনার বাবা ট্রেড ইউনিয়নের সারমর্ম কী, তার প্রয়োগ কোথায়, মানুষের অধিকার কী, আমরা কীভাবে সামাজিক বৈষম্যের শিকারগ্রস্ত এবং শোষণের মধ্যে দিয়ে কালযাপন করি—সব বুঝিয়েছেন। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি আপনার বাবার মতন একজন লোকের সঙ্গে এমন কাছ থেকে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। ভাবলাম বাবা এই অবস্থায় কীভাবে এত কথা বললেন।

দিদির বাড়িতে এখন অনেক লোকজন। সবার সঙ্গে কথা বলে নিজেকে আশাবাদীর আসনে বসিয়েও মোটামুটি মনে হল বাবার হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগেরও কম। আমরা একটা কথায় একমত, সবাই এটা বুঝতে পারছে, বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেও আমাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটবে। আমাদের মন অদ্ভুতভাবে ভবিষ্যৎ তৈরি করে, একটি অর্থনৈতিক স্থিরতার ছবি তৈরি করতে না পারলে চিন্তক খুব অস্বস্তির মধ্যে কালযাপন করে, বারবার চারদিকে সেসবের সম্ভাবনার কথা খুঁজে বেড়ায় যার মধ্যে আছে আশার আলো। আমাদের পরিবারের লোকেদের মানসিক গতিপ্রকৃতি এতই পরিবর্তনশীল এবং আবেগপ্রবণ যে আমার মনের পর্দায় এমন কোনও দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটল না যাকে আশাপ্রদ বলা যেতে পারে। একে তো বাবার সঙ্গে কথা বলে আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত, তার ওপর অন্ধকার ভবিষ্যতের গহ্বর থেকে এমন কোনও সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল না যার অপর প্রান্তে কোনও ক্ষীণ আলোর আভাস আছে। মনে হল আমি বিবশ হয়ে পড়ছি। সব কিছু সময়ের অজানা প্রবাহের বক্ষে সমর্পণ করে দিলাম। এসবের মাঝে শুধু একটা তথ্য স্বস্তিকর। আর তা হল আমার তিন বোন এখন বিবাহিতা এবং প্রত্যেক জামাতা ভাইদের স্নেহ করেন ও মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করেন।

এভাবে চলল কয়েকটি দিন। যখনই বড়দি'কে ওষুধের জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অধিক টাকাপয়সা খরচা করতে হতো তখনই আমার খুব খারাপ লাগত। আমি বড় ছেলে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য যে জলপানি পাই তাতে টাকা জমানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তবুও বাড়ির সবার আমাকে নিয়ে গর্ব ছিল, কিন্তু এখন এই অবস্থায় পয়সার অভাবে নিজেকে এমন অসহায় মনে হচ্ছে যা কোনওদিন ভাবতে পারিনি। এর থেকে যদি একদম বেকার হতাম তাহলে হয়তো মানসিক যন্ত্রণা একটু কম হতো। কারণ, যদি প্রত্যাশা না থাকে, তাহলে হয়তো দায়িত্ববোধের বিবেক-দংশন থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিচ্ছেন, কেউ কেউ বললেন এই মুহূর্তে আমার চাকরি করে সংসারের হাল ধরা দরকার। যদিও আমি জানি আমার বাবা সেটা কোনওদিন চাইবেন না। তিনি ধারদেনা করে হলেও সংসার চালাবেন শুধু একথা ভেবে যে আমি পড়াশুনা করছি। আমি আমার কী করণীয় সে ব্যাপারে কখনই কোনওরকমের মন্তব্য প্রকাশ করলাম না।

হাসপাতালের গণ্যমান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। কেউ কেউ বললেন, দু'টো-একটা সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এলে বাদবাকিটা সামলানো সহজ, কিন্তু সময়সাপেক্ষ। আবার কয়েকজন বললেন, বড়সড় অস্ত্রোপচার ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর অস্ত্রোপচারের পর কী হবে তাও ফিফটি-ফিফটি। এখন বাবার শরীরের অপুষ্টিজনক অবস্থা এমন পর্যায়ে যে ছোটখাট অস্ত্রোপচার সামলানোই কঠিন, বড়সড় অস্ত্রোপচারের পক্ষে শরীর একেবারেই অনুপযুক্ত। তবে সবার এক কথা—এখানে আরও কিছুদিন থাকতে হবে। এই সময়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের জীবনে ব্যাপারগুলি কত জটিল। কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসা যে কী দুরূহ সেকথা সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। বাবার যখনই কথা বলার মতো অবস্থা আসে এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মেলে তখনই মাকে বলেন এ থেকে আর ভালো হওয়া সম্ভব নয়, বরঞ্চ শেষ ক'টা দিন বাড়িতেই থাকি। মা আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে করুণভাবে তাকিয়ে থাকেন। আমি আবেগের প্রভাবে কীসে মঙ্গল হবে সেটা যেন ভুলে না যাই সেই প্রয়াস জারি রাখার জন্য শুধু ডাক্তারদের প্রশ্ন করে চলি। বাবা জানেন এ অবস্থায় তাঁর ডিসচার্জ হবে না, কিন্তু আমরা যদি হাসপাতালকে দায়িত্বমুক্ত করে স্বাক্ষর দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাই তাহলে হয়তো তা সম্ভব। এ এক অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণ। যদি এ অবস্থায় তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে তাহলে আমরা সবাই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে এই পরিণতি হয়েছে বলে নিজেদের দোষী মনে করব। কারণ এখানে আরও কিছুদিন থাকলে তিনি হয়তো আরেকটু সুস্থ হতে পারেন এবং তখন বাড়ি নিয়ে গেলে হয়তো পুরোপুরি ভালোও হয়ে যেতে পারেন। কোনওরকম সিদ্ধান্তে যখন একমত হওয়া গেল না তখন প্রধান চিকিৎসকের পরামর্শই শিরোধার্য করা হবে বলে ঠিক করা হল। বাবার এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না, যখন তিনি টের পেলেন যে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব বলে ঠিক করেছি, তখন তিনি যেন ভেতর থেকে হাল ছেড়ে দিলেন—ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটল।

বাবাকে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতিই বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা মাঝে মাঝে কাচের অপরপ্রান্ত থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া বাবার মুখটা অনুমান করার চেষ্টা করি। সত্যি সত্যি কিছু দেখার বা বোঝার কোনও উপায় নেই। যখন

কোনও ডাক্তার বাবার বিছানার সামনে দিয়ে পায়চারি করে যান তখন তাঁকে কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং গত দু'দিন ধরে একই উত্তর পাওয়া গেল—বিপজ্জনক অবস্থা। সেদিন ভোরবেলা হাসপাতালে এলেন বাবার সেই জ্যোতিষ বন্ধু নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আমাদের কাছে নরেশমামা, আর-সবার কাছে ন চ ভ বলে পরিচিত, মাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করেন এবং আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমাকে দেখেই বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমাকে দলবল থেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি তো বড়, তাই তোমাকেই বলছি, যখন তোমার বাবার শরীর খারাপ হয় এবং হাসপাতালে আনা হয় তখন সুলেখাকে দেখতে তোমাদের বাড়ি যাই (মায়ের নাম সুলেখা)। রিকশা থেকে নামতেই একটা অদ্ভুত জিনিস আমার গোচরে আসে—যেন একটা পবিত্র ছত্রছায়া তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে। আমি অবাক। মনে পড়ছে ন চ ভ অনেকদিন আগে আমাদের বাড়িতে বসেই আমাকে বলেছিলেন—তোমার বাবার উপরে ঠাকুরের কৃপা আছে (ঠাকুর বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলেছিলেন)। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি! আমার কাঁধে হাত দিয়ে ন চ ভ বললেন, তুমি তো বড়, তোমাকেই সামলাতে হবে, তৈরি থেকো—সময় হয়ে গেছে। সেদিন বাবার দেহ থেকে প্রাণ নির্গত হল—২০ জুন—আমার প্রিয় বান্ধবী লক্ষ্মীর জন্মদিন।

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির স্কুলে সামান্য বেতন নিয়ে পদার্থবিদ্যা পড়ানোর মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা করব—এই বাসনা বাবার মৃত্যু এবং সাংসারিক প্রয়োজনের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল। বাবার মৃত্যুকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেসব নিয়ে ভাবছি। ভাবছি নরেশমামার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। ন চ ভ-র এসব ব্যাপারে যে বিশেষ ক্ষমতা আছে সেটা পরবর্তীকালেও প্রমাণ পেয়েছি। বাঙ্গালোরে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিকের চাকরি পাওয়ার পর নরেশমামাকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি খাওয়ার টেবিলে বসে হঠাৎ বলেছিলেন এই চাকরিতে বেশিদিন থাকা হবে না, বিদেশেই বসবাস। আমি বলেছিলাম, বাঙ্গালোরই হয়তো আমার বিদেশ। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দু'বছরের মধ্যেই সাতসমুদ্র পার হতে হবে। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ভাবছি এসব মানুষের বিশেষ ক্ষমতা, জ্যোতিষশাস্ত্রের নিগূঢ় জ্ঞানের ফলাফল নয়। যেমন ধরুন মানুষ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শিখে অনেক বড় বড় সংখ্যা নিয়ে

এসব প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু কেউ যখন সাতাশির সঙ্গে পরপর সাতবার সাতাশি গুণ করলে কী হবে সেটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে গড়গড় করে বলতে থাকে, তখন সে যে সেটা কীভাবে বলছে তা সে নিজেও জানে না। মানুষের চেতনা কীভাবে কাজ করে সে জ্ঞান ঠিকমতো না থাকায় আমরা এসব ব্যাপারকে ঈশ্বরের কৃপা বলে মনে করি। আমাদের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম মনে করতেন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা তাঁদের কূলদেবীর আশীর্বাদ। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বারো বছর বয়সে বালক ইয়াহুদি মেনুহিনের বেহালা বাজানো শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন এখন আমি জানি ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন। নরেশমামা বলতেন, তোমার বাবা লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারতেন তার কী ব্যাধি আছে। ডাক্তারবাবুর এই বিশেষ ক্ষমতা এক দৈবশক্তির কৃপা। দৈবশক্তির কৃপা কিনা জানি না তবে শ্মশানে গিয়ে শবদাহ করার সময়ে যে ঘটনার সাক্ষী হলাম তাতে দুঃখের মধ্যেও একটা অসীম আনন্দের অনুভূতি হল।

শ্মশান কানায় কানায় ভর্তি। সাধারণ লোক থেকে শুরু করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে তাঁদের সমবেদনা জানাচ্ছেন। বাবার শবদাহের কাজ শুরু হয়ে গেছে, সব কিছু তৈরি। আমাকেই প্রথম মুখাগ্নি করতে হবে। এমন সময় একটা হট্টগোলের আওয়াজে একটু থমকে দাঁড়ালাম। আমার এক বন্ধু এসে বলল, একজন আমার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চায়। আমাদের কথোপকথন শেষ হওয়ার আগেই দেখি একজন লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মিশমিশে কালো, খালি গা, অশ্রুসিক্ত লাল চোখ দু'টো আমার চোখে রেখে দু'হাত জোড় করে বললেন, বড়বাবু, ডাক্তারবাবুর শবদাহের কাজটা দয়া করে আমাকেই করতে দিন। বন্ধু পাশ থেকে জানাল, শ্মশানেই থাকে, কাঠ বিক্রি করে—শবদাহ করে। আমাকে আবার বললেন, দয়া করে আমাকে এই কাজটা করতে দিন, আমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। আমি চোখবুজে সম্মতি জানালাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আগুনের দিকে অপলক দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলেন, আমি গরিব মানুষ, নিচু ঘরের লোক, খুব কষ্টের সংসার। একবার মেয়েটির খুব অসুখ করল। কেউ তাকে ভালো করতে পারল না। পয়সাকড়ির অভাবে বড় ডাক্তারের কাছেও যাওয়া গেল না। যখন ভাবলাম মেয়েটাকে হয়তো আর বাঁচাতে পারব না, তখন একজন আপনার বাবার কাছে নিয়ে যেতে বলল। আপনার বাবা আমি কী কাজ করি শুনে বিনা পয়সায় চিকিৎসা

করে মেয়েকে ভালো করে দেন। ভদ্রলোক কথা বলছেন আর টপটপ করে তাঁর চোখের জল পড়ছে। মনে হল মৃতদেহ ভস্ম করে যাঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাঁর চোখের জল আমার চোখের জলের থেকে অনেক গভীর।

আমাদের জাগ্রত চেতনায় যা ধরা পড়ে তার অধিকাংশই কালের স্রোতে অবক্ষয়িত হতে হতে অবণীর গর্ভে অবলুপ্ত হয়ে যায়, আর যেটুকু সুপ্ত থাকে তা কখন, কীভাবে এবং কেন কুহেলিকার মতো আমাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠে বিভিন্ন কাহিনির জন্ম দেয় তা কোনওদিন বোধগম্য হবে না। হয়তো চেতনার রহস্য কোনওদিন ভেদ হবে না। আমাদের বিশাল বহির্জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ কীভাবে আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয় সেটাই অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তার ওপর মানুষের ক্ষেত্রে যে অংশটা উদ্ভাসিত হয় তার সঙ্গে যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা লাভ করে কালে কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে...। বৈজ্ঞানিক যখন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে এসব বুঝতে অনেক গভীরে চলে যাবে তখন দেখবে নিউরনপুঞ্জের তড়িৎক্ষেত্রে বহুবিধ বিভিন্ন নকশার আভা। যেন জোনাকিভরা বিশাল অরণ্যে অন্ধকার গভীর রাতে আলোর নকশার মধ্যে কেউ কালিদাসের কুমারসম্ভাবের অনুভূতি খুঁজে বেড়াচ্ছে...। যাঁরা রহস্যের পীড়ায় জর্জরিত, তাঁরা কিছু না কিছু খুঁজে পাবেই। আর যদি ভাগ্যক্রমে কারও আত্মচেতনা চৈতন্য হয়ে যায় তাহলে রহস্যের উপস্থিতি অস্বস্তির জায়গায় আনবে পরম শান্তি।

২১.

সকাল থেকে অনেকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে ফোনের অপরপ্রান্তে ইউ জী-র গলার আওয়াজ শুনতেই প্রাণটা ভরে গেল। পরম উৎসাহে বাক্যালাপ শুরু করলাম:

—ইউ জী কেমন আছেন?

—এর থেকে ভালো থাকা সম্ভব নয়।

—খুব ভালো ইউ জী। আপনার এই কথা শুনেই আনন্দ।

—কোথা থেকে ফোন করছেন?

—অফিস থেকে।

—অফিস বলছেন কেন? বলুন ইউনিভার্সিটি।

—ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা আলাদা ঘর আছে। এখানকার লোকজন এই ঘরকে অফিস বলে।

—ও আচ্ছা, আচ্ছা। তা জগৎ আপনাকে কীভাবে আমন্ত্রণ করছে?

—যা আশা করতাম, তার থেকে অনেক ভালো। এখন আমি যে অবস্থায় আছি, তার থেকে খারাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে তার থেকে ভালো থাকাও সম্ভব।

—তাহলে আপনি চান আরও ভালো থাকতে।

—অবশ্যই।

—এর জন্য ভাবনা ছাড়া আর কী করছেন?

—সেটাই ভাবছি কী করলে আরও ভালো থাকা যায়।

অনুভব করলাম এদিকে আজ আর এগোতে ইচ্ছে হচ্ছে না। প্রসঙ্গ পালটে বললাম, পাম স্প্রীং-এ যা হয়ে গেল এবং তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় যা হচ্ছে তা আমার কাছে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার—এ আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। ইউ জী-র নিজস্ব কোনও ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহ নেই। যখন কেউ প্রশ্ন করে তখন সেই প্রশ্নের স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যে উত্তরটা প্রয়োজনীয়, সেই

উত্তর পাওয়া যায়। একই প্রশ্নের পরবর্তীকালে একই উত্তর পাওয়া যাবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ইউ জী আমার মন্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,

—যা ঘটেছে এবং ঘটছে তাতে কি আপনার কোনও হাত আছে?

—অবশ্যই আমার কোনও হাত নেই।

—তাহলে বিশ্বাস করুন আমার কথা, এতে আমারও কোনও হাত নেই।

আমি সত্যি সত্যিই অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। ইউ জী বলে চললেন— আমাদের কারওরই যখন এ সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর কোনও হাত নেই তখন এ সবের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণের সমস্ত রকম চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দিন। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, আপনি এখনও কিছুই দেখেননি।

আমি শিউরে উঠলাম। ভাবলাম এবার প্লট জমে উঠেছে। দারুণ উত্তেজনা হচ্ছে, আর বুড়োকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে। বললাম, গত রাতে বাবাকে নিয়ে একটা জীবন্ত স্বপ্ন দেখার পর অতীতের কথা মনে পড়ছে। এরপর সংক্ষেপে স্বপ্নের সারমর্ম শোনালাম। এসব কথা শোনার পর ইউ জী যা বললেন তা যে ইউ জী বলেছেন সেটা ভাবতেই অবাক লাগছে।

—আপনাদের শাস্ত্রে বলে শেষ কথা হয় গুরুর সঙ্গে। সত্যিকারের গুরু যখন দেখেন উপযুক্ত শিষ্য তৈরি হয়ে গেছে, তখন গুরুর কাজ শেষ। শিষ্যকে প্রণাম করে তিনি লোকসমাজের আড়ালে চলে যান, নয়তো ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তবুও ফোনটা কিছুক্ষণ কানে লাগিয়ে রাখলাম। শুধু ঝিল্লিঝংকার। ধীরে ধীরে ফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম। শরীরে একটা অদ্ভুত শক্তিপ্রদানকারী রোমাঞ্চ জাগছে। মনে হচ্ছে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সিংহনিনাদ করি, তবুও চেয়ারে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ভক্তিরসে সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হতে লাগল। টের পেলাম একটা গানের সুর অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরিত হচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রাণ খুলে গাওয়া শুরু করে দিলাম রবিঠাকুরের গান:

ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর॥

কভু মোহবিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজ ভয়হর শান্তিসুধাকর॥
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল 'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ।
প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ করো নাথ হে,
ধ্যাননয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর॥

.....

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক,

এইমাত্র আপনি যে ঘটনাপঞ্জী পড়ে শেষ করলেন সেটা আমার খুবই চেনা। যখন গুহ ইউ জীকে আবিষ্কার করলেন, সেটা ছিল একটা জাদুকরী মুহূর্ত, এবং ইউ জীর সঙ্গে তাঁর সময়টা এবং তাঁদের দুজনের সঙ্গে আমার সময়টা ওই একই। প্রথম যখন গুহ ইউ জীর সঙ্গে দেখা করলেন, আমি ছিলাম সেখানে। ইউ জী যখন প্রথম গুহর বাসায় গেলেন, আমি ছিলাম সেখানে। পাম স্প্রিং-এ গুহ যখন ইউ জীর সঙ্গে, আমিও তখন সেখানে। এ সবকিছুই আমার দেখা, এবং ভালোবেসে গুহ এই বইতে যা সিক্ত করেছেন তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি।

যদিও আমার স্মৃতি আমার ওই সময়কার অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে, গুহর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তা-ই, কিন্তু আমি দেখি যে গুহর এই বিবরণী তীব্রভাবে সত্যনিষ্ঠ আর হৃদয়স্পর্শী। পাম স্প্রীং মরুর সেই উষ্ণ, গ্রীষ্মের দিনগুলিতে যে-প্রতীতি জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছিল, বহু বছর ধরে আমি সেটা নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে এসেছি। তখনও তাঁর অভিব্যক্তির সতেজতা আর তাঁর সরলতা ছিল লক্ষণীয় এবং আজও সেটা সেরকমই আছে কিন্তু এখন তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন নতুন এবং শক্তিশালী একটি পন্থায়, যে-ই তাঁর সংস্পর্শে আসে তাকেই তিনি সততা, ব্যগ্রতা, এবং উজ্জ্বলতার সঙ্গে গ্রহণ করে নেন। দিন দিন আমি তাঁর আত্মসংযম আর আত্মনিয়ন্ত্রণের বর্ধমান প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। তিনি খুবই নমনীয়, কিন্তু অবিচল এবং নির্ভরযোগ্য, অন্যদের জন্যে বিস্ময় আর উদ্বেগে পরিপূর্ণ, কিন্তু তিনি আবেগের ছলাকলায় দোলায়িত হতে রাজি নন এবং কোনও চাতুরি, কোনও দুষ্কর্মই তাঁর ক্ষুরদৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই আমার জীবনে গুহর উপস্থিতিটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজ এই পত্র লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা সেরকমই আছে। তিনি আমার কাছে একটা সহোদরের থেকেও বেশি কিছু, এবং সদয়ভাবে তিনি আমাকে তাঁর সহোদরা বলে উল্লেখ করেন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে (তিনি যদিও আট ভাইবোনের মধ্যে একজন) আমি বলতে পারি ভাই-বোনের এই সম্পর্কটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে গেছে, বিশেষ করে একদম প্রথম দিন থেকেই ইউ জী এই সম্পর্কটাকে যেভাবে স্পষ্টতই লালন করে গেছেন; যে-কারণেই তিনি এটা করে থাকুন, কখনও তিনি সেই কারণটা বলেননি।

আমার খুব ভালো লাগছে যে গুহর কথাবার্তা এখন বাংলার পাঠকসমাজের কাছে সহজলভ্য হলো, সেই সমস্ত "অন্বেষক"দের কাছেও সহজলভ্য হলো যাঁরা এই দুজন আকর্ষণীয় মানুষ এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহী বা আগ্রহী হবেন। পঁচিশ বছর ধরে গুহর সাথে, অসাধারণ এই মানুষটির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আমার জীবনের একটি বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত উপহার, এই বইটির মতোই। আশা করি আমার কাছে যেমন আপনার কাছেও তেমনি এই বইটি অমূল্য বলেই প্রতিপন্ন হবে।

জুলী থেয়ার
প্রিন্সটন, নিউ জার্সি
মার্চ ২, ২০২০